শিক্ষাতত্ত্বের ভূমিকা

সুনন্দা ঘোষ

অধ্যাপিকা, সৈলোম্যাটুটিনা কলেজ অব এডুকেশন

প্যালেস রোড,

মাদ্রাজ

সুপ্রকাশিনী

৮বি, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

SHIKSHATATTER BHUMIKA

By Sunanda Ghosh

প্রকাশক

শ্রীবিশ্বনাথ মৈত্র

৮ বি, কলেজ রো,

কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশকাল—ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫

মুদ্রণে

নিউ মহামায়া প্রেস

৬৫/৭ কলেজ স্ট্রীট,

কলিকাতা ৭০০০৭৩

সূচীপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ভূমিকা	—৫
প্রথম।	দর্শন ও শিক্ষা। দর্শনের পরিধি। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিভিন্ন দর্শনের দৃষ্টিকোণ হতে শিক্ষা। দর্শন ও শিক্ষা। শিক্ষার দুই প্রমুখ অঙ্গ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী। অ্যাডামসের সংজ্ঞা। শিক্ষা ও চরিত্রগঠন। কয়েকজন দার্শনিক ও তাঁদের জীবন-দর্শন ও শিক্ষার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। শিক্ষার সমন্বয়ী আদর্শ।	১—২৩
দ্বিতীয়।	শিক্ষার সমাজমুখী ও ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য। সমাজ ও ব্যক্তির সম্বন্ধ। সমাজ মুখ্য, ব্যক্তি গৌণ—স্পার্টা ও নাজী জার্মাণীর আদর্শ। ব্যক্তিমুখ্য আদর্শ। ইংল্যাণ্ডে শিক্ষার আদর্শ। ব্যক্তিমুখী ও সমাজমুখী লক্ষ্যের সমন্বয়।	২৪—৩৭
তৃতীয়।	দার্শনিক সমস্যা। জগৎসত্তার স্বরূপ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা। বস্তুবাদ ও ভাববাদ। বস্তুবাদের বিভিন্ন রূপ। স্বভাববাদ। ভাববাদের বিভিন্ন রূপ। প্রয়োগবাদের মূল তত্ত্ব। ব্যবহারবাদ ও প্রয়োগবাদে তার প্রয়োগ।	৩৮—৬৩
চতুর্থ।	শিক্ষায় স্বভাববাদ। যান্ত্রিক স্বভাববাদ। জৈবিক স্বভাববাদ। বিভিন্ন শিক্ষাবিদের দৃষ্টিতে স্বভাববাদ—রুশো, ম্যাকডুগাল, ’শ, নান্। মনঃসমীক্ষণ ও স্বভাববাদ। শিক্ষায় স্বভাববাদের একটি নিরীক্ষা—নীলের স্কুল।	৬৪—৮৫
পঞ্চম।	শিক্ষায় ভাববাদ। ভাববাদের অর্থ। কেন ভাববাদ? বিজ্ঞানীর চোখে ভাববাদ। ভাববাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য মূল্যাদর্শ—সামাজিক, নান্দনিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক।	৮৬—১০৫

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ।	শিক্ষায় প্রয়োগবাদ। প্রয়োগবাদের অর্থ। ভাববাদ ও প্রয়োগবাদে পার্থক্য। শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ। শিক্ষার পদ্ধতি। বিষয়ক্রম। নৈতিক মূল্য ও প্রয়োগবাদ। প্রয়োগবাদের মূল্যায়ন।	১০৬ - ১২১
সপ্তম।	স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা। শিক্ষায় শৃঙ্খলার অর্থ। শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতার পার্থক্য। সুশৃঙ্খলার তিন উপায়। দমন, অনুকরণ ও স্বাধীনতা। শৃঙ্খলা সম্বন্ধে স্বভাববাদ, প্রয়োগবাদ ও ভাববাদের বক্তব্য।	১২২ - ১৩৮
অষ্টম।	জ্ঞানের শৃঙ্খলা। শিক্ষার সর্বোত্তম লক্ষ্য হিসাবে জ্ঞান। ভাববাদী মত। স্বভাববাদী স্পেন্সারের বক্তব্য। 'মনের পুষ্টিদান' শিক্ষার পাঠক্রম, 'মনের অনুশীলন' শিক্ষার পাঠক্রম, শিক্ষায় সংক্রামণের তত্ত্ব। সংক্রামণ সম্বন্ধে মনঃস্তাত্ত্বিক নিরীক্ষা। মনের পুষ্টি ও অনুশীলনের সমন্বয়ী ধারণা।	১৩৯—১৫২
নবম।	পাঠক্রম। স্বভাববাদের মতানুসারী পাঠক্রম। ভাববাদী মতানুসারী পাঠক্রম। ভাববাদী-স্বভাববাদী প্রয়োগবাদী মত। সমন্বিত মত।	১৫৩—১৬৬
দশম।	শিক্ষায় বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল কথা। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের ইতিহাস। সাম্প্রতিক শিক্ষায় বস্তুস্বাতন্ত্র্যতা। উদার শিক্ষা ও বৃত্তিকারী শিক্ষার দ্বন্দ্ব, দুয়ের মিল ও সমন্বয়।	১৬৬ ১৮০
একাদশ।	শিক্ষায় ধর্ম।	১৮১ ১৯২
দ্বাদশ।	পরিশিষ্ট।	১৯৩—২০০

ভূমিকা

শিক্ষাতত্ত্বের ভূমিকায় রস্ তাঁর লেখার কৈফিয়ৎ দিয়ে বলেছেন সভ্যতার দ্রুতগতি আমাদের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে এগিয়ে আনতে ক্রমেই সাধারণ লোকদের সঙ্গে শিক্ষিত মানুষরাও একটী অভ্রান্ত সত্য আবিষ্কার করে ফেলেছেন। সেটী হল, শিক্ষার কলাকৌশলের চেয়ে শিক্ষাদর্শন সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা। শিশুর স্বভাব ও মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারণা যতই অগ্রসর ও বৈজ্ঞানিক হোক না কেন, তা বাস্তবিক শুধুমাত্র শিক্ষার উদ্দেশ্য সার্থক করার উপকরণ মাত্র। কিন্তু দর্শনকে শিক্ষার পথপ্রদর্শন করার জন্য সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত থাকা দরকার। যে কোন শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য নতুন সমাজজীবন গড়ে তোলা। সে কাজে দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নেই। বরঞ্চ দর্শনশাস্ত্র শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ করবে, এটী সর্ব্বজন গ্রাহ্য তথ্য।

রস্ কোন বিশেষ দর্শনের দৃষ্টিকোণ গ্রহণ না করে সাধারণ দর্শনের বিশাল উপত্যকায় দাঁড়িয়ে শিক্ষাদর্শনের মূল তত্ত্বগুলি বিশদ করবার চেষ্টা করেছেন। এ বইটি লেখা হয়েছে শিক্ষণ-শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। যাদের জন্য লেখা, তাদের কথা স্মরণ রেখে রস্ বইটীকে সূক্ষ্ম তত্ত্বকণ্টকিত করেন নি বরঞ্চ সহজ সরল ভাষায় শিক্ষাদর্শনের মূল কথাগুলি রেখায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন যে এর ফলে একদিকে তাঁর বই 'কট্টর' তাত্ত্বিকদের কাছে আদৃত হবেনা, এবং অপরদিকে তিনি 'অতি সরলীকরণের' দায়ে অভিযুক্ত হবেন। সত্যিই তিনি সহজবোধ্য হওয়ার জন্য কোন কোন বিভিন্ন দর্শনকে মোটা দাগে আলাদা আলাদা করে চিহ্নিত করেছেন (যদিও অনেক সময়ই, ভাববাদ, বস্তুবাদ, প্রয়োগবাদকে তত পরিচ্ছন্ন ভাগে বিভাজন করা যায় না)। অনেক খুঁটিনাটি নাতিআবশ্যক বিষয়ও তিনি বর্জন করে শুধুমাত্র 'আবশ্যক' বিষয়গুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। শিক্ষণ-শিক্ষার্থীদের পক্ষে কঠিন, অগ্রসর, তত্ত্বভার-সঙ্কলিত পুস্তক পাঠের আগে, সোজা সরল মূল বস্তুগুলির সঙ্গে পরিচিতি থাকার দরকার। রস্ মনে করেন তাঁর পুস্তক তেমনি মৌল পুস্তকের স্থান নেবে।

রস্ বলেন "যদি কোন শিক্ষার্থী আমার বই পড়ে তাঁর নিজের জীবনের একটা

সুচিন্তিত সার্থক দর্শন থাকার সার্থকতা বোধ করেন ও তার অনুসন্ধানে ব্রতী হন তবেই আমার প্রচেষ্টা সফল হবে।"[১]

রস্ মৌলিক দর্শনতত্ত্ব প্রচার করেছেন এ দাবী করেন নি বরঞ্চ নিজেকে ব্যাখ্যাকার, এই অভিধা দিয়েছেন। বহু চিন্তাবিদ্‌দের কাছ হতে স্বচ্ছন্দে চিন্তা ও ধারণা আহরণ করতে, এ কারণে ইতঃস্তত করেন নি। এই জ্ঞানমার্গের যাত্রায়, স্যর জন অ্যাডাম্‌স্, স্যর পার্‌সি নান ও ডঃ রবার্ট রাস্ক ইত্যাদি জ্যেষ্ঠ চিন্তাবিদ্‌দের সাহায্য নিয়েছেন বলে রস স্বীকার করেন। মোটামুটীভাবে এঁদের মতামতই তাঁর এই গ্রন্থে বিস্তারিত। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তিনি সোচ্চার।

রসের এই অত্যন্ত 'সহজ' বইখানি আমাদের শিক্ষণ-শিক্ষার্থীদের কাছে পেশ করা আমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে হয়েছে কেন না তাঁর দার্শনিক দৃষ্টি গভীর, স্বচ্ছ ও সুদূরগামী ও তাঁর লেখনভঙ্গি ঋজু, সরস ও চিত্তাকর্ষক। শিক্ষক-শিক্ষণের ছাত্রদের অবশ্য জ্ঞাতব্য কতগুলি তথ্য যথা দর্শন ও শিক্ষা, শিক্ষার সামাজিক ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক লক্ষ্য, দার্শনিক সমস্যাবলী, স্বভাববাদ, ভাববাদ, প্রয়োগবাদ, শাসন ও শৃঙ্খলা, বৌদ্ধিক শৃঙ্খলা, পাঠক্রম, বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ, শিক্ষায় ধর্ম, তিনি অতিশয় প্রাঞ্জল ভাষায় বহু উদাহরণসহ মনোগ্রাহী করে নিবদ্ধ করেছেন। শিক্ষাদর্শ বিষয়ে এমন গুরুত্বপূর্ণ অথচ সরল পুস্তকের বিস্তৃততর প্রচার বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়েছে।

আমি রসের ভাষ্যকার ও টীকাকার হয়ে তাঁর বক্তব্য বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষক-শিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদের সামনে উপস্থাপিত করতে চেযেছি। তাঁর মূল পুস্তকের বিষয় বিভাজন অনুসারে এই পুস্তকের পাঠ্যবস্তু বিন্যস্ত করেছি। তাঁর বক্তব্যকে গুছিয়ে বাংলায় বলতে গিয়ে নিজের ব্যাখ্যা ব্যবহার করেছি। তবে তাঁর বইয়ের তন্নিষ্ঠ অনুবাদ করার চেষ্টাই করেছি।

শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে রস অবলম্বনে এই বইটী লেখার কৈফিয়ৎ এই যে শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে কোন শিক্ষক সার্থকভাবে শিক্ষকতার কাজ

করতে পারেন না। অথচ বিষয়টী মূলতঃ দুরূহ। রস অবলম্বিত এই বইখানি যদি সেই দুরূহ বিষয়টী সহজে আয়ত্ত করার কাজে কিছুমাত্র সাহায্য করে তবেই নিজের পরিশ্রম সার্থক মনে করব।

এই পুস্তকের প্রকাশনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পর্ষদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

আমার চিন্তন ও লেখার মধ্যে যাঁর প্রভাব সর্ব্বাধিক, আমার স্বর্গত পিতা সুলেখক শ্রীবিভূরঞ্জন গুহের নাম উল্লেখ করি, আমার প্রচেষ্টায় তাঁর আশীর্ব্বাদ ও স্নেহযুক্ত হয়ে রইল একথা নিশ্চিত জানি। এই প্রচেষ্টায় যিনি আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, পরম শ্রদ্ধেয়া শান্তি দত্ত, অধ্যক্ষা, গভর্ণমেণ্ট ট্রেনিং ইন্‌ষ্টিট্যুট অফ এডুকেশন, হেষ্টিংস হাউস, তাঁর নাম কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

প্রথম অধ্যায়

দর্শন ও শিক্ষা

শিক্ষা ও দর্শনের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী। মানবজীবনের লক্ষ্য সুসম্পূর্ণ জীবন যাপন (complete living) এবং শিক্ষা সেই লক্ষ্য সাধনের উপায়। কিন্তু প্রথমে জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করবে কে? উদ্দেশ্য বিনা, উপায় চিন্তা অনাবশ্যক। দর্শন জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে সাহায্য করে। উদ্দেশ্য স্থির থাকলেও সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী ভিন্ন লক্ষ্যে পৌছানো যায় না। জীবনের নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর প্রণালী, শিক্ষা। দর্শন যদি জীবনের উদ্দেশ্যসন্ধানী, শিক্ষা তার ফলিত উপায়। দর্শন আর শিক্ষা, দুয়েরই পদ্ধতি অনুসন্ধান (enquiry)। দর্শন আর শিক্ষা, দুয়েরই লক্ষ্য সুষ্ঠু জীবন (good life)। এক অন্যের পরিপূরক। এদের পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, মুখবন্ধেই স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন।

সুসাহিত্যিক চেষ্টারটন একদা সকৌতুকে মন্তব্য করেছিলেন যে বাড়ীভাড়া দেওয়ার সময় ভাড়াটের আর্থিক অবস্থা জানার আগে তার জীবন দর্শন সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া দরকার। বাড়ীভাড়া দেওয়ার মত সামান্য বিষয়েও পাঠক যদি একথার যাথার্থ্য স্বীকার করতে পারেন তবে তাঁর পক্ষে একথা মেনে নেওয়া অসম্ভব হবে না যে শিক্ষারাজ্যের সমস্ত সমস্যাগুলিও মূলতঃ দার্শনিক সমস্যা এবং শিক্ষা ও দর্শন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। পাঠক এমন কথা ভেবেও আতঙ্কিত হবেন না যে এর ফলে শিক্ষা নামক অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিক বিষয়টীকে এক দুরূহ ও পরোক্ষ ব্যাপারে পরিণত করা হচ্ছে? কিংবা কোন স্বপ্নলোকবাসী অন্যমনস্ক দার্শনিক, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অলঙ্কার, তাঁকে ডেকে আনা হচ্ছে আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্তব্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার জন্য।

দর্শন ও শিক্ষা এই দুটী কথার অর্থ স্পষ্ট করা দরকার। এ দুটী কি সম্পূর্ণ বিরোধী সংজ্ঞা? অথবা দুয়ের মধ্যে মিল স্পষ্ট?

এদের সংজ্ঞা অনুসরণ করলে দেখা যায় একই মুদ্রার দুই পিঠের মত দর্শন ও শিক্ষা পরস্পরের পরিপূরক ও পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। দর্শন কি? প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্লেটো তাঁর সুবিখ্যাত 'রিপাবলিক' গ্রন্থে দর্শনের সংজ্ঞা নির্ণয় করে বলেছেন, "যিনি জগতের সমস্ত প্রকার জ্ঞান আহরণে আগ্রহী, যাঁর জিজ্ঞাসা

অনির্ব্বাণ তিনিই প্রকৃত দার্শনিক অভিধার যোগ্য।"[১] তিনি জানতে ভালবাসেন। তীব্র জ্ঞান পিপাসায় তিনি সোৎসাহে বিভিন্ন ক্ষেত্র হতে জ্ঞান সংগ্রহে উদ্যোগী হন। কিন্তু তাঁর সামনে একটি নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য থাকে। তাঁর উদ্দেশ্য শুধু বিশ্লিষ্ট ও বিচ্ছিন্ন কতগুলি তথ্য কুড়ানো নয়। যেমন করে বহু ইষ্টকখণ্ড সাজিয়ে সৌধের ভিত্তি গড়ে তোলা হয়, তেমন করে দার্শনিক বিভিন্ন বিজ্ঞানের সমাহৃত উপকরণ দিয়ে একটি সঙ্গত যুক্তিনিষ্ঠ সামগ্রিক ধারণা গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। 'জ্ঞানের ভগ্নাংশ নয়, সম্পূর্ণ অখণ্ড জ্ঞানের তিনি সাধক।"[২] জ্ঞান অন্বেষায় কোন বিষয়ের সীমারেখা তিনি মানেন না। তিনি সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান লাভে সমান উৎসুক। তাঁর একতম আকাঙ্খা জীবনকে স্থির হয়ে সম্পূর্ণরূপে দেখা। গ্লকোন যখন প্রশ্ন করেন, 'সত্যিকার দার্শনিক কে?' সক্রেটীস উত্তর দেন "যাঁরা সত্যদর্শনে আগ্রহী, তাঁরা দার্শনিক।" তাঁরা যে জ্ঞানের সন্ধানী সে জ্ঞান সম্পূর্ণ ও শাশ্বত; যুগের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাতে কোন বিকার ঘটেনা।

অতএব দার্শনিকের জিজ্ঞাসার বিষয়বস্তু হচ্ছে সমগ্র বিশ্বসত্তা (Reality)। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যুক্তিনিষ্ঠ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে দর্শন। দর্শনের আরেকটী সর্ব্বকালে উচ্চারিত মূল প্রশ্ন "মানুষের স্বরূপ কি?" আকাশ কি, নক্ষত্র কি, এ সব প্রশ্নের চেয়েও, মানুষের সত্তার স্বরূপ, তার উৎপত্তি, ভবিষ্যৎ, তার আশা আকাঙ্খার অন্তিম লক্ষ্য, জীবনের প্রকৃত রূপ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে মানুষের জানবার আগ্রহ চিরদিনই প্রবলতর। দার্শনিক মানবজীবনের এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফেরেন বলেই জ্ঞানের সন্ধান করেন। এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসার নানারকম উত্তর হতে বিভিন্ন দর্শনের জন্ম হয়েছে। বস্তুতঃ যাঁরাই এই মৌলিক প্রশ্নগুলির উত্তর নির্ভীক আন্তরিকতায় খুঁজেছেন, এবং যুক্তি সঙ্গত কিছু উত্তর দিতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা জড়বাদী, জীববিজ্ঞানী, ধর্মতাত্ত্বিক অথবা অজ্ঞাবাদী (agnostic) যাই হো'ন্ না কেন, তাঁরা প্রকৃত পক্ষে 'দার্শনিক' অভিধার অধিকারী। প্রাচীন কালের যে চিন্তাবিদ্‌রা প্রাকৃতিক ব্যাপারে ঈশ্বরত্ব আরোপ করেছেন, যে সব উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা অনু পরমাণুর গতি ও শক্তি দিয়ে প্রকৃতির রহস্য বুঝবার চেষ্টা করেছেন, যে সমস্ত ধর্ম্মপ্রাণ মানুষেরা সর্ব্বব্যাপারে

১। "He who has a taste for every sort of Knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may be justly termed a philosopher." Plato: Republic V 475.

২। 'He is a lover not of a part of wisdom only, but of the whole." Plato: Republic V 475

মানুষের জীবনে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ আবিষ্কার করেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সেই পরিমানে দার্শনিক যে পরিমাণে ঐ সব মৌলিক জিজ্ঞাসার উত্তর তাঁরা সুনিশ্চিত যুক্তির সাহায্যে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা যে উত্তর দিয়েছেন সেগুলো সম্ভাব্য, উন্নত মানের, কিংবা গ্রহণ যোগ্য হোক্ বা না হোক্, ঐ মৌল প্রশ্নগুলো উত্থাপন করে তার উত্তর খোঁজার প্রয়াস করার দরুণই তাঁরা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন ও নিজেদের 'দার্শনিক' পদের সুযোগ্য বলে প্রমাণ করেছেন।

তাই দেখা যায় জীবন ও তার মূল ধারণাগুলোকে যুক্তিসঙ্গত ভাবে বিচার বিবেচনা ও ব্যাখ্যা করার নামই দর্শন। অবশ্য মানুষের পক্ষে এই আলোচনা বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। সুতরাং মানুষের জীবনে দর্শনের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক।

মানুষ জীবনকে কি দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে, জীবন সম্বন্ধে একজনের বিশ্বাস ও ধারণা, তার জীবনাদর্শ, দার্শনিক আলোচনার বিষয়বস্তু। দর্শন শুধুমাত্র নির্বস্তুক (abstract) ধারণা নয়। তা মনুষ্যজীবন বিকাশ, বিবর্ধনের পথে সাহায্য করবে এই বিশ্বাস, মানুষকে দর্শনের আলোচনায় প্রবৃত্ত করে।

অধ্যাপক ডিউই সুন্দরভাবে বলেছেন, "যখনই দর্শনকে গুরুত্ব দেওয়া হয় তখনই ধরে নেওয়া হয় যে দর্শনের অর্থ এমন কিছু জ্ঞান অর্জ্জন করা যার প্রভাব জীবন যাত্রার উপর পড়বে।"[১]

লেখক অলডাস্ হাক্সলীর মতে "মানুষ জগৎ জীবন সম্পর্কে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি বা নিজস্ব জীবনাদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। যে ব্যক্তি খুব একটা চিন্তা ভাবনা করে না তার সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। কোনো একটা জীবনদর্শন ছাড়া বাঁচা অসম্ভব। আমাদের সামনে দুটো মাত্র বিকল্প আছে, হয় অসম্পূর্ণ, বিশৃঙ্খলা, ত্রুটিপূর্ণ এবং বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্করহিত কোন জীবনদর্শনের অনুসরণ করা অথবা সুসম্পূর্ণ সুন্দর বাস্তবানুগ একটী জীবন দর্শনকে গ্রহণ করা।"[২]

১। "Whenever Philosophy has been taken seriously, it has always been assumed that it signified achieving a wisdom that would influence the couduct of life'—Dewey. J. Democracy and Education p. 378

২। 'Men live in accordance with their philosophy of life, their conception of the world. This is true even of the most thoughtless. It is impossible to live without a metaphysic. The choice that is given us is not between some kind of metaphysic and no metaphysic: it is always between a good metaphysic and a bad metaphysic, a metaphysic, that corresponds reasonably closely with observed and inferred reality and one that doesn't."

Ends and Means. p 25'—Aldous Huxley

দার্শনিকতার আরেকটা অর্থ আছে। যদি কোন ব্যক্তি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থাকে, আমরা বলি তার জীবন সম্বন্ধে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে। অর্থাৎ তার দৃষ্টিভঙ্গি এমন যে সে সমস্ত প্রকার বিচ্ছিন্ন উপদ্রবকে একটা বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পায়। অন্যভাবে বলা যায় যে তার জীবনদর্শন তাকে জীবনের সুখদুঃখ মেনে নিতে সাহায্য করে। প্রকৃত জীবনদর্শন মানুষকে সেই দর্শন অনুযায়ী জীবন যাপনে প্রবুদ্ধ করে।

জীবন সম্বন্ধে মানুষের নিশ্চিত মূল্যবোধ ও ধারণা কিভাবে বিভিন্ন জীবনযাত্রার জন্ম দেয় কিছু কিছু উদাহরণের সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা করা যাচ্ছে। দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে ভোগবাদ (Hedonism) নামে একটি জীবনাদর্শ প্রচলিত। এর মূল ধারণা হল, এই জীবন তাৎক্ষণিক ও জীবনের সব সুখ তৎক্ষণাৎ উপভোগ্য। জীবনের অন্তিম লক্ষ্য কোন স্বর্গলাভ নয়, সুখলাভ। ভারতীয় দর্শনে চার্ব্বাক, এবং পাশ্চাত্য দর্শনে মিল্, বেন্থাম ইত্যাদিরা এই মতবাদের অগ্রণী পথিকৃৎ। যদি কেউ এই ভোগবাদের জীবনাদর্শে বিশ্বাসী হন তবে তিনি কি ধরণের জীবন যাপন করবেন? রস নিম্নলিখিত উদাহরণ দিয়ে তা স্পষ্ট করেছেন।

বিভিন্ন জীবনাদর্শ হতে বিভিন্ন জীবনযাত্রার উদ্ভব। ভোগবাদী ওমর খৈয়াম (পারসিক কবি) বিশ্বাস করেন, 'ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম' কুড়োতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা সুতরাং তিনি মদিরার পাত্রে নিজেকে মগ্ন রেখে জীবনের নগদ সুখ লাভের চেষ্টা করেছেন। আমরা অবশ্যই আশা করতে পারি না যে ওমর খৈয়াম, যিনি জীবনের শেষে মরণোত্তর কোন লক্ষ্য আছে বলে বিশ্বাস করতেন না, তিনি ঈশ্বরের করুণালাভে প্রয়াসী সেন্ট পলের মত কঠোর শ্রমের জীবন যাপন করবেন। সেন্ট পলের মতে জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য সত্যের সন্ধান, তপস্যা ও তাপন (penance)। যীশুর করুণা, তপঃক্লিষ্ট, ন্যায়সংগ্রামী কৃচ্ছ্র সাধনে রত ভক্তের জন্য সংরক্ষিত। ঠিক একই বিশ্বাসে সেন্ট অগাষ্টিন বলেন, "জীবনের পরমতম লক্ষ্য যীশুর জয়গান গাহিয়া, তাঁর প্রদর্শিত পথে চলিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়া।" ওমর খৈয়ামের মুখে এ ধরণের বাণী আমরা আশা করি না, কেন না, তিনি আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিংবা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনে বিশ্বাসী নন।

অলডাস হাক্সলী তাঁর চিত্তাকর্ষক গ্রন্থ "এণ্ড্স্ এ্যাণ্ড মীন্স্"এ ভোগবাদের স্তর হতে উন্নততর ভাববাদী দার্শনিকতার স্তরে তাঁর নিজের উত্তরণের কথা উল্লেখ

করে বলেছেন যে, প্রথমে তিনি বিশ্বাস করতেন তাৎক্ষণিক সুখের সন্ধানই জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য কিন্তু পরে দেখেছেন অন্যের মঙ্গল করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সংক্ষেপে বলা যায়, যে কোন দর্শন শেষ পর্য্যন্ত জীবনযাত্রাকে একটী বিশেষ রূপ দেয়। এর বিপরীত প্রতিজ্ঞাটীও (converse proposition) সত্য। কোন ব্যক্তির জীবনযাত্রা থেকে কি তার জীবনদর্শন অনুমান করি না আমরা?

মানুষের ব্যবহার তার মুখের ভাষার চেয়ে অনেক বেশী সোচ্চার। তা সহজেই ব্যক্তির চরিত্রকে উদ্‌ঘাটন করে। 'ফল দেখে গাছ চেনা যায়' একথা যেমন সত্যি, 'কর্ম দেখে কর্তার চরিত্র সম্বন্ধে ধারণা করা যায়' একথাও তেমনি সত্যি। মানুষের জীবনযাত্রার ধরণ তার জীবনদর্শনের দ্বারা এতদূর প্রভাবিত যে ব্যক্তির ক্রিয়াকলাপ হতে আমরা তার আদর্শের সততা সম্বন্ধে ধারণা করে থাকি।

এছাড়া আরেকটা কথা আছে। কারো জীবনসম্বন্ধে স্থির কতগুলি আদর্শ বা বিশ্বাস থাকলে সে শুধুমাত্র নিজের জীবনেই সেই আদর্শ রূপায়িত করে ক্ষান্ত থাকে না। ধর্মপ্রচারকদের মত উৎসাহভরে অন্যদেরও নিজের মতে আনতে চায়। নিজের আদর্শে প্রভাবিত করতে চায়। এ কথার সত্যতা প্রমাণ করতে বেশী দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। লণ্ডনের হাইড্‌পার্ক এমন প্রচারকার্য্যের একটী প্রধান কেন্দ্র। কত না বিভিন্ন মতবিশ্বাসী সেখানে সোৎসাহে তাঁর নিজস্ব আদর্শ জনগণের কাছে প্রচার করে যাচ্ছেন কম্যুনিষ্ট ও ফ্যাসিষ্ট দুইদলই নিজের নিজের দলের রাজনৈতিক মত প্রচারে সমান সরব।

খ্রীষ্ট ধর্মের একটী প্রধান অঙ্গই প্রচার কোন মানুষের বিশ্বাসের দৃঢ়তা আমরা শুধু তার বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাত্রা দেখেই পরিমাপ করি না, তার নিজের বিশ্বাস প্রচার করার উৎসাহ হতেও করে থাকি। প্রচারবিমুখ ধর্মপ্রতিষ্ঠানকে মৃত বলে গণ্য করা চলে। যে সব ধর্মপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা প্রচারের আগ্রহ নেই তারাও ক্ষীণায়ু হতে বাধ্য। ধর্ম্মমতকে সঞ্জীবিত রাখার সবচেয়ে সফল উপায় হল তরুণদের শিক্ষা দান। ধর্মের বীজ বপন করার এর চেয়ে উর্ব্বর ভূমি আর হতে পারে না। জেস্যুইটরা এই তথ্য বহুদিন আগে হৃদয়ঙ্গম করে শিক্ষা দানের কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। রোমান ক্যাথলিকরাও একই কারণে প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়গুলিতে পূর্ণ আধিপত্য শক্ত মুঠোয় ধরে রাখতে চেয়েছেন। সুতরাং দেখা যায় আদর্শ ও বিশ্বাস যদি প্রাণবন্ত হয় তবে স্বভাবতঃই শিক্ষাদান কাজে তার পরিণতি

ঘটে। আরো পরিষ্কার ভাবে বলা যায় কারো জীবন সম্বন্ধে সুদৃঢ় আদর্শ থাকলে অন্যকেও সে সেই আদর্শে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে।

জীবনদর্শন ও শিক্ষার সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্যার জন অ্যাডাম্‌স্ বলেন শিক্ষা হল দর্শনের গতিময় (dynamic) দিক। দার্শনিক বিশ্বাসের সক্রিয় দিক্ হল শিক্ষা, আদর্শকে জীবনে বিধৃত করার ব্যবহারিক উপায় হল শিক্ষা। প্রথমে বলা হয়েছিল শিক্ষা ও দর্শন একই মুদ্রার দুই পিঠ। এবার দেখছি দর্শন হল মনের (contemplative) জগৎ, শিক্ষা কর্মের জগৎ।

শিক্ষা অতএব জীবন দর্শনের প্রচার ও অপরকে প্রভাবিত করার কর্মকৌশল। শিক্ষা ও দর্শন অচ্ছেদ্য বন্ধনে এইভাবে আশ্লিষ্ট।

মোটামুটী ভাবে বলা চলে যে কোন ব্যক্তি যখন জীবন সম্বন্ধে তাঁর নিজের আদর্শ ও ধারণা অপরকে গ্রহণ করাতে চেষ্টা করেন, সেইভাবে তাকে প্রভাবিত করেন তখন সেই প্রয়াসকেই শিক্ষা বলে গণ্য করা যায়। শিক্ষা অর্থ শিশুর সহজাত জ্ঞান গুণাবলী ও ক্ষমতার পূর্ণ উন্মোচন। যে সব গুণগুলি ছোট শিশুতে সুপ্ত, অপরিস্ফুট তাকে কুশলী শিক্ষক জাগিয়ে তুলতে পারেন, এই মত অনুসারে শিক্ষা দেওয়ার সময় শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্ন করে তার নিজে চিন্তা করার শক্তিকে বিকশিত করতে পারেন; তাকে দুটী বিচ্ছিন্ন বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করায় এবং নিজস্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ায় সাহায্য করতে পারেন। তবে আমাদের মনে রাখা দরকার যে শিক্ষা নামক জটিল পদ্ধতির সবটুকু মাত্র এই জাগিয়ে তোলাতেই সম্পন্ন হয় না। শিক্ষার কোন সত্য বা কাল্পনিক ব্যুৎপত্তিগত অর্থের চেয়েও তাকে দর্শনের প্রাণবন্ত ব্যবহারিক দিক বলে গ্রহণ করলে বেশি সুবিধা হবে।

শিক্ষা দেওয়ার অর্থ কোন ব্যক্তিকে গড়ে তোলা, প্রভাবিত করা। তার স্বাভাবিক বৃত্তি ও শক্তিকে কিছুটা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করতে হবে শিক্ষার দ্বারা। শিক্ষা পেলে যা হবে, না পেলে ঠিক তেমনটা হতেই পারবে না। সুতরাং বাইরের প্রভাব ছাড়া শিক্ষালাভ সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থেকে শিশুর আন্তর শক্তির স্বাভাবিক বিকাশের প্রতীক্ষায় থাকার স্বপক্ষে যে আধুনিক মত সৃষ্টি হয়েছে সেটিকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা যায় না। এমন কি এ এস্ নীল (A. S. Neill) যিনি তাঁর 'এ ড্রেডফুল স্কুল' বইটীতে অতি প্রাঞ্জল ও সরস ভাষায় বয়স্কদের শাসন হতে তরুণদের মুক্তি দেবার জন্য ওকালতি করেছেন তিনি নিজেও বিদ্যালয় প্রাঙ্গন থেকে বিদায় নেন নি এবং সম্ভবতঃ যে সব ছাত্ররা তাঁর হাতে ছিল তাদের

ব্যক্তিত্ব বিকাশে তাঁর প্রভাব অস্বীকার করা যাবে না। সুতরাং একথা পুনরুচ্চার্য্য যে শিক্ষার অর্থ কারো প্রভাবে শিশুর স্বাভাবিক ক্ষমতার বিকাশ ও রূপান্তর।

কার প্রভাবে এই রূপান্তর ঘটে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে অ্যাডাম্‌স্‌, জন স্টুয়ার্ট মিলের এক ভাষণ থেকেই উদ্ধৃতি দিচ্ছেন।

"আমাদের সহজাত স্বভাবের পূর্ণ বিকাশের জন্য আমাদের নিজেদের প্রয়াস ও অপরের প্রভাব এগুলি তো 'শিক্ষা' বটেই, শিক্ষার আওতায় আরো কতগুলি জিনিষ পড়ে। দেশের আইন, শাসন ব্যবস্থা, বানিজ্যসংস্থা, সামাজিক জীবনের নানারকম বিভঙ্গ (modes of social life) এমন কি মনুষ্য-ইচ্ছার ওপর অনির্ভরশীল প্রাকৃতিক ঘটনা। যথা পরিবেশ, আবহাওয়া, মাটি ও ভৌগোলিক অবস্থান পর্য্যন্ত মানুষের চরিত্র ও গুণাবলীর ওপর পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং যে সমস্ত প্রভাব মানুষকে সে যা সেই ব্যক্তি হয়ে উঠতে সাহায্য করে অথবা সে যা নয়, তা না হবার মূলে কাজ করে, সেগুলোও তার শিক্ষার অংশ বিশেষ।"[১]

মিল যে প্রভাবগুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলিকে অস্বীকার করা যায় না এবং এই প্রভাবের ফলে আমাদের স্বাভাবিক বিকাশের গুরুতর পরিবর্তন ঘটে এও সত্য। তবু কি শিক্ষা বিষয়ে আমাদের যে ধারণা তার মধ্যে এই প্রভাবগুলিকে গণ্য করা উচিত হবে? মিল নিজেও তাঁর শিক্ষার সংজ্ঞাকে সংকীর্ণ করে বলেছেন, "শিক্ষা বলতে বোঝায় মানুষের সেই সংস্কৃতি যা এক পুরুষ তার পরবর্তী পুরুষকে দিয়ে যায় যাতে তরুণ সম্প্রদায় উন্নতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়। অতএব সংস্কৃতির বাঞ্ছনীয় অত্যাবশ্যক অংশগুলিকে শেখানোর নাম শিক্ষা।"[২]

১। "Not only does it (education) include whatever we do for ourselves and whatever is done for us by others, for the express purpose of bringing us somewhere nearer to the perfection of our nature, it does more, in its largest acceptation it comprehends even the indirect effects produced on character and on the human faculties, by things of which the direct purposes are quite different: by laws, by forms of government, by the industrial arts, by modes of social life; nay even by the physical facts not dependent on human will; by climate, soil and local position. Whatever helps to shape the human being: to make the individual what he is, or hinder him from being what he is not—is part of his education"—জেম্‌স্‌ এ্যাণ্ড জন স্টুয়ার্ট মিল, 'অন এডুকেশন'. PP 132,133.

২। (Education is) the culture which each generation purposely gives to those

কাজেই দেখা যাচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রভাবিত করাই হল শিক্ষা। যে কোন ধরণের প্রভাব শিক্ষা নয়, বিশেষ উদ্দেশ্যযুক্ত প্রভাব, শিক্ষা। উদ্দেশ্য কোন ব্যক্তিতেই থাকা সম্ভব, তাই শিক্ষা প্রক্রিয়াতে আরেকটা অত্যাবশ্যক উপাদান হচ্ছেন একজন ব্যক্তি, যিনি সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রভাব বিস্তার করবেন, ইনিই শিক্ষক।

শিক্ষা প্রক্রিয়াতে দুজন ব্যক্তির প্রয়োজন, একজন হলেন শিক্ষক যিনি শিক্ষা দেবেন, অপরজন ছাত্র যাকে তিনি বিশেষ আদর্শ অনুসারে প্রভাবিত করবেন। চুম্বক দণ্ডের দুই বিপরীত প্রান্তের মত শিক্ষা দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। এর একপ্রান্তে শিক্ষক, অন্য প্রান্তে শিক্ষকের পরিপূরক ছাত্র, যে শিক্ষা গ্রহণ করবে। শিক্ষা প্রক্রিয়াতে শিক্ষক বিশেষ উদ্দেশ্য অনুযায়ী ছাত্রদের সহজাত শক্তিগুলি বিকশিত ও রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হন। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটিও মনে রাখা দরকার যে এই চেষ্টা শুধুমাত্র শিক্ষকেরই নয়, শিক্ষার্থী নিজেও নিজের স্বভাবের রূপান্তর ঘটানোর কাজে সহযোগী। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই নিজের শিক্ষক। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত শিক্ষাতে শিক্ষার্থী লক্ষ্য সম্বন্ধে অবহিত। বইপত্র ও শিক্ষকের সাহায্যে সে নিজেও সেই লক্ষ্যে পৌছানোর চেষ্টা করছে। এই স্বনির্ভর শিক্ষা, শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটি খুব তৃপ্তিকর পর্য্যায়। শিখবার আগ্রহ যখন শিক্ষার্থীর পক্ষ থেকেই আসে তখন শিক্ষক নিজেকে সঙ্গতভাবেই সার্থক মনে করতে পারেন এবং নিশ্চিত থাকতে পারেন যে এবার স্বাধীনভাবে শিক্ষার প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।

শিক্ষণ (education) কথাটা তালিম দেওয়া অথবা পড়ানো (teaching) হতে ব্যাপকতর। তালিম দেওয়া অর্থ ছাত্রদের স্বভাবের রূপান্তর আনার জন্য খানিকটা জ্ঞান ও কৌশল ছাত্রদের শেখানো। তালিম দেওয়া শিক্ষণের একটা মূল্যবান অঙ্গ। কিন্তু দুটো সমার্থক নয়। কেননা তালিম দেওয়াতে আছে শুধুমাত্র জ্ঞান বিতরণের কথা, কিন্তু শিক্ষণের (education) আরেকটি বিশিষ্ট অঙ্গ শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব। শিক্ষণ education`, পড়ানো বা তালিম দেওয়া teaching এর চেয়ে আরো ব্যাপকতর প্রক্রিয়া। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষণের দুটি অংশ ; বিদ্যাদান ও শিক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাবের প্রয়োগ।

who are to be its successors in order to qualify them for at least keeping up and if possible for raising, the level of improvement which has been maintained." James & John Stuart Mill 'On education'. P 133

শিক্ষা অপরের সাহায্যে খানিকদূর অগ্রসর হলে পরে তবেই নিজের শেখার কাজ শুরু হয়, তখন শিক্ষার্থীর চরিত্র দানা বাঁধে এবং ইচ্ছাশক্তি ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী নিজেকে শিক্ষিত করতে সে সমর্থ হয়।

অ্যাডামস্ শিক্ষা প্রক্রিয়াকে নিম্নলিখিত ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। প্রথমত এটা হচ্ছে এমন একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া যেখানে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শিক্ষার্থীর স্বভাবের রূপান্তর ঘটে। দ্বিতীয়ত এই প্রক্রিয়া কেবল সচেতন নয়, সুপরিকল্পিতও। এখানে শিক্ষকের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর ক্ষমতার বিকাশ ও প্রয়োজন মত রূপান্তর সাধন। তিনি সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে প্রক্রিয়াটি চালু করবেন। তৃতীয়তঃ শিক্ষার্থীর স্বভাবের রূপান্তর ঘটানো হয় দুই উপায়ে। এক, প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব দ্বারা ছাত্রের ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে, দুই, নানা বিষয়ে জ্ঞান দান করে।

কোন্ বিশেষ লক্ষ্য অনুযায়ী ছাত্রদের স্বভাব বা ক্ষমতার রূপান্তর ঘটানো হবে? কোন্ মূল্যবোধ বা আদর্শে শিক্ষক নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করে ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করবেন? কোন্ শিক্ষা সবচেয়ে সার্থক শিক্ষা? দুঃখের বিষয় স্বীকার করতেই হয় যে এই সমস্ত মৌলিক প্রশ্নগুলির সর্ব্ববাদীসম্মত অভ্রান্ত উত্তর পাওয়া যায় না। প্রত্যেক কালেই এই প্রশ্নগুলি আলোচিত হয় কিন্তু কি অতীতে কি বর্তমানে এর সর্ব্বজনগ্রাহ্য জবাব মেলেনা। অ্যারিষ্টট্ল বলেন "সৎভাবে গড়ে তোলার জন্য বা ভালভাবে বাঁচবার জন্য তরুণদের কি শিক্ষা দেওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কোন সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। বোধির চর্চা (intellect) না চরিত্রগঠন কোনটাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে সে বিষয়েও সবাই একমত নন। শিক্ষার নানা লক্ষ্যের কথা শোনা যায়। প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা হতে যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য আমরা প্রণিধান করতে চেষ্টা করি তাহলেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কেউ নিশ্চিতভাবে জানেন না যে শিক্ষার উদ্দেশ্য জীবিকা উপার্জ্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক শিক্ষাদান অথবা শিক্ষার লক্ষ্য মানুষের চরিত্রের সদ্‌গুণাবলীর বিকাশ, অথবা কোন গূঢ় জ্ঞানের সাধনা করাই শিক্ষার একতম লক্ষ্য। সবমতের স্বপক্ষে যুক্তি আছে, সমর্থকও আছে। কিন্তু গোড়াতেই দেখি শুভ বা মঙ্গলজনক কি সে সম্বন্ধেও সকলের মতৈক্য নাই। তাই যদি হয় তবে শিক্ষা কেমন করে দেওয়া হবে সে বিষয়ে যে মতভেদ ঘটবে সে তো প্রত্যাশিত."[১]

১। অ্যারিষ্টট্ল—পলিটিক্স VIII পৃঃ ২

মতভেদের কারণ কিন্তু পরিষ্কার। নান বলেন "শিক্ষার উদ্দেশ্য ও জীবনের উদ্দেশ্য পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।"[১] সুতরাং যতদিন বিভিন্ন মানুষের জীবনাদর্শ বিভিন্ন থাকবে ততদিন শিক্ষার উদ্দেশ্যও বিভিন্ন হতে বাধ্য। উনবিংশ শতাব্দীর অজ্ঞাবাদী দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিপূর্ণ জীবন যাপন। জেস্যুইট মতের প্রবর্তক লয়লা তাঁর জীবনের সকল প্রয়াস ঈশ্বরের মহিমা কীর্তনে নিয়োগ করেছিলেন। প্যারাডাইস লষ্টের লেখক মিল্টন বলেন শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে, আমাদের আদিম পিতামাতার ভুলের ক্ষালনের নিমিত্ত, ঈশ্বরকে যথার্থ জানা, তাঁকে ভালবাসা, তাঁর গুণাবলীর অনুকরণ, নিজেদের চরিত্রে সেই গুণাবলীর পরিস্ফুটন। এর সঙ্গে ঐশী করুণার যোগে আমরা তাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি ও সর্বোত্তম পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারি। এর জন্য চাই ঐশী করুণা, যা আমাদের চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের জীবনের পরমলক্ষ্য ঈশ্বরমিলনকে সম্ভব করে তুলবে।"[২] লয়লা এবং মিলটনের দৃষ্টি অমর্ত্যলোকের দিকেই নিবদ্ধ ছিল। অন্যপক্ষে রয়েছে স্পেন্সার বর্ণিত জীবনের আদর্শ মর্ত্যজীবন। এই দুই বিপরীত আদর্শকে মেলাবার চেষ্টা বৃথা।

শিক্ষা যে দর্শনের গতিময় ব্যবহারিক দিক—উদাহরণ দিয়ে এই তত্ত্বটা বিশদ করে ব্যাখ্যা করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। এইটি দর্শনের কয়েকটা তত্ত্ব ও শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া পাশাপাশি রেখে দেখাতে চাই। শুধু এই উপায়েই হয়তো নানা প্রকারের ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করে একটা সুদৃঢ় প্রত্যয়ের ভূমিতে শিক্ষাদর্শনকে স্থাপন করা সম্ভব হবে।

দর্শনের উপরই শিক্ষা যে মূলত নির্ভরশীল তার আরও একটি প্রমাণ এই যে মহান্ দার্শনিকরা মহান্ শিক্ষাবিদ্‌ও বটেন। শিক্ষা সংক্রান্ত ইতিহাসের পাতা উল্টোলে দেখা যায় সমস্ত শিক্ষা আন্দোলনই কোন না কোন দর্শনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছে। শিক্ষার ইতিহাসে যে সব অসামান্য নাম লক্ষ্য করা যায়, সেগুলি দর্শনের ইতিহাসে যে সব বিখ্যাত নাম পাই তাদের থেকে অভিন্ন। এর কারণ আমরা আগেই দেখেছি। প্রকৃত দার্শনিক যিনি তিনি শিক্ষাবিদ্ না হয়ে পারেন না। কয়েকটা উদাহরণ নেওয়া যাক্। সক্রেটিস তাঁর দার্শনিক চিন্তা নিজে লিপিবদ্ধ করে রেখে যান নি। সুতরাং তাঁর গুণমুগ্ধ শিষ্য প্লেটো অথবা বিপক্ষীয় নিন্দুক

১। নান। এডুকেশন ইট্‌স্ ডাটা

২। Milton : Tractate on Education.

অ্যারিস্টোফিনিসের রচনার ভিতর দিয়েই তাঁকে জানতে হয়। অবশ্য সেইসব রচনায় তাঁর মত সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় পাই অথবা তাতে কিছুটা নাটকীয় অতি-শয়োক্তির মিশ্রণ প্রবেশ করেছে তা আমরা সঠিক জানিনা। যা আমাদের গোচরে এসেছে তা প্রকৃতই সক্রেটিসের নিজস্ব চিন্তা বা শিক্ষা কিনা তা না জেনেও একটা কথা বলা যায় যে তিনি গতানুগতিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে সোফিষ্ট অথবা গ্রীসের এক কূটতার্কিক গোষ্ঠীর লোক বলে ধারণা করে নিন্দামন্দও করেছেন। তাঁর অপরাধ তিনি গ্রীক তরুণদের নাগরিক জীবনে উন্নতির সহায়ক হবে মনে করে যুক্তিতর্ক ও বাগ্মিতায় পারঙ্গম করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু যা সুবিধাজনক তাই সত্য—এই মতের তিনি তীব্র বিরোধী ছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল যুক্তিনিষ্ঠ হলে জীবনের সঙ্গে মোকাবিলা করার কৌশল আয়ত্ব করা সম্ভব। বলিষ্ঠ যুক্তিদ্বারা নিজস্ব মন্তব্য উপস্থাপন করার শিল্প তিনি শিক্ষা দেন।

সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন সত্যের কিছু শাশ্বত ধারণার প্রয়োজন আছে। আমাদের নৈতিক বিচারের মানদণ্ড হবে সেই শাশ্বত প্রত্যয়গুলি। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে বিশ্বের সমস্ত বস্তুর অন্তরে বিধৃত আছে কতগুলি চিরন্তন ভাবসত্তা (universal ideas)। সেই ভাবসত্তার পরিচয় পেতে পারেন শুধু নির্ভীক সত্যানুসন্ধানী। এই ভাবসত্তাগুলি সমস্ত মানুষের চিত্তে সুপ্ত (latent) রয়েছে। তাদের চৈতন্যে সেগুলি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে হবে। এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে সক্রেটিস তার পরিচিত সকল জনের চৈতন্যে এই ভাবসত্তাগুলি স্ফুরণের চেষ্টা করতেন। এভাবে দেখা যায় তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শন তাঁকে শিক্ষকতার কাজে প্রবুদ্ধ করে।

এথেন্সের বাজারে তাঁর মত প্রচার, যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা ইত্যাদি শিক্ষা ব্যতীত অন্য কিছু তো নয়।

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষক বলে তিনি আজও সম্মানিত। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আজও অচেতন বা সচেতন ভাবে তাঁর বিশিষ্ট শিক্ষাব নীতি অনুসরণ করে, প্রশ্ন ও প্রতিপ্রশ্নের দ্বারা অধীত বিদ্যাকে স্পষ্ট করে তোলা হয়।

সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো দার্শনিকোত্তম বলে নন্দিত। দর্শনশাস্ত্রে তাঁর দান অপরিমেয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার জগতে তাঁর প্রভাব অতিশয় গভীর। তাঁর মূল দার্শনিক তত্ত্ব আমরা পরে আলোচনা করব। ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা উচিত যে তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থখানি যাবতীয় শিক্ষাবিদদের দ্বারা আদর্শ শিক্ষাগ্রন্থ বলে

আদৃত। অথচ বইটির প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়লে দেখা যায় সক্রেটিস ও তাঁর সঙ্গীরা ন্যায়বোধের প্রকৃত সংজ্ঞা অনুসন্ধান করছেন যা সম্পূর্ণতই একটি সূক্ষ্ম দার্শনিক বিষয়। অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে, অনেকটা গল্পের মত প্রথমে দেখানো হয় যে ন্যায়নীতির অনেক প্রচলিত সংজ্ঞা অগভীর ও গ্রহণযোগ্য নয়। তার পরে তিনি এক কাল্পনিক রাষ্ট্রের ধারণা দিলেন যেখানে প্রকৃষ্ট ন্যায়নীতি বিরাজ করে। কিন্তু ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের জন্য ন্যায়পরায়ন সুনাগরিক সৃষ্টির সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কাজেই, কি করে তাদের সুশিক্ষা দেওয়া যায় সক্রেটিস সেই বিষয়েও আলোচনা করেছেন। এর ফলে প্লেটোর ন্যায় নীতির সম্বন্ধে লেখা বিখ্যাত দার্শনিক গ্রন্থ 'রিপাবলিক' শেষ পর্য্যন্ত হয়ে দাঁড়ালো একটি উৎকৃষ্ট শিক্ষাগ্রন্থ। রিপাবলিক বইটির অনেক জায়গায় সরাসরি শিক্ষাদান বিষয়েই আলোচনা রয়েছে।

এই বইটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে শিক্ষা যদি দর্শনের একটি ব্যবহারিক দিক্ হয় তবে রাজনীতিও দর্শনের আরেকটি ব্যবহারিক রূপ। আমরা যে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ দেখি তাদেরও উদ্ভব বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে। আমাদের উদার গণতন্ত্রের মূলে যে দার্শনিক প্রত্যয় আছে সেগুলি ফ্যাসীবাদ, নাজীবাদ, কম্যুনিজ্‌ম্ ইত্যাদি রাজনৈতিক দর্শন থেকে ভিন্ন। কোন দেশের রাজনীতি সে দেশের দর্শনের প্রত্যক্ষ বাস্তব রূপ। রাজনীতি আবার নিজেকে দৃঢ়মূল করার জন্য দেশের শিক্ষানীতি ও পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে। উদাহরণ স্বরূপ দেখানো যায় যে নাৎসী জার্মানীর কঠোরভাবে শৃঙ্খলিত শাসনব্যবস্থা ও বৃটেনের উদারপন্থী (liberalism) স্বাধীন গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে বিরাট পার্থক্য। বৃটেনে ভোটদাতাদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নতি সাধন করা হয়েছে, এই বিশ্বাসে যে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য শিক্ষা অপরিহার্য্য। এমনি ভাবে যে কোন দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক মতবাদ ও অনুরূপ শিক্ষাব্যবস্থার উদ্‌গম হয়। দার্শনিকশ্রেষ্ঠ অ্যারিস্টটলের লেখায়, দর্শন রাজনীতি ও শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের আরো কিছু উদাহরণ পাই। অ্যারিষ্টটলের বাস্তববোধ সম্পন্ন অনুসন্ধিৎসার দরুণ তাঁকে বর্তমান বিজ্ঞানের জনক বলে অভিনন্দিত করা হয়। তাঁর জীবনদর্শন কি? তাঁর মতে নৈতিক বুদ্ধি বা ধর্মজ্ঞান (virtue সমস্ত সুখ ও শুভ'র মূল। এই শুভবুদ্ধি ও ধর্মজ্ঞান শুধু নিরুদ্যম চিন্তন ও মনন নয়। শুভকাজ করা ও শুভজীবন যাপন করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

তাঁর নির্দেশিত শুভজীবন যাপন ও শুভ কার্য্যক্রমের পরিচয় যথাক্রমে তাঁর "এথিক্স্" ও "পলিটিক্স" বই দুটিতে পাওয়া যায়। "পলিটিক্সে"র অনেকটা অংশের সন্ধান পাওয়া যায় না, কিন্তু বাকি অংশের বহু জায়গায় শিক্ষা সম্বন্ধে মতামত আছে। আধুনিক অনেক শিক্ষা বিষয়ক পুস্তকের তুলনায় এই সুপ্রাচীন দার্শনিকের মতামত বিস্ময়করভাবে সাম্প্রতিক ও প্রণিধানযোগ্য।

দর্শনের ওপর শিক্ষার নির্ভরশীলতার সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ যীশুখ্রীষ্টের জীবন ও তাঁর শিক্ষা (বাণী)। খ্রীষ্টধর্মের প্রবর্তক এই পরমপুরুষ রাজনীতি নিয়ে বিশেষ ভেবেছেন বলে জানা যায় না কিন্তু তাঁর শিষ্যদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে তিনি বিশেষ ভাবে সক্রিয় ছিলেন। তাঁর সমগ্র নরজীবনে তাঁর এই ধ্রুব বিশ্বাসে তিনি অটল ছিলেন যে ঈশ্বর সকলের পিতা। তাঁর 'Sermon on the mount' এ (পর্ব্বত-প্রবচনে)ও তিনি এই শিক্ষা দিয়েছেন যে ঈশ্বর বাস্তবিকই সব মানুষের পিতা এবং এক জনকের সন্তান হওয়ার দরুণ সমস্ত মানুষ পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধে যুক্ত। ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে এই যে সম্বন্ধ, তিনি নিজে যে কেবল তারই জীবন্ত প্রতীক ছিলেন এমন নয়, মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ তাও নিজের জীবনে রূপায়িত করেছিলেন। তাঁর কথা ও গল্পের মধ্য দিয়ে তাঁর নিজস্ব দর্শন প্রচার করেছেন। এই প্রচার শিক্ষাদান ভিন্ন কিছু নয়।

এমন আরো কয়েকজন দার্শনিকের দর্শন ও শিক্ষা তত্ত্বের নৈকট্য উদাহরণ স্বরূপ দেখানো যায়। প্রথমে ধরা যাক্ সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের দার্শনিক জন লককে। অ্যাডাম্স্ বলেন, "আমাদের চিন্তাধারার ওপর লকের প্রভাব তাঁর খ্যাতির চেয়েও বেশি বিস্তৃত। লকের অধিকাংশ অনুগামী আমাদের মত সাধারণ বুদ্ধিমান মানুষ। তারা জানেনই না যে তাঁরা লকের মত ও পথের অনুসরণ করছেন। তাঁর মতামতের সঙ্গে সাধারণ বোধবুদ্ধিযুক্ত মানুষের এতটাই মতের মিল যে তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা, অন্য সমস্ত দার্শনিকদের অনুগামীদের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী বিশেষ করে ইংরেজ ভাষাভাষীদের দেশে (যেখানে লক জন্মেছিলেন)। বলতে গেলে, প্রতিটি শিশুই হয়তো বা বড়ো হয়ে হবে, প্লেটো-অনুগামী বা অ্যারিষ্টট্ল-পন্থী। কিন্তু জগতের অন্য জায়গায় অন্যান্য দার্শনিক-দের প্রভাব যাই হক না কেন, ইংরেজি ভাষাভাষীর দেশে সব শিশুই হবে লক্-অনুগামী। তার প্রভাব ইংল্যাণ্ডে এতটাই সর্ব্বব্যাপী।"[১]

লক্ নিজে সত্যসন্ধানী ছিলেন বলে, বিশ্বাস করতেন যে আমাদের মন সত্যকে

১। হার্বার্টিয়ান সাইকোলজি। পৃঃ ৩৩। স্যর জন অ্যাডাম্স্।

উদঘাটন করতে পারে যদি মনকে সেভাবে শিক্ষিত করা যায়। তাই শিক্ষা বলতে তিনি বুঝতেন বোধির (intellect চর্চা। লকের মতবাদ তাঁর বিখ্যাত দুটি বই, "এসেজ অন হিউম্যান আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং" এবং "ইটস্ কনসার্নিং এডুকেশনে" প্রতিভাত।

পাঠকেরা প্রখ্যাত দার্শনিক জ্যাঁ জাক্ রুশোর লেখা হতেও দর্শন ও শিক্ষার নিকট সম্বন্ধ লক্ষ্য করতে পারেন। 'সোস্যাল কন্ট্র্যাক্ট' বইতে রুশো দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে মানুষের মধ্যে এক চুক্তির ফলেই শাসনতন্ত্র (government) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে শাসন করবার ক্ষমতা কয়েকজনের হাতে দেওয়া হয়। তাঁদের সেবার বিনিময়ে তাঁরা অন্যান্য সকলের সাহায্য ও বশ্যতা পাবেন। অতএব সমাজ বস্তুটা ব্যক্তির ওপর বাইরে থেকে চাপানো। মানুষকে সেবা করার জন্য পরিকল্পিত এই প্রতিষ্ঠানের নাম সমাজ এবং যতক্ষণ এই প্রতিষ্ঠান ঠিক মতন কাজ করে চলেছে ততক্ষণই এর প্রয়োজন। খুব সহজেই কিন্তু সমাজ লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। রুশো তাঁর সমসাময়িক কালে দেখেছেন মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্ট এই সমাজ শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমানুষের মঙ্গল করার পরিবর্তে, নিজেই নিজের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষকে বলি দিয়ে নিজের শ্রীবৃদ্ধি করে চলেছে। এর প্রতিবাদে তিনি "এমিল" নামে শিক্ষাগ্রন্থে, একটি আদর্শ শিক্ষার পরিকল্পনা করেছেন যাতে এমিল নামের একটি কাল্পনিক বালককে সমাজ হতে বাইরে প্রকৃতির মাঝখানে নিয়ে গিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

উদাহরণের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই। দার্শনিকদের শিক্ষাবিদে পরিণত হওয়ার একটা অনিবার্য্য ঝোঁক আগেও যেমন ছিল, আজও তেমনি আছে। জর্জ বার্ণার্ড শ, এইচ. জি. ওয়েল্স্, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, এ. এন. হোয়াইটহেড, অলডাস হাক্সলী ও সমসাময়িক অনেক চিন্তাবিদের লেখাতেই দেখতে পাই তাঁরা প্রথমে কোন না কোন জীবনদর্শন প্রচার করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ে তাঁদের মতামত লিপিবদ্ধ করেছেন। পরে আমরা আমেরিকান দার্শনিক শিক্ষাবিদ্ ডিউইর অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী মতামত আলোচনা করব। ডিউই মোটেই আমাদের এই ধারণা মেনে নেবেন না যে দর্শনকে অনুসরণ করে শিক্ষাধারার সৃষ্টি হয়। ডিউইর মত ঠিক এর বিপরীত। তিনি বলেন যে কোন দর্শন যদি প্রয়োগযোগ্য হয় অর্থাৎ ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটায় তবেই তা শিক্ষার অথবা রাজনীতির তত্ত্ব হয়ে উঠতে পারে, কেন না যা কার্য্যকরী তাই শুধু মাত্র সত্য।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও আধুনিক জীবনবাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক

দেখতে পাওয়া যায় কি ? কেননা এতক্ষণ পর্যন্ত যা বলা হয়েছে তা যদি সত্যি হয় তবে আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি ও তত্ত্বে আমাদের প্রধান প্রধান চিন্তাধারার প্রতিফলন লক্ষ্য করা উচিত। এবং যদি একথা সত্য হয় যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি হতেই শিক্ষার ক্রিয়া করণের উদ্ভব তবে এও প্রত্যাশা করা সঙ্গত যে আমাদের জীবনদর্শনের ধারণা প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার চেয়ে কিছুটা এগিয়ে থাকবে।

আরেকটা কথা। মানুষের চিন্তা ধ্যান ধারণা সাধারণতঃ নির্দিষ্ট গণ্ডীতে না থেকে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রসারিত হয়ে পড়ে। যেমন, উনবিংশ শতাব্দী মুখ্যতঃ যন্ত্রযুগ, তাই অবাক হবার কিছু নেই যখন লক্ষ্য করি যে জীবনের অন্যান্য ব্যাপারেরও যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা বিশ্বকে এক বিশাল যন্ত্র বলে ব্যাখ্যা করার দুঃসাহসিক চেষ্টা করেছেন। লড কেলভিন তো আলোর একটি বিশেষ তত্ত্বকে, এই যুক্তিতে বর্জনই করলেন যে একে যান্ত্রিকভাবে প্রমাণ করার জন্য কোন মডেল তৈরী করা যায় না। যান্ত্রিকতা, পদার্থবিদ্যা ছাড়া অন্যান্য বিদ্যার ক্ষেত্রেও অনুপ্রবেশ করেছে, বিশেষ করে অর্থনীতি ও মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। ফলে বিদ্যার এই ক্ষেত্রগুলিতে একটা প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়েছে মানবিক উপাদানকে অগ্রাহ্য করার কিংবা নস্যাৎ করে দেবার। মনোবিজ্ঞান (psychology) এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যার চাপে বোধকরি সবচেয়ে বেশী বিড়ম্বিত। কারণ 'মন' নামে দুর্বোধ্য একটা ধারণার ওপর মনোবিজ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত করায় আমাদের অনিচ্ছা লক্ষ্য করা যায়। মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুষঙ্গবাদীরা (associationists) মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা করেন রসায়ন শাস্ত্রের অনুকরণে। ব্যবহারবাদীরা (Behaviourists) মানুষের উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াকলাপের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। এভাবে ব্যবহারবাদীরা মনোবিজ্ঞানকে অন্যান্য সঠিক (exact) বিজ্ঞানের সারিতে বসানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু চোরা-বালির উপর সৌধ নির্মানের মত সে চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে। কেননা এমন কি বৈজ্ঞানিকেরাও অনেকেই জড়জগতেরও একান্ত যান্ত্রিক ব্যাখ্যাকে অগ্রাহ্য করেন। কাজেই দেখা যায় বিজ্ঞানীরাও ভাবছেন যে বিশ্বজগৎ রচনার পেছনে এক রহস্যময় শক্তি আছে যাকে যান্ত্রিকতা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না এবং মানুষের আবেগ ইচ্ছা ইত্যাদি মানসিক অবস্থাকে যান্ত্রিক ব্যাখা দিতে অনেকেই চান না।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও দার্শনিক স্যার জেম্‌স্ জীন্‌স্ বলেন, "যন্ত্রবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক উভয় ক্ষেত্রেই নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।"[১]

---

[১] দি মিষ্টিরিয়াস্ ইউনিভার্স্—স্যর জেম্‌স্ জীন্‌স্ পৃঃ১৪৩

জীবনের সাধারণ ধারণা ও দর্শন শিক্ষাতত্ত্বকে কি রকম প্রভাবিত করে তার নিদর্শন উনবিংশ শতাব্দীর জীববিদ্যার তত্ত্বে সর্ব্বসাধারণের আগ্রহ। জীববিদ্যা এবং বিবর্তন তত্ত্ব (notion of evolution) সমাজের সকল ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যাতেই প্রযুক্ত হয়েছে। এই তত্ত্ব বলে উচ্চস্তরের প্রাণী নিম্নস্তরের প্রাণী-স্তর হতে ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। এই বিবর্তন ছেদহীন, মসৃণ ও ক্রমাগত। এই তত্ত্ব বিজ্ঞানের অন্য সমস্ত তত্ত্বের থেকে বহুল প্রচারিত ও স্বীকৃত। এমন কি স্থাপতিবিদ্যা, আইন, ইতিহাস, ধর্ম সমস্ত কিছুকেই বিবর্তনের ক্রমান্বিত প্রক্রিয়া ও ফল বলে দেখানো সম্ভব। লামার্ক ইত্যাদি নবডারুইনপন্থীরা জীবদেহের বাইরের পরিবেশ কিভাবে তার ক্রমবিবর্তনে সাহায্য করে সে নিয়ে নতুন তত্ত্ব রচনা করেছেন। এও কিন্তু এক ধরণের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা। অর্থাৎ অচেতন জড় জগৎ সচেতন জীবজগতের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। বেঁচে থাকার জন্য প্রাণীদের মধ্যে পরস্পর সংগ্রাম (struggle for existence) ও যোগ্যতমের টিঁকে থাকার তত্ত্ব (survival of the fittest) এক প্রকারের জীবনাদর্শে পরিণত হয়েছে। এই তত্ত্ব মানুষের সমস্ত প্রকারের কুৎসিৎ প্রতিযোগিতা ও রেষারেষির সমর্থনে ব্যবহৃত হয়েছে। এই ধরণের চিন্তাধারার অসঙ্গত প্রসার প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দারুণ পরিণামে যথেষ্ট সাহায্য করে। যুদ্ধোত্তর কালেও এই জীবন-বেদের অন্যায্য ব্যবহার সর্ব্বত্র দেখা গেছে।

এই সঙ্গে বিবর্তন বাদের আরেকটি বাঞ্ছনীয় ব্যাখ্যা পাই। এই বিকল্প ব্যাখ্যায় প্রাণীর অদম্য জীবনস্পৃহা (elan vital) বাঁচবার ইচ্ছাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা প্রাণী পরিবেশ হতে যতদূর সম্ভব সুবিধা আদায় করে নিতে পারে এবং ধীরে ধীরে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি বিধান এবং প্রয়োজন মত পরিবর্তন সাধন করতে পারে। এই তত্ত্বের ফলে এক আশাবাদী দর্শনের উদ্ভব হল। এর মতে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া ও পরিবেশের উপযোগী পরিবর্তন সাধন প্রাণীর দ্বারা সম্ভব। বার্নার্ড শ তাঁর "ব্যাক টু মেথুসেলা" গ্রন্থে এই তত্ত্বটিই বিশদ করে দেখিয়েছেন যে প্রাণী বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে অবশেষে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে সক্ষম। শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই বিশ্বাস জন্মাল যে শিশুর মধ্যে যেহেতু প্রগতি ও পরিবর্তনের ক্ষমতা রয়েছে তাই তার ফলে মানুষের সমাজও ক্রমে এগিয়ে চলবে।

বর্তমান শতাব্দীর চিন্তাধারা ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক খুঁজতে গেলে দুটি ধারা সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমতঃ নিছক তর্কশাস্ত্রের প্রতি কিছুটা অনাস্থা।

দ্বিতীয়তঃ সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে আগ্রহ। এই দুটি ধারাকেই বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

উনবিংশ শতাব্দীর একটী বিশেষ লক্ষণ, বুদ্ধিবৃত্তির ওপর অনেকটা গুরুত্ব আরোপ (intellectualism)। মানুষের বুদ্ধি ও মনন ক্ষমতার ওপর এই শতকে অত্যধিক আস্থা স্থাপন করা হয়। মানুষ স্ববুদ্ধি দ্বারাও বিজ্ঞানের আরোহ প্রণালী (inductive reasoning) প্রয়োগ করে নানাবিধ বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করায় সকলে দৃঢ়নিশ্চয় হয়েছিলেন যে অনন্ত কালাবধি এই প্রগতি অব্যাহত থাকবে। মানুষ তার বুদ্ধির সাহায্যে সমস্ত সমস্যার মোকাবিলা করতে পারবে। সাধারণ মানুষ জ্ঞান বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মূল্য সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তো তুললই না বরং সাগ্রহেই সেই সব পত্রিকা ও পুস্তক পড়তে লাগলো যার থেকে নিজেরাই এ বিষয়ে কিছু জানতে পারে। ব্যবসায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন প্রকাশকরাও 'নিজে শিখুন' সিরিজের বই মারফৎ বিজ্ঞানের জ্ঞান বিতরণ করতে লেগেছিলেন। বিজ্ঞানে মানুষের এই নির্ব্বিচার বিশ্বাস সাইমণ্ড্স্ নিম্নলিখিত সুন্দর কবিতায় প্রকাশ করেন।

These things shall be ! A loftier race
Than ever the world hath known shall rise
With flames of freedom in their souls
And light of science in their eyes.

স্বভাবতই এই বিশেষ যুগের দাবী হল, সার্ব্বজনীন (universal) শিক্ষা। ১৮৭০ সালে ইংল্যাণ্ডে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা বিল পাশ হল। যুগের এই আবহাওয়ায় স্কুলের সমস্ত পাঠক্রম ও যে মননশক্তির চর্চাতে পরিণত হবে তাও প্রত্যাশিত। জ্ঞানই মানুষের পরমার্থ অন্ততঃ পক্ষে পরমার্থে পৌছুবার উপায় বলে স্বীকৃত হল তরুণ শিক্ষকদের জ্ঞান বিতরণ করার সূক্ষ্ম কলাকৌশল শেখানো হতে লাগলো, এগারো বৎসরের শিশুদের দুরূহ বিজ্ঞানের সমস্যাবলী বুঝিয়ে দেওয়াই শিক্ষার পরাকাষ্ঠা বলে গণ্য হতে লাগল। কিছু ভাল কাজ যে হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণভাবে অনেক বিদ্যালয়ই যা হয়ে উঠেছিল তাকে অ্যাডাম্‌সের ভাষায় জ্ঞান-বিপণী বলা চলে। শিক্ষকরা অবতীর্ণ হলেন তথ্যপসারীর ভূমিকায়। অধিকাংশ সময়েই শিক্ষকরা মনে করতে থাকলেন যে যেন তেন প্রকারেণ যতটা সম্ভব বিদ্যা ছাত্রদের মাথায় কোনক্রমে ঢুকিয়ে দেওয়াই তাঁদের একমাত্র কর্তব্য। বস্তুর সাহায্যে শিক্ষাদান (object

lesson) শিক্ষার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ালো। কেমন করে মোমবাতি জ্বলে অথবা লোহার দণ্ডকে কি বিশেষণে অভিহিত করা যায় তার চর্চা ভারী দরকারী বলে বোধ হতে লাগলো। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন পুস্তক রচনা হতে লাগলো। সেগুলি প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ক্লাসে পড়া হলেই সকলে বিজ্ঞানের নির্ভুল জ্ঞান লাভ করবে এমনি বিশ্বাস জনপ্রিয় হল। রস সকৌতুকে মন্তব্য করেছেন যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপর আস্থা যতই গভীর হোক্ শিখবার পন্থা ততটা নিখুঁত ছিলনা, কেন না তাঁর নিজের আট বৎসর বয়সে তিনি তাঁর ক্লাসের ছেলেদের সঙ্গে সমস্বরে মুখস্থ করেছিলেন যে বায়ু, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বনিক অ্যাসিড সমবায়ে তৈরী. শেষোক্ত বাষ্পীয় পদার্থটিকে তিনি আবার বাড়ীতে ব্যবহৃত একটি সাবানের (কার্বলিক সাবানের) সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতেন। সুতরাং অন্ধের মতন মুখস্থের দ্বারা বাস্তবিক পক্ষে বৈজ্ঞানিক বোধের জাগরণ হয় না। বিজ্ঞানের বই পড়া নিতান্ত অর্থহীন আচারে পরিণত হতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রায়ই স্কুলের ছাত্ররা পুঁথিগত তথ্য বিজ্ঞানের নামে গলাধঃ-করণ করত। কাজেই দেখা যায় যে বিজ্ঞানের আলো ভ্রান্তিপ্রবণ মানুষের আবেগ (passion) ও ইচ্ছা (will) কে বিশেষ স্পর্শ করে না। আজ আমরা মানুষ ও তার মননশীলতার (intelletion) অসাধারণ ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছি। যুক্তি ও মননের দ্বারা সমস্ত প্রকৃত সত্যের উদ্ঘাটন সম্ভব নয়। এমন কি আমাদের প্রাত্যহিক আচার আচরণের ব্যাপারেও বুদ্ধি কোন অভ্রান্ত নীতি নির্দ্দেশ করতে পারেনি। সমস্ত বিশ্বজগতের বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিতে প্রস্তুত হওয়ার বদলে বৈজ্ঞানিকেরাও বিশ্বের অন্তর্নিহিত এক গূঢ় রহস্যের কথা স্বীকার করেছেন। মনন ও চিন্তন দিয়ে বিশ্বসত্তার (Reality)র গূঢ় রহস্য ভেদ করা যায়নি। মননশীল ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আমরা কেবল তার চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরছি।

অবশ্য সাধারণভাবে অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসগুলির পুনর্জন্ম ঘটেছে এতটা দাবা করা বাড়াবাড়ি হবে। তবে কোন কিছুতে বিশ্বাস করার জন্য একটা আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। সৎ ও উৎসাহী প্রচারকদের বাণী শোনার জন্য মন্দির প্রাঙ্গনে গীর্জ্জায় এখনও যথেষ্ট জন সমাগম হয়। এমন কি বেতারেও ধর্ম্ম ও দর্শন-চর্চা বেশ জনপ্রিয়। কেউ কেউ কিছু স্থুল (crude) ধর্মবিশ্বাস আঁকড়িয়ে আছেন যার মূলে কোন সুদৃঢ় ভিত্তি নেই। কুসংস্কারও সমাজে দৃঢ়মূল। অবশ্য যাঁরা কিছুটা খুঁৎখুতে যুক্তিবাদী তাঁরা এমন ধর্ম্মবিশ্বাসকে আশ্রয় করলেন যাকে বুদ্ধি ও

যুক্তি দিয়ে সমর্থন করা চলে। উনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবিদের ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমান করে বিজ্ঞানের প্রচার সত্ত্বেও বেশ কিছু প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাস বিংশ শতাব্দীতে টি'কে রইল। যুক্তিবাদীরা এই যুদ্ধ জয় করতে পারেন নি। অবিমিশ্র যুক্তিবাদ মানুষের সমস্ত কার্য্যকারণ ব্যাখ্যায় আশানুরূপ ফল দেয় নি। বর্ত্তমান যুগে মানুষ ধর্ম্মবিশ্বাস বজায় রেখেও যুক্তিবাদী হিসাবে সম্মান পেতে পারে। অনেকে আগের মত আবার বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে চরম সত্তার স্বরূপ বিমূর্ত্ত। এটি জড়বস্তু অথবা যন্ত্র নয়। বস্তু বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ নিজেকেই কোনদিন ব্যাখ্যা করতে পারবে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

স্কুলেও একমুখী বৈজ্ঞানিক মননশীলতার বিপরীত দিকে একটা ঝোঁক (tendency) দেখা যাচ্ছে। বুদ্ধির পরীক্ষা নিয়ে দেখা যে আমাদের বহু ছাত্রই বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তিতে উৎকৃষ্ট নয়। যদি কেউ তা হয়ও তবু শুধুমাত্র বুদ্ধির চর্চা বা মননশীলতার শিক্ষা তার পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে সব পরীক্ষাতে শুধুমাত্র বুদ্ধির যাচাই করতে চাওয়া হয়, অতিরিক্ত বাড়ীর কাজ ইত্যাদি দিয়ে শুধুমাত্র বুদ্ধির চর্চা ছাড়া ছাত্রদের চরিত্রের অন্যান্য দিক ও আগ্রহকে অগ্রাহ্য করা হয় সেসব পরীক্ষাকে আজকাল নিন্দা করা হচ্ছে। অ্যারিষ্টটলের মতন. আধুনিক মানুষও আজ হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ তাঁর ইচ্ছাশক্তি, মননশক্তি নয়। আধুনিক শিক্ষা, মানুষের আবেগজীবনকে সংহত করে তার মনোজগতের সংস্কার সাধন করে জ্ঞানের চেয়ে কর্ম্মকে মহত্তর স্বীকার করে, চরিত্রগঠনকে সর্ব্বাধিক মর্য্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী। বহু বুদ্ধিজীবিও আজ বাইবেল ও অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠের সপক্ষে, অপ্রত্যাশিত ভাবে মত প্রকাশ করছেন, বুদ্ধির অবিমিশ্র চর্চা ও তথ্য সংগ্রহ করার ঝোঁক সম্বন্ধে এখন যে অনাস্থা দেখা যায় তা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এর ফলে হয়তো আরো সার্থক শিক্ষার উদ্ভব হবে এবং শিক্ষা দেওয়ার জন্য যতখানি প্রয়াস করা হয় তার উপযুক্ত সিদ্ধিলাভ হবে।

বিংশ শতাব্দীর চিন্তাবিদদের মনন কর্মে যে ভাঁটা পড়েছে এমন নয়। চিন্তন ও যুক্তিপ্রয়োগই যে অন্তিম সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনের অভ্রান্ত উপায় নয়, এটা এখন মেনে নেওয়া হয়েছে। তবে একথা সত্য যে চিন্তনের বা যুক্তির ব্যবহারও সর্ব্বদাই থাকবে। কেননা কোন্ স্বীকার্য্য (postulate) দিয়ে অন্তিম সত্যকে বিশ্লেষণ করা সম্ভব, প্রত্যক্ষ ঘটনার সঙ্গে তার সঙ্গতি আছে কিনা, এবং তা গ্রহণযোগ্য কিনা সে সব বিচার যুক্তি ও চিন্তন দিয়েই করতে হবে। অর্থাৎ চিন্তন, বিশ্লেষণ ও বাছাইয়ের কাজ করবে।

যে সব স্বীকার্য্য আমাদের পরিচিত জগৎসংসার ও তথ্যের সঙ্গে খাপ না খায় সেই সব স্বীকার্য্যকে আমরা যুক্তি দিয়ে বর্জন করতে পারি। যুক্তি দিয়েই আবার আমাদের নিজস্ব ধারণা, তত্ত্ব ইত্যাদিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারি।

শুনেছি রাজনীতিক বার্ক, উন্মাদের মত (উদ্দীপনায়) তাঁর নিজস্ব পক্ষ মনোনয়ন করতেন ও দার্শনিকের মত তার সপক্ষে (যুক্তিনিষ্ঠ) তর্কযুদ্ধ চালাতেন। সেণ্ট টমাস অ্যাকুইনাস্ যদিও কয়েকটি গোঁড়া ধার্মিক বিশ্বাসের উপরই তাঁর দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তবু প্রতি পদক্ষেপে তীক্ষ্ণ যুক্তির প্রয়োগ করে তর্কসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছাতেই চেষ্টা করেছিলেন। আমরাও আমাদের তত্ত্ব ও বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। তবে আমাদের তর্কযুক্তি অন্ধ বিশ্বাসীর মত যুক্তিহীন ও পক্ষপাতদুষ্ট হলে আমরা তার নিন্দা করি। আমরা যুক্তিতর্কেও সুবিচার পরিমিতিবোধ ইত্যাদি গুণের প্রশংসা করি এবং আমাদের জীবন দর্শনে স্থিতধীর সমতা কামনা করি।

আধুনিক চিন্তা জগতের একটা বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে সমস্ত প্রকার মতবাদ ও দর্শনের পর্য্যালোচনা করা কারণ, বহুসংখ্যক লোক যা বিশ্বাস করে এবং বহুর দ্বারা গ্রহণযোগ্য যে মত তাতে কিছু পরিমাণ সত্য থাকা সম্ভব। এ যুগ সমন্বয়বাদী (eclectic)। যে দর্শন বা মতবাদ হতে যতটুকু বাঞ্ছনীয় ততটুকুই আহরণ করতে চায়। এখানেও হয় তো আমরা আপেক্ষিকতার তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত। আমরা বিরোধের চেয়ে সাদৃশ্যের ওপর বেশী গুরুত্ব দেই। গাণিতিকরা যেমন পৃথক সংখ্যা (factors বিশ্লেষণ করে সাধারণ গুণক (multiple) বের করে নেন তেমনি আমরাও পার্থক্যের মধ্যে ঐক্যে বিশ্বাসী।

ধর্ম চিন্তার ক্ষেত্রেও এই ধরণের একটা স্পষ্ট সমন্বয়বাদী ঝোঁক দেখতে পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দী যেমন বিভেদের যুগ। বিংশশতাব্দী তেমনি সমন্বয়ের কাল। ইংল্যাণ্ডে সেই সময়ে দেখা যাচ্ছে মেথডিষ্টদের সঙ্গে স্কটিশ প্রেস-বিটারিয়ান চার্চের মতের মেলবন্ধন হচ্ছে। খ্রীষ্টধর্মের সমস্ত শাখাকেই এক করবার একটা সবল প্রচেষ্টা চলছে, তবে কবে যে সেই আকাঙ্খিত মিলন ঘটবে তা এখনো বলা যায়না। কেউ কেউ সমন্বয়ের চেষ্টায় আরেকটু অগ্রসর হয়ে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে অন্যান্য ধর্মগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টাও করেছেন। ক্যানন স্ট্রীটার নামে এক খৃষ্টান দার্শনিক তাঁর "Reality" নামে বইটিতে ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনকে একসূত্রে বাঁধার চেষ্টা করেছেন। স্যর অলিভার লজ পদার্থ বিদ্যার সঙ্গে জন্মান্তরবাদ ও আত্মার অমরতায় বিশ্বাসকে মেলানোর চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে

বিভিন্ন বিষয়ের পারস্পরিক বিরোধ দূর করে সেগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার অনেক চেষ্টা করা হচ্ছে। জ্ঞানের কোন বিশেষ শাখাই সম্পূর্ণ সত্যকে লাভ করেনি, প্রত্যেকে পূর্ণ সত্যকে একটু একটু করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সুতরাং গোঁড়া একরোখা মতাবলম্বী লোকদের পরিহার করে সর্ব্বকালের সমস্ত জ্ঞানকে একত্র করে, সত্য সন্ধান করার চেষ্টা করছি আমরা। ফ্র্যাঙ্ক ওয়াট্‌স্ তাঁর "এডুকেশন ফর সেল্‌ফ্‌ রিয়ালাইজেসন এ্যাণ্ড্‌ সোস্যাল সারভিস্" গ্রন্থে বলেছেন, "আমরা প্রাচীন গ্রীকদের মত 'সর্ব্বমত্যন্তম্ গর্হিতম' এই বিশ্বাসে ফিরে যাচ্ছি এবং সঙ্গতি ও সমন্বয়ের অমূল্য মধ্যপন্থার সন্ধান করে চলেছি।"[১]

রাজনীতি ক্ষেত্রেও এ ধরণের প্রচুর সমন্বয়ের উদাহরণ দেখিয়েছেন রস্। বিশেষ করে বৃটেনের রাজনীতি পটে। যেমন উদারপন্থী (লিবারেল) ও গোঁড়া (কনজারভেটিভ) দলের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা আজ অবলুপ্ত। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই একটা সমন্বয়ী ঝোঁক দেখা যাচ্ছে।

শিক্ষাদানের ব্যাপারেও এই ধরণের সমন্বয়ের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এদেশে সম্ভবতঃ এমন কোন স্কুল নেই যেখানে শুধুমাত্র মণ্টেশ্বরী পদ্ধতি, ফ্রোয়েবেল্ পদ্ধতি বা ডাল্টন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়। বেশীর ভাগ স্কুলে পড়ানোর পদ্ধতিতে সমস্ত দর্শন ও পদ্ধতি হতেই প্রাণরস আহরণের চেষ্টা থাকে। এর কারণ কিছুটা মনঃস্তাত্ত্বিক। কোন নতুন ধারণা উদ্ভাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা প্রাচীন মতামত ও শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করি না। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিকে অনেকটা বজায় রেখে তার সঙ্গে কিছু কিছু নতুন চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি যোগ করি। পুরোনো পদ্ধতির যা মূল্যবান অংশ তা আমরা ধরে রাখবার চেষ্টা করি। প্রাচীন ও নবীনকে এইভাবে যুক্ত করেই উন্নততর শিক্ষাপদ্ধতির জন্ম হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আমরা শিক্ষাচিন্তার ক্ষেত্রেও ঐ একই সমন্বয়বাদী ধারা লক্ষ্য করি। জীবনে ও দর্শনে একীকরণ ও সমন্বয়ের প্রবণতা দেখা যায় বলে শিক্ষার লক্ষ্য নির্বাচনে ও সেই সমন্বয়ের চেষ্টা লক্ষিত হয়।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে বিভিন্ন দার্শনিক মতের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োগ লক্ষ্য করা হবে। আপাতদৃষ্টিতে এই মতগুলিকে যথেষ্ট ভিন্ন ও পৃথক বলে মনে হয়। কিন্তু তাই বলে, গোলমালের সম্ভাবনা এড়িয়ে শুধুমাত্র সেগুলোর বর্ণনা করেই আমরা ক্ষান্ত হবনা। বিভিন্ন মতের সম্যক্ আলোচনা করে এদের কোন একটিকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করারও চেষ্টা করব।

১। এডুকেশন ফর সেল্‌ফ্‌ রিয়ালাইজেসন এ্যাণ্ড সোস্যাল সারভিস্—ওয়াট্‌স্।

এদের পরস্পরের পার্থক্যের ভেদরেখা সম্পূর্ণ দূর করতে না পারলেও, এদের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য বের করে পরস্পরের মধ্যে যোগস্থাপনা করা অসম্ভব হবে না।

ওয়েলটন তাঁর 'হোয়াট ডু ইউ মীন বাই এডুকেশন' বইতে বলেছেন, "মানুষের জ্ঞান বড় খণ্ডিত ও তাদের অন্তর্দৃষ্টি অপরিণত ও আংশিক বলেই মানুষের পরমতম কল্যাণ (highest good) সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী মতবাদের জন্ম হতে পারে। জীবনের মৌলিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে আপাতবিরোধী মতামতগুলি বিশালতর পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা দরকার। বিচ্ছিন্নতা হতেই অসত্যের জন্ম হয়, তখন অর্ধসত্যকে পূর্ণসত্যের উচ্চাসনে বসানো হয়। জীবনের খণ্ডাংশকে অত্যধিক মূল্য দেওয়া হয়। জীবন সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান থাকলে আমরা দেখতে পেতাম যে খণ্ডাংশের এত মর্য্যাদা হতে পারেনা।...বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা করে তাদের অপূর্ণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে দেখা যায় সমন্বয়ী মতবাদই শ্রেষ্ঠ। মতবাদের আপাতবিরুদ্ধতা জ্ঞানের নিম্নস্তরে উপস্থিত। উচ্চস্তরে অবলুপ্ত। সুতরাং কোন মতবাদ বা দর্শনকে ত্যাগ না করে সব মতবাদ হতে প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে আমরা এক সমন্বিত দর্শনের সৃষ্টি করতে পারি। কোন খণ্ডিত মতবাদের ঝাণ্ডা উঁচু করে জেহাদের ধ্বনি তোলা নিরর্থক। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োজন এমন একটি আদর্শ যা যুগের সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ, যা বিভিন্ন দর্শনের শ্রেষ্ঠ অংশগুলির সমবায়ে সৃষ্ট।" শিক্ষা ও দর্শন পরস্পরের সহযোগিতায়, পরস্পরকে প্রতিফলিত করে অগ্রসর হতে পারে। সমন্বয়ের মধ্যপথ দু'য়ের পক্ষেই প্রশস্ত।

পুস্তকসূচী

অ্যাডাম্‌স্ – এডুকেশনাল থিয়োরিস্। ইভল্যুশন অব এডুকেশনাল থিয়োরী। প্রথম অধ্যায়

দ্য ইনডিভিজুয়াল এ্যাণ্ড দি এনভয়রনমেণ্ট। ভূমিকা।

ডিউই – ডেমোক্রেসী এ্যাণ্ড্ এডুকেশন। ২৪তম অধ্যায়।

অলডাস্ হাক্সলী—এণ্ড্‌স্ এ্যাণ্ড মীন্‌স্। ১৪তম অধ্যায়।

কীটিং— স্টাডিজ্ ইন এডুকেশন। প্রথম অধ্যায়।

ওয়েলটন— হোয়াট ডু উই মীন বাই এডুকেশন। পৃঃ ৪৩।

নান – এডুকেশন ইট্‌স্ ডাটা এ্যাণ্ড ফার্ষ্ট প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্। প্রথম অধ্যায়।

রাস্ক— দি ফিলজফিক্যাল বেসেস্ অব এডুকেশন। প্রথম অধ্যায়।
টমাস এ্যাণ্ড ল্যাং— প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব মর্ডান এডুকেশন। প্রথম অধ্যায়।
টম্‌সন— এ মডার্ন ফিলসফি অব এডুকেশন। প্রথম অধ্যায়।
ওয়াট্‌স্— এডুকেশন ফরসেল্‌ফ্ রিয়ালাইজেসন এ্যাণ্ড্ সোস্থাল সারভিস্। প্রথম খণ্ড। প্রথম অধ্যায়।
ওয়েলটন— হোয়াট ডু উই মীন বাই এডুকেশন। প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষার সমাজমুখী ও ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য

জীবন এবং শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদের পশ্চাতে অনেক সময় এই প্রশ্ন থাকে, "শিক্ষা কার কল্যানের জন্য ? শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির উৎকর্ষসাধন নাকি সমাজের কল্যান সাধন ?" দুইপক্ষেই যথেষ্ট যুক্তি আছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনটিকে প্রাধান্য দেওয়া যায় ? প্রথমে দেখা দরকার এই দুটি লক্ষ্য সত্যিই পরস্পরবিরোধী কিনা। এমন হওয়া সম্ভব যে বাস্তবিক লক্ষ্যদুটি আলাদা নয়, কিন্তু সমাজ বলতে সাধারণভাবে কি বুঝি, অথবা রাষ্ট্র বলতে বিশেষভাবে কি বুঝি, এই দুটি সংজ্ঞার বিভেদের উপর ঝোঁক দেওয়া হচ্ছে বলে এদের বিপরীত বলে মনে হচ্ছে। যদি তফাৎ শুধু এই দুটি সংজ্ঞার বৈপরীত্যের জন্য হয়, তবে দুটি লক্ষ্যের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করা সম্ভব কিন্তু এই লক্ষ্য দুটি যদি স্বভাবতই বিরোধী হয় তবে দুটি লক্ষ্যের মিলনের চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র।

প্রথমে শিক্ষার চরম সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যকে বিশ্লেষণ করা যাক্। এখানে রাষ্ট্রকে এক কল্পিত দার্শনিক সত্ত্বা বলে ধারণা করা হচ্ছে। এটি যেন ব্যক্তিনির্ভর নয় বরঞ্চ ব্যক্তি হতে সর্ব্বতোভাবে বৃহত্তর, মহত্তর, তার সমস্ত ইচ্ছা, আকাঙ্খার অতীত। রাষ্ট্র যেন, যুক্তি ও নীতিবোধের মূর্ত্তরূপ। এর নিজস্ব ন্যায়নীতি আছে এবং সেই ন্যায়নীতির পূর্ণ উপস্থাপন এর লক্ষ্য। রাষ্ট্রের কল্যাণ ও উন্নতিই সাধারণ ভাবে আমাদের জীবনের ও বিশেষভাবে শিক্ষার লক্ষ্য।

এই জাতীয় দর্শনের ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত হল ব্যক্তিজীবনের উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ শাসন। ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যক্তির কাজকর্ম ও তার ব্যক্তিগত জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার পূর্ণ ক্ষমতা ও অধিকার থাকবে রাষ্ট্রের। ব্যক্তিকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে রাষ্ট্রের শ্রীবৃদ্ধি হয়। এই লক্ষ্যকে রূপায়িত করার সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা। সেজন্য শিক্ষাব্যবস্থা এমন ভাবে পরিকল্পনা করা হবে যাতে সর্ব্বাধিক মঙ্গল হবে। ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা, কল্যাণ, অকল্যাণ এখানে গৌণ। পাঠ্য বিষয়বস্তু এবং শিক্ষাপদ্ধতি কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকবে। বিষয়বস্তু নির্ব্বাচনে ও শিক্ষাপদ্ধতির রূপায়নে,

রাষ্ট্রের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, কঠিন শৃঙ্খলা ও সর্ব্বতোভাবে ব্যক্তিত্বের অবদমনের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়।

এ ধরণের লক্ষ্য অনুযায়ী ব্যক্তি, শিক্ষার সুযোগ সুবিধা কতটুকু পেতে পারে? রাষ্ট্রের কর্তারাই বিচার করবেন কোন ব্যক্তি কি ভাবে পড়াশোনা করে রাষ্ট্রের সর্ব্বাধিক সেবা করতে পারবে। ঠিক সেই বিবেচনা অনুযায়ী সাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা হবে। তাই কাউকে দেয়া হবে বৌদ্ধিক শিক্ষা, কাউকে বা সামরিক শিক্ষা, কাউকে আবার বিশেষ করে নেতৃত্বের শিক্ষা দেওয়া হবে। কে কি শিক্ষা পাবে, তা কিন্তু ব্যক্তিরা নিজেরা ঠিক করতে পারবে না। রাষ্ট্রের প্রয়োজন মত সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। ব্যক্তির নিজস্ব কোন মতামত বা দাবী গ্রাহ্য করা হবে না। কোন দরিদ্রের সন্তানের জন্যও রাষ্ট্রের খরচে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হবে, যদি দেখা যায় যে তাতে রাষ্ট্রের কিছু লাভ হবে। শিক্ষায় তার কোন জন্মগত অধিকার নেই। এই মত অনুসারে দেখা যায় রাষ্ট্র সর্ব্বশক্তিমান, সার্ব্বভৌম, ব্যক্তির শুভাশুভ গৌণ রাষ্ট্রের সে সর্ব্বতোভাবে আয়ত্তাধীন। রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধন ব্যক্তির একমাত্র কর্তব্য।

প্রাচীন স্পার্টা রাজ্যে নগরকেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সার্ব্বভৌমত্বের প্রকৃষ্ট নিদর্শন মেলে। সে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অন্তরঙ্গ ছবি প্লুটার্ক লিখিত 'লাইফ অব লাইকারগাসে' বিধৃত। শোনা যায় লাইকারগাস খৃষ্টপূর্ব্ব নবম শতাব্দীর আইনের সূত্র রচয়িতা। তিনি কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা সে বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত নন। যাহোক্ দেখা যায় স্পার্টা রাজ্যের কর্ণধাররা রাষ্ট্রের নাগরিকদের ব্যক্তি হিসাবে কোন মর্য্যাদা দিতেন না। প্রত্যেকের জন্ম তার নিজের জন্য নয়, রাষ্ট্রের কল্যাণে। লাইকারগাস স্পার্টা বাসীদের শিক্ষা দিতেন, যে নিজের জন্য জীবনধারণ করার মত হীন ও তুচ্ছ কাজ আর কিছু নেই। নিজেদের ব্যক্তিগত শুভাশুভের কোন চিন্তা থাকতে নেই। সমস্ত চিন্তা ভাবনা থাকবে স্বদেশের জন্য। স্পার্টা নগরটুকু নিয়েই ছোট একটু রাষ্ট্র, সেটিও বহু প্রতিবেশী রাজ্যের আক্রমণের ভয়ে সদা ত্রস্ত থাকত। তা ভিন্ন স্পার্টার জনসংখ্যার একটা বড় অংশ ছিল বিজিত, ও বিজয়ী শাসক গোষ্ঠীর পদানত। অতএব অন্তর্বিপ্লবের ভয় ছিল নিরন্তর। স্পার্টা-বাসীরা গ্রীস আক্রমণ করে সেখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল, কিন্তু স্থানীয় লোকদের সঙ্গে কখনো মেলামেশা করেনি, হার্দ্দ্য সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করেনি। তারা ছিল পদানত এক দেশে বিজয়ী সেনানী। সুতরাং রাজ্যের নিজস্ব রাষ্ট্র

সীমানা অটুট রাখা ভিন্ন অন্য কোন লক্ষ্য তাদের ছিল না। তাদের জীবন-যাত্রার ধরণ ছিল অতি সহজ (simple) ও কঠোর। ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্পকলা কোন কিছুতেই তাদের আগ্রহ ছিল না। তাদের সমস্ত উদ্যম ব্যয়িত হত সামরিক শিক্ষাদানে। সমস্ত রাষ্ট্র ছিল এক বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্র। সেখানে সর্ব্বপ্রথম উদ্দেশ্য ছিল তরুণদের সামরিক শিক্ষায় পটু করে তোলা।

শিক্ষার প্রথমতম লক্ষ্য ছিল সেনানী গঠন। ছেলেদের এমন শিক্ষা দেওয়া হত যাতে তারা বাধ্যতা শেখে। শ্রমে অভ্যস্ত ও যুদ্ধে অপরাজেয় হয়। নব-জাতককে রাষ্ট্রবৃদ্ধরা এসে পর্য্যবেক্ষণ করতেন। দুর্ব্বল বা পঙ্গু শিশুদের মৃত্যু ঘটাবার জন্য পাহাড়ের ওপর পরিত্যাগ করে আসা হত। এই নিষ্ঠুর প্রথা এদের পক্ষে যুক্তিসংগত কেননা স্পার্টাবাসীরা বিশ্বাস করতো যে শুধুমাত্র স্বাস্থ্যবান জাতক, ভবিষ্যৎ সেনাগঠনের কাজে লাগবে।

পঙ্গু বীর্য্যহীন অপারগ নাগরিক স্পার্টাবাসীদের কাছে অবাঞ্ছনীয়। সমাজের ক্ষতিকারক অতএব নিধনযোগ্য।

যেসব শিশুরা দৈহিক শক্তিতে পটু, তাদের খেলাধূলার শিক্ষা, দৌড়ঝাঁপ, বল খেলা, লোহার চাকতি ছোঁড়া, বর্শা ছোঁড়া, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি ইত্যাদিতে পারদর্শী করে তোলা হত। নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল প্রধানত বড়দের সঙ্গে মেলা-মেশা। ছোটরা ক্রমে বড়দের দেখেই নীতিবোধ শিখবে। প্রবীণেরা কঠিন শাসনশৃঙ্খলার দোষ সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবহিত ছিলেন না। কোন প্রকার স্বাধীন চিন্তা বা কাজকে প্রশ্রয় দেওয়া হত না। প্রায়ই সুকঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। সমগ্র শিক্ষা ব্যাপারটাই ছিল বাধ্যতা ও নম্রতা শেখার প্রয়াস। অন্য যে গুণকে প্রশংসা করা হত সে হল সাহস। হিংস্রতা এমন কি চৌর্য্যক্ষমতাকে বিশেষ মর্য্যাদা দেওয়া হত। চুরি ধরা পড়লে কিন্তু তার মারাত্মক শাস্তি হত। প্লুটার্ক বলেছেন যে ছেলেরা অত্যন্ত দুঃসাহসের সঙ্গে সুচতুর ভাবে চুরি করতে শিখতো। কথিত আছে যে স্পার্টার এক বালক একটি শেয়ালের বাচ্চা চুরি করে নিজের পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল; জানোয়ারটী আঁচড়ে কামড়ে তার অন্ত্র টেনে বের করে ফেলে। সেই মরণান্তক যন্ত্রণাতেও ছেলেটি ধরা পড়ে অসম্মানিত হওয়ার ভয়ে চুরি স্বীকার করেনি, বরং মৃত্যু বরণ করেছিল।

শিক্ষার পাঠক্রমে কতগুলি আবশ্যিক কর্ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। পুঁথিগত বিদ্যা বলতে বোঝাতো লাইকারগাসের সূত্র মুখস্থ করা। সঙ্গীত শিক্ষার জন্য হোমারের মহাকাব্য থেকে বেছে বেছে খানিকটা গান শেখানো হত। কিছু

দেশাত্মবোধক গান শেখানো হত যেন সেসব গানে তারা সাহসিক কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়। সেসব সঙ্গীতের বিষয় ছিল স্পার্টার বীরদের দেশের জন্য প্রাণ দান করার কাহিনী। যারা দেশের জন্য নিজেদের তুচ্ছ প্রাণ বলি দিয়ে অমর হবার সুযোগ গ্রহণ করেনি তাদের প্রতি ঘৃণাও প্রকাশ করা হত কোন কোন কাহিনীতে। কিছু ছিল কাপুরুষতার কাহিনী। প্রাচীণ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র স্পার্টা স্ত্রীশিক্ষা ও পুরুষের শিক্ষার মধ্যে কোন পার্থক্য করে নি। কারণ স্পষ্ট। স্ত্রীলোকরা স্পার্টার যোদ্ধাদের ভবিষ্যৎ গর্ভধারিণী ও পালিকা, তাদের শিক্ষাও ছেলেদের শিক্ষার মত দরকারী।

অতীত স্পার্টা আর আধুনিক জার্মানী স্থান ও কালের হিসেবে পরস্পর হতে বহুদূর, অথচ দ্বিতীয় দেশটাতেও মহাযুদ্ধের আরম্ভে ও অবসানে একই সমাজমুখী শিক্ষাদর্শন অনুসৃত। ১৮০৬ সালে নেপোলিয়নের হাতে জার্মানীর অপমানজনক পরাজয়ের পর, জেনার দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ও পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ফিক্‌টে 'এ্যাড্রেসেস্ টু জার্মান নেশন' শীর্ষক বক্তৃতামালায় বলেন 'একমাত্র শিক্ষা আমাদের রাষ্ট্রকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, আজ যা কিছু অমঙ্গল আমাদের পীড়া দিচ্ছে, শিক্ষাই কেবল এসব থেকে আমাদেয় উদ্ধার করতে পারে।'

এই বিশ্বাস ক্রমেই রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মনে দৃঢ়মূল হয়ে যায়, দেশ নামে 'মহান্ পিতৃভূমি'র ধারণা বিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রচার করা হতে থাকে। ইতিহাসকে বিকৃত করে এক 'শ্রেষ্ঠ জাতি'র পরিকল্পনা জার্মান জাতের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। জার্মান 'আদর্শ রাষ্ট্রের জন্য আদর্শ নাগরিক প্রস্তুত করার একটি মহতী চেষ্টা চালানো' এই আন্দোলনের মুখ্য ঘটনা। অভিজাত শ্রেণীর ছেলেদের সামরিক শিক্ষা দিয়ে তাদের এক বিশেষ সামরিক জাতিতে পরিণত করার চেষ্টা করা হচ্ছিল। এই চেষ্টার ফল আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা। হেগেল এই ধারণাকে তাঁর দর্শনে পরিপূর্ণ ভাবে প্রস্ফুটিত করেন, "হেগেলের এই দর্শন থেকে প্রাশিয়ার লোকদের মনে এক সার্ব্বভৌম সর্ব্বেসর্ব্বা রাষ্ট্রের ধারণা দৃঢ়মূল হয়, সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আরেকটি বিপজ্জনক ধারণাও জন্ম নেয় যে রাষ্ট্রের নৈতিক সার্ব্বভৌমত্বের ওপর কোন ব্যক্তির কথা খাটবে না। প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে সর্ব্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই ধারণা সকলের মনে গেঁথে দেবার যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে।" জার্মানীতে নাৎসী আমলে এই ধরণের শিক্ষার সাফল্য প্রাঞ্জল ভাবে প্রমাণিত। অতি বেদনা-

দায়ক সেই স্মৃতিকে সম্ভবতঃ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই; সেই সময় নানা ধরণের নিপীড়ন চালানো হয়েছিল, যেন তেন প্রকারেণ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নিষ্পেষিত করার চেষ্টা, সংবাদপত্র গুলির কণ্ঠ রোধ করা, বিদেশী পত্রিকা ও বেতারবার্তাকে স্তব্ধ করা, ফ্যুরার (হিটলার) ও নাৎসীদলের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য ও সর্ব্বান্তঃকরণে তাদের অনুসরণ করার শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি।[১] নাগরিকদের এই সমস্ত মেনে নেওয়ার শিক্ষা চালু করা হয়। এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি, শিক্ষার ব্যবস্থাকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছিল সেটা আমরা দেখতে পাই যুব-আন্দোলন কেন্দ্র এবং নেতৃত্ব তালিম দেওয়ার শিক্ষাকেন্দ্রগুলির কর্মসূচী থেকে। এক বিপজ্জনক দর্শনের সৃষ্টি হয়। অন্য রাষ্ট্র সম্বন্ধে একটা রাষ্ট্রের কোন প্রকার নৈতিক বাধ্যবাধকতা (moral laws) নেই। "নিজের রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করা চলে। কি উপায়ে সেই লক্ষ্যে পৌছানো গেল, তা তুচ্ছ।"[২]

অবিকল এই একই ধরণে চার্চের সার্ব্বভৌমত্বের প্রচার করেছেন রোম্যান ক্যাথলিক ও হাই অ্যাংলিকান ডকট্রিন অব দ্য চার্চ। এঁরা বলেন, চার্চ সর্ব্বকালে, সর্ব্বময়, চিরন্তন, আত্মিক সত্তা। এর সদস্যরা একে সম্পূর্ণ আনুগত্য দেবে। ব্যক্তিগত বিচার বোধ এখানে সম্পূর্ণ অবদমিত। কারো নিজস্ব মতামত দেবার অধিকার নাই। পোপ সকলের ওপরে ও সমস্ত সমালোচনার উর্দ্ধে। তিনি কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। প্রোটেস্টান্ট ধর্ম কিন্তু এই মতকে সমর্থন করে না। এই ধর্মের মূল ধারণা হল, প্রত্যেক ব্যক্তি ঈশ্বরের কাছে নিজের কর্মের জন্য দায়ী। বিশ্বাসী ভক্তদের সমবায়ে চার্চের সৃষ্টি। চার্চের নিজস্ব পরম সত্তা নেই।

রসের মতে ইংল্যাণ্ডে মূলগত ভাবে সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য নন্দিত। তবে এতটা চরম রূপে নয়। সমাজ সেবার জন্য শিক্ষা, সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষা এসব বলে আমরা যদিও রাষ্ট্রের কল্যাণমুখী উদার লক্ষ্যের কথা বলছি, সার্ব্বভৌম আদর্শ-প্রতিম (idealized) রাষ্ট্রের পরিকল্পনা এখানে অনুপস্থিত। তবে অধিকাংশ লোকের মতে সমাজের মঙ্গলকে ব্যক্তিগত স্বার্থের ওপর জায়গা দেওয়া দরকার। যদি দুয়ের মধ্যে কখনো সংঘাত হয় তবে ব্যক্তি যেন নিজের সুখ সুবিধা তুচ্ছ করে সমাজের কল্যাণ বিধানের চেষ্টা করে। পরার্থপরতা চিরদিনই স্বার্থপরতার

১। এডুকেশন, ইট্স্ ডাটা অ্যাণ্ড ফার্ষ্ট প্রিন্সিপল্স্। পৃঃ ৩। নান।
২। গ্যোয়েবল্স্। জর্মন মিনিষ্টার অব প্রোপাগাণ্ডা। সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮।

চেয়ে উন্নত বলে ধরা হয়। সকলেরই নিজের স্বার্থকে খর্ব করে অন্যের মঙ্গল এবং সুখের চেষ্টা করা কর্তব্য।

অধ্যাপক ব্যাগলী শিক্ষায় সমাজ কল্যাণমুখী আদর্শকে গুরুত্ব দিয়ে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যাখ্যা করে বল্লেন, "যে শিক্ষা পদ্ধতি মানুষের সামাজিক কর্মক্ষমতা বাড়াতে পারে তাই উৎকৃষ্ট শিক্ষাপদ্ধতি। যে কোন যুক্তিপূর্ণ শিক্ষাতত্ত্বের প্রথম লক্ষ্য সমাজ কল্যাণ।" সামাজিক কর্মক্ষম ব্যক্তি কে? ব্যাগলীকে উদ্ধৃত করা যাক্। সামাজিক কর্মক্ষমতার কয়েকটী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ১) অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা ২) নেতিবাচক শ্রেয়নীতি ৩) ইতিবাচক শ্রেয়নীতি। এক) অর্থনৈতিক স্বয়ং নির্ভরতা দিয়ে ব্যক্তি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। দুই) নেতিবাচক নৈতিকতার অর্থ, যদি নিজের স্বার্থসিদ্ধি অপরের স্বার্থসিদ্ধিতে (অর্থাৎ তার অর্থনৈতিক স্বয়ংনির্ভরতাকে) বাধা দেয় তবে নিজের স্বার্থত্যাগ করে অন্যের সুখ বিধান করা। তিন) ইতিবাচক নৈতিকতার অর্থ—নিজের সেই সব স্বার্থ ত্যাগ করা যার সিদ্ধি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজের কোন কল্যাণ সাধন করে না। ব্যক্তির সব কর্মের মূল্যের মাপকাঠি হচ্ছে তার সমাজের মঙ্গল। সমাজের পক্ষে হিতকর না হলে ব্যক্তির নিজের জন্য কোন হিতকামনা করা অন্যায়। অতএব সমাজের কল্যাণ ব্যক্তির কল্যাণের উর্দ্ধে স্থিত। যুদ্ধবিগ্রহের সময় যে কোন দেশেই এই প্রকার সমাজ কল্যাণের আদর্শ বহুল প্রচারিত হয়। বর্তমান শতাব্দীতেও সমাজ কল্যাণের আদর্শ বেশী আহৃত। যুদ্ধের সময় যে কারো পক্ষে স্বার্থপর ভাবে ব্যক্তিগত সুখ উপভোগ করা ভয়ানক লজ্জাকর বলে গণ্য হয়। প্রত্যেকের সচেষ্টভাবে যুদ্ধজয়ের জন্য কাজ করা দরকার বলে অনুভূত হয়। নিশ্চেষ্ট বা অকর্মণ্য থাকা অনুচিত বোধ হয়। এই আদর্শের ওপর অনুরাগের প্রমাণ ইংল্যাণ্ডের পাবলিক স্কুলের জনসেবার আদর্শ। অপরকে সেবা করার এ আদর্শ, বলাই বাহুল্য, অবহেলাযোগ্য নয় বরঞ্চ অনুকরণযোগ্য। স্কুলের প্রতি আনুগত্য হতে এর সুরু। পরে সেই আনুগত্য বৃহত্তর দেশের ও দেশবাসীর আনুগত্যে প্রসারিত। এই আদর্শের দুর্ব্বলতা সেখানেই যখন স্বদেশের প্রতি অন্ধ আনুগত্য শেখানো হয়। সেই সঙ্গে দেখা যায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে ব্যক্তিরও যে একটা দায়িত্ব আছে এই সত্যটাকে অস্বীকার করার একটা ঝোঁক।

অতএব এই দর্শন অনুযায়ী শিক্ষার উদ্দেশ্য সমাজসেবা, সমাজ কল্যাণ, সমাজের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্বের কথা বিশেষভাবে বিদ্যালয়ে শেখাতে হবে যাতে

শিক্ষার্থী এই শিক্ষার ফলে সানন্দে সোৎসাহে সমাজ সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সুনাগরিকের কর্তব্য ও দায়িত্ব স্কুলে প্রত্যক্ষভাবে শেখানো হবে। সেই সঙ্গে ইতিহাসের সাক্ষ্যনজীর দিয়েও সুনাগরিকত্বের আদর্শকে অত্যুত্তম বলে হৃদয়ঙ্গম করাতে হবে। এর ফলে বিদ্যালয়কে একটী আদর্শ পরিবাররূপে পরিকল্পনা করতে হবে এবং উত্তম সামাজিক পরিবেশে, সমাজ সেবার আদর্শ, কাজের ভেতর দিয়েই শেখানো হবে। স্কুলের অনেক কাজই দলগত কাজ, সুতরাং সে সব কাজের মধ্য দিয়ে পরার্থপরতা, আত্মত্যাগ ইত্যাদির মূল্য সোচ্চার করে তুলতে হবে। স্কুলের কাজের মধ্যে দলের জন্য আত্মত্যাগ, দলের প্রতি আনুগত্য, দলগত কাজের ওপর জোর দেওয়া হবে।

যদিও এ আদর্শ নিঃসন্দেহে মূল্যবান কিন্তু ব্যক্তিতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসীরা মনে করেন উপরোক্ত আদর্শ একদেশদর্শী। ব্যক্তির শুভাশুভ সকলের ওপরে স্থান পাওয়া উচিত। সামাজিক কল্যাণকে ব্যক্তির কল্যাণের চেয়ে বেশী মর্য্যাদা দেওয়া একটি উল্টোপাল্টা যুক্তিবিরোধী ব্যাপার। রস ইংরাজী প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করে বলেছেন এ যেন ঘোড়াগাড়ীতে, গাড়ীটাকে প্রথমে রেখে ঘোড়াকে পেছনে রাখার মত। (Putting the cart before the horse.) অবশ্য যে সমস্ত দেশে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকে নিষ্পিষ্ট করে সমাজকল্যাণ শেখানো হয় এবং যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এই আদর্শ রূপায়ণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেই দেশের বা আদর্শের সম্বন্ধে শান্তভাবে কিছু বলা সহজ নয়। প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করা হয় কেন? ব্যক্তির জীবনকে সমৃদ্ধতর, আনন্দময় ও পরিপূর্ণতর করার জন্য। বিদ্যালয় এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা শিশুর জীবনকে বর্তমানে ঐশ্বর্য্যময় করে তুলবে এবং বড় হবার পরেও যেন সমৃদ্ধ জীবনের অধিকারী হয় তার চেষ্টা করবে। শিশুর অপ্রকাশিত ক্ষমতাবলীর পূর্ণ বিকাশ হচ্ছে এই সযত্নে গড়ে তোলা পরিবেশের লক্ষ্য। এর সাহায্যে সে ভবিষ্যতে পূর্ণতর জীবনযাপন করতে পারবে। এর প্রথম কর্ম হচ্ছে প্রতি শিশুর মধ্যে সম্ভাবনা খুঁজে বের করে সেগুলি পরিস্ফুটনের জন্য উপায় বের করা।

ব্যক্তিমানুষকে যেখানে এতখানি মূল্য দেওয়া হয় সেখানে রাষ্ট্রের কর্তব্য কতটুকু? এর উত্তর আমাদের দেশেই পাওয়া যাবে। ইংল্যাণ্ডে দেখা যায় ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ রাষ্ট্র অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে। স্কুলগুলি এই বিকাশের প্রধান উপায়। কিন্তু এই ব্যাপারে রাষ্ট্র সাধারণ ভাবে সাহায্য করে। পুঙ্খানুপুঙ্খ আয়োজনের দায়িত্ব নেয়না। কোন রাষ্ট্রই শিক্ষার কোন অনড় পদ্ধতি

বা পাঠক্রম উপর থেকে চাপিয়ে দেয়না। তবে সাধারণভাবে রাষ্ট্রের কিছু আইন থাকে যেমন সমস্ত শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে। প্রত্যেক মা বাবা শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে বাধ্য থাকবে। প্রত্যেক শিক্ষকের কর্তব্য হবে প্রতিটি শিশু যেন ভালভাবে বিদ্যালাভ করে, তার তত্ত্বাবধান করা। স্কুলে যতটুকু সময় শিশু থাকবে সে সময়টা যাতে সে সার্থক ভাবে ব্যবহার করে সেইটুকু শুধু তত্ত্বাবধান করতে হবে।

এই ধরণের মনোভাবকে সমালোচকরা বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা (Laissey faire) নীতি। এই জাতীয় রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ভাবে কোন কিছু নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী নয়। রাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যক্তিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে ও নিজ উদ্যমে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে দিতে রাজী। বেসরকারী স্কুলও থাকতে পারবে। এমন কি সুবিধামত ব্যবস্থা থাকলে বাড়ীতেও ছেলেমেয়েরা পড়তে পারবে। তবে সকলকে যে যথাযোগ্য শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে সে বিষয়ে রাষ্ট্রকে সন্তুষ্ট করতে হবে। দরিদ্রের সন্তান ও অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেমেয়েদের সমান শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে। প্রয়োজন হলে তাদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

ইংল্যাণ্ডে ম্যাগনাকার্টার কাল হতে ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক দর্শন বরাবরই উদারপন্থী। শিক্ষার সংস্কার ও প্রগতির ক্ষেত্রেও এই বিশ্বাসের প্রসার ও প্রয়োগ দেখতে পাই। স্কটল্যাণ্ডে ব্যক্তি স্বাধীনতা আরো পূর্ণরূপে বিকশিত। ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সর্ব্বতোভাবে সচেষ্ট। মাধ্যমিক শিক্ষাও সেখানে অবৈতনিক। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাসিক খরচ খুব বেশী নয়। তা ছাড়া সে খরচও বহন করার জন্য বহুরকমের বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। বাপমাদের মনেও এই বিশ্বাস দৃঢ়মূল যে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা খুব মূল্যবান বস্তু। তার জন্য তাঁরা সব রকমের আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকেন। দেশের তরুণদের মধ্যেও শিক্ষার জন্য বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়. পড়ার ব্যয়ভার বহন করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা ছুটির সময় নানা রকমের কাজ নিয়ে থাকে।

ইংল্যাণ্ডের সেকেণ্ডারী স্কুলের এডুকেশন বোর্ডের রিপোর্টে দেখা যায় প্রত্যেক স্কুলের কর্তব্য ও লক্ষ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে, প্রতি ছাত্রের পূর্ণ ও স্বাধীন বিকাশ। শিক্ষার লক্ষ্য হবে ছেলেমেয়েদের সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলা। ব্যক্তিত্ববিলোপ, স্কুলকর্তাদের অভিপ্রেত নয়। তার প্রমাণ হল গ্রেট বৃটেন বোর্ড অব এডুকেশন শিক্ষকদের যে নির্দেশনামা দেন তা 'সাজেসন' বা 'উপদেশ'

বলে লিপিবদ্ধ, এটি হুকুমনামা নয়। রাষ্ট্রের পক্ষ হতে শিক্ষকদের পরামর্শ দেওয়া মাত্র চলতে পারে। এঁরা শুধু দেখেন শিক্ষকরা তাঁদের শিক্ষাদান কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করছেন কিনা।

ইংল্যাণ্ডের আবশ্যিক সার্ব্বজনীন শিক্ষার ধারণাটি গণতন্ত্রের মূল সংজ্ঞা প্রণোদিত। 'আমাদের ভবিষ্যৎ নেতাদের শিক্ষা দেওয়া আমাদের প্রথম কর্তব্য', একথা তাঁরা মনে করেন। বৃটেন উদারপন্থী দলের মত অনুযায়ী ক্রমে ক্রমেই অধিকতর সংখ্যক লোক ভোটাধিকার পাবে, অতএব তাঁরা চিন্তা করলেন ভোট-দাতাদের বুদ্ধি বিবেচনা ও শিক্ষা থাকা দরকার যাতে করে তাঁরা সংবাদপত্র থেকে নেতাদের রাজনৈতিক মতামত অনুধাবন করতে পারেন।

যাতে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটে এজন্য শিক্ষার প্রয়োজন। এই ভাবে 'ব্যক্তিত্ব বিকাশের লক্ষ্য ক্রমেই আরো প্রাধান্য পেল। সুতরাং বুনিয়াদী শিক্ষার অর্থ শুধু মাত্র লেখা, পড়া ও অঙ্ক করা (3 Rs) এর চেয়ে বেশী এগিয়ে গেল। ব্যক্তির বিকাশ ক্রমে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। যে কোন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসুক, ইংল্যাণ্ডে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তি-মুখীন থেকে যায়। অবশ্য শ্রমিক দল কখনো কখনো ব্যুরোক্রেসীর দিকে ঝোঁকা, এবং অতিনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রক্ষমতার পক্ষপাতী তবে ব্যক্তির সুখসাধন বরাবরই উদ্দেশ্য রইল। দরিদ্রের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করতে এঁরা কখনো কার্পন্য করেন নি।

ব্যক্তিমুখীন শিক্ষার লক্ষ্যের একজন প্রধান সমর্থক নান্। তাঁর 'এডুকেশন, ইটস্ ডাটা এ্যাণ্ড ফার্ষ্ট প্রিন্সিপল্স্' বইতে তিনি অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্তির স্বাধীনতা বিকাশ ও শিক্ষায় তার জন্য ব্যবস্থা করার কথা বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার এই লক্ষ্য সমর্থন করে অনেক সুযুক্তির অবতারণা করেছেন। তাঁর মতে হব্‌সের কাল হতে বৃটেনে ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য বিশেষ ভাবে গৃহীত। নান নিজে হব্‌সের লেভিয়াথনের ব্যক্ত মত পুরোপুরি মেনে না নিলেও সমাজের চেয়ে ব্যক্তির মূল্য যে বেশী তা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করেছেন। তাঁর ভাষায় "মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও কর্ম ছাড়া মানুষের সমাজকল্যাণকর কোন কাজ সমাধা হতে পারে না। সুতরাং মানুষের শিক্ষার ব্যবস্থাতেও তার স্বাধীন চিন্তা বিকাশের পর্য্যাপ্ত ব্যবস্থা ও সুযোগ থাকা উচিত।"[১] সুতরাং তাঁর মতে এমন দর্শনের প্রয়োজন যেখানে ব্যক্তিমানুষের গুরুত্ব মূল্য ও দাবী স্বীকৃত। শিক্ষার প্রধান কাজ হবে মানুষকে তার পরিপূর্ণ বিকাশের অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করে দেওয়া।

১। নান্। এডুকেশন, ইট্‌স্ ডাটা এ্যাণ্ড ফার্ষ্ট প্রিন্সিপল্‌স্, পৃঃ ৪

এর দ্বারা বিশ্বমানবের বিচিত্র জনসভায় সে তার নিজস্ব প্রতিভার অনুকরণীয় অবদান রেখে যেতে পারবে, তার বিশেষ অবদানের রূপে থাকবে তার নিজস্ব চারিত্রিক মৌলিকতার ছাপ। ব্যক্তির অবদান কি হবে সেটা স্থির করবে ব্যক্তি নিজে। তার জীবন ও জীবন ধারণের বিশিষ্টতায় তার নিজের ব্যক্তিত্বকে সে প্রভাসিত করবে।'[১]

মনে হতে পারে যে ব্যক্তিত্ব বিকাশের আদর্শ ছাড়া শিক্ষার আর কোন সর্বজন গ্রাহ্য লক্ষ্য নেই। এবং যেহেতু প্রতি ব্যক্তিরই একটি অনন্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে, শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে কোন একটি বিধানকেই একমাত্র শুভ বিধান বলে ব্যাখ্যা করা যায় না। 'ক' বাবুর মহৎ চরিত্রের ধারণা 'খ' বাবুর কাছে অকিঞ্চিৎকর বা বিরক্তিজনক। 'গ' বাবুর 'পরিপূর্ণ জীবনের সংজ্ঞা' হয়তো 'ঘ' বাবুর পক্ষে আত্মিক মৃত্যুর সমান। কেউ বা 'সুস্থ দেহভাণ্ডে সবল মনের' ওকালতী করেন, কারো পক্ষে সেই আদর্শ একেবারেই অসহ্য।

দর্শনের ভিত্তিভূমি হতে নিজের প্রত্যয়কে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করার পর 'নান' তাঁর বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে জীববিদ্যা হতে সমর্থন আহরণ করেছেন। তিনি দেখান যে জীবজগতে সমস্ত প্রাণীই শ্রেষ্ঠতর আকার বা কর্মের উদ্দেশ্য-মুখী, তিনি তাই মনে করেন তার মত জীববিদ্যা সমর্থিত। অতএব শিক্ষা ক্ষেত্রেও এই প্রকৃতির লীলা অনুসরণ করা উচিত। অনেকে নানকে জীববিজ্ঞান দ্বারা প্রভাবিত স্বভাববাদের প্রচারক বলে নিন্দা করেন। কিন্তু একথা মনে রাখা উচিত যে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তিনি জীববিদ্যা বা প্রাণীবিদ্যা থেকে পান নি। দর্শন হতেই শিক্ষার উদ্দেশ্য চয়ন করেছেন। তিনি ব্যক্তিত্ব (individuality) কে শিক্ষার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য বলে ব্যাখ্যা করেন। ব্যক্তিত্বের অর্থ বিচ্ছিন্ন জৈবিক অস্তিত্ব মাত্র নয়। একে বলা যায় একটি আত্মিক পরিপূর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্য। এটা মানুষের আদর্শ ও লক্ষ্য। যে কোন মানুষই কিন্তু এই বিশেষ অর্থে 'ব্যক্তিত্বের' অধিকারী নয়। চারিত্রিক সম্পূর্ণতা ক্রমে ক্রমে আয়ত্ব করতে হয়। একথা সত্যি যে জীবনের কোন স্তরেই ব্যক্তি 'পরিপূর্ণ' ব্যক্তিত্ব (সম্পূর্ণতা ও স্বাতন্ত্র্য) অর্জন করতে পারে না। কিন্তু সে সর্ব্বদাই সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রচেষ্টায় থাকে।

আরো পরিস্কার ভাবে বলা যায় যে শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তির পূর্ণ আত্মোপলব্ধি অর্থাৎ ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণতম উপলব্ধি। এর জন্য সমস্ত

১। নান্। এড্কেশন্‌, ইট্স্‌ ডাটা এ্যাণ্ড ফার্স্ট প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্‌, পৃঃ ৫

জীবনব্যাপী প্রয়াস করা দরকার। আত্মোপলব্ধি (self realisation) কে অনেক সময় আত্মপ্রকাশ (self expression) এর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। তার জন্ত অনেকে মনে করেন যে 'শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ' একথার অর্থ হল যা খুশী তাই করার অবাধ স্বাধীনতা, তার দ্বারা অন্তের অসুবিধা হক বা না হক। নান যখন ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা বলেন তখন ব্যক্তিত্ব বলতে বর্তমানের অসন্তোষ-জনক অপরিণত, অসংস্কৃত ব্যক্তিত্বের কথা ভাবেন নি, যে সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনা আমাদের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে তার কথাই মনে করেছেন।

অতএব শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের বিকাশ বলতে আমরা বুঝবো এখনো পূর্ণ নয় এমন সম্পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের বিকাশ, যা শুধু শিক্ষার নয় জীবনেরও লক্ষ্য।

ইউকেনের সাবধান বাণী স্মরণ রাখা ভাল যে "ব্যক্তিত্ব অর্থ সামাজিক বাতবরণের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারী মানুষ নয়। বরঞ্চ এর অর্থ ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ও অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্ব আয়ত্ব করার জন্য ব্যক্তির মধ্যে যে একটি অন্তর জগত রয়েছে তারই সাহায্যে আন্তর শক্তির উদ্বোধন প্রয়োজন। প্রাকৃতিক জগৎ অতিক্রান্ত আধ্যাত্মিক শক্তিতে এই ব্যক্তিত্ব ঊর্দ্ধমুখী।"[১] সুষম ব্যক্তিত্বের বিকাশের ফল একটি নিটোল সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা (personality)। এ সত্তা স্বাভাবিক জড় প্রকৃতির ঊর্দ্ধে এক আন্তরজগতের অধিবাসী। স্থূল জড়জগৎ বা বহির্জগতের মত এই জগৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। এই উদ্দেশ্যটি জৈব প্রকৃতির বিকাশের চেয়ে উচ্চস্তরের।" এই স্বভাব বা ব্যক্তিত্ব স্বভাবজ বা জন্মগত নয়। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ জন্ম হতেই হয় না। "আমরা জন্মের সময় পরিপূর্ণ ব্যক্তিসত্তা হয়ে গড়ে ওঠবার সম্ভাবনা নিয়ে জন্মিয়ে থাকি।" কিন্তু সেই সম্ভাবনা আমরা পুরোপুরি ভাবে উপলব্ধি করতে পারবো কিনা তা আমাদের নিজেদের কাজের ওপর নির্ভর করে। আমাদের জন্মকালীন অপরিণত অবস্থা হতে স্বনির্ভর সচেতন ব্যক্তিত্বের স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া নির্ভর করবে আমাদের নিজস্ব চেষ্টার উপর।" ইউকেনের ভাষায় "আমাদের জীবনের প্রধান কাজ এবং উদ্দেশ্য যথার্থ ব্যক্তিসত্তার বিকাশ। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও আত্মিক ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের দ্বারা যথার্থ ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে হবে। প্রতি ব্যক্তিরই জীবনব্যাপী উদ্দেশ্য যথার্থ ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ও আত্মিক ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি।"[২]

এই যথার্থ ব্যক্তিত্ব বা "আত্মিক ব্যক্তিত্ব" জৈবসত্তা নয়, তবে আত্মিক সত্তা

১। ইউকেন।—লাইফ্‌স্‌ বেসিস্‌ এ্যাণ্ড লাইফ্‌স্‌ আইডিয়াল্‌স্‌। পৃঃ ৯৬ পৃঃ ১৩২ পৃঃ ৩৭০।
২। ইউকেন।—লাইফ্‌স্‌ বেসিস্‌ এ্যাণ্ড লাইফ্‌স্‌ আইডিয়ালস্‌। পৃঃ ২৪৫।

জীবনের শেষ লক্ষ্য, আরম্ভ বিন্দু নয়। শিক্ষায় ব্যক্তিমুখীন লক্ষ্য, জৈবসত্তার বিকাশ নয়, তার যথার্থ আত্মিক ব্যক্তিত্বোপলব্ধি। মানুষের যে ব্যক্তিসত্তা পরিপূর্ণ আত্মিকতা, তা পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি ঈশ্বরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। ইউকেনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বিশ্বাস করতে সাধ জাগে যে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিসত্তাকে পূর্ণতম বিকশিত করা।

শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক উদ্দেশ্য দুটিকে কতদূর মেলানো সম্ভব? এখানেই একবার বলে নেওয়া যাক্ পরিপূর্ণ বিকাশ ও স্বৈরতান্ত্রিক দেশের বিকাশ পরস্পর বিরোধী আদর্শ, তাদের মধ্যে দুই মেরু প্রমাণ দূরত্ব। তাদের মেলানো সম্ভব নয়। কিন্তু ব্যক্তির বিকাশ ও জনসেবার আদর্শের সম্মিলন সম্ভব।

গ্রীসদেশে পেরিক্লিসের সময়কে বলা হয় স্বর্ণযুগ। সে সময় ব্যক্তিগত বিকাশের অভূতপূর্ব্ব উৎকর্ষ দেখা যায়। সাহিত্যে, শিল্পে, গণিতে ও দর্শনে এই উৎকর্ষ যেমন চরম—সমাজ জীবনেও তেমন চরম উৎকর্ষ লক্ষিত। ব্যক্তিগত বিকাশের পথে কোন অন্তরায় এখানে ছিল না। সমাজেও এ সময় প্রচুর উন্নতি দেখা যায়। সাহিত্যে, শিল্পে, গণিতে ও দর্শনে ব্যক্তিগত উৎকর্ষের চরম দেখা যায়। সমাজ জীবনও এই সময় তেমনি ঐশ্বর্য্যময়। থুকিডাইডিসের লেখাতে দেখা যায় যে এই নগররাজ্যের (এথেন্সের) উৎকর্ষের কারণ রাজ্যের গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলি। শহরের জয়গান করতে তিনি শহরবাসীদের প্রশংসাবাদ করে বলেছেন যে তাঁদের চরিত্রের গুণেই শহরের এত ঔজ্জ্বল্য ও বিকাশ। নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাগরিকরা রাষ্ট্রের কল্যাণের কাজে নিযুক্ত হতেন। সমাজের নানা স্তরের মানুষের কার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব এই সময়ে প্রকট। রাষ্ট্রের শাসন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আইন প্রণেতা ছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন কিন্তু অধিকাংশ নাগরিক আইনের মূল্যায়ন করতে সক্ষম। এথেন্সের নাগরিকরা নিজের পরিবারকে দেখা শোনা করার জন্য সমাজকে অবহেলা করতেন না। গ্রীসের বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও নেতারা ব্যক্তি ও সমাজের দাবীকে মেলাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সেই সব আলোচনা সেকালের মত আজও প্রয়োজনীয়। এই বিরোধ মীমাংসায়, নাগরিকদের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও চরিত্রের উৎকর্ষের দরুণ সমাজেরই শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ হয়েছে। ব্যক্তি মানুষও সমাজ কল্যাণে নিয়োজিত থেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতে পেরেছে।

বাস্তবিক, সামাজিক পরিবেশের ভিতর দিয়েই যথার্থ মূল্যবান ব্যক্তিত্বের পুষ্টি সম্ভব হয়, ব্যক্তিত্ব ঐশ্বর্যময় হয়ে ওঠে। বলডুইনের মতে "প্রকৃত ব্যক্তিত্ব

দ্বিমুখী। আত্মগত ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক ব্যক্তিত্ব (socius), অহং (ego) ও অপর সত্তা (alter ego) একই সঙ্গে জন্মায়।"[১]

মানুষের ব্যক্তিত্ব সমাজের মাধ্যমে প্রকাশিত। বস্তুতঃ অ্যাডামসের ভাষায় "ব্যক্তিত্ব বলতে প্রায় সর্ব্বদাই বোঝায় ব্যক্তি কেমন করে অন্যের সঙ্গে ব্যবহার করে।"[২] ব্যক্তিত্বকে তো অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা চলে না। ব্যক্তিত্ব কথাটিরই উদ্ভব মুখোষ (persona) শব্দ হতে, যা পরে অভিনেতা রঙ্গমঞ্চে নিজের চরিত্রকে দর্শকের মনে প্রতিষ্ঠা করে। আমরা যখন সবল ব্যক্তিত্ব দুর্ব্বল ব্যক্তিত্ব হৃদয়গ্রাহী ব্যক্তিত্ব অথবা বর্ণহীন ব্যক্তিত্বের কথা বলি, তখন বাস্তবিকপক্ষে কি বলতে চাই? সেই ব্যক্তিত্বগুলি অন্যান্যদের কাছে যেমন ভাবে প্রতিভাত হয় তারই গুণাগুণ ব্যক্ত করা হচ্ছে এই বিশেষণের সাহায্যে। ব্যক্তিত্ব অর্থ তাই সেই সব সামাজিক সম্পর্ক, সেগুলি বাদ দিলে মানুষ মনুষ্যেতর জীবমাত্র। অ্যাভেরণের একটী বন্য ছেলে ফরাসী দেশের বনে এগারবৎসর বন্য জীবনযাপন করে। ১৭৯৯ সালে তাকে যখন কুড়িয়ে পাওয়া যায় তখন ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের অন্যতম ইটার্ড তাকে বহু যত্নে ও অধ্যবসায়ে স্বাভাবিক মানুষের পর্য্যায়ে ফিরিয়ে আনতে পারেন নি। মানুষের স্বভাবের মধ্যে বৈপরীত্য আছে। "একদিকে সে আত্মমুখী, অন্যদিকে সে সামাজিক।" তার দুটি রূপই সত্য। "আমরা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও সমাজমুখী।"[৩] "আমরা দুই মেরুরই বাসিন্দা।"[৪]

সামাজিক পরিবেশ বাদ দিয়ে ব্যক্তিসত্তার কোন মূল্য নেই, ব্যক্তিত্ব অর্থহীন কেন না সামাজিক পরিবেশেই এরা বিকশিত হতে পারে। ব্যক্তির আত্মোপলব্ধি, সমাজ সেবা ও সমাজ কল্যাণের মধ্য দিয়েই সম্ভব। আবার সমাজ কল্যাণের যথার্থ আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করতে পারে দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষই। মানুষ ও সমাজের এই দুই বৃত্ত অভঙ্গ। দুয়ে মিলে সম্পূর্ণ বৃত্ত। খ্রীষ্টধর্মে এই দুই আদর্শের পূর্ণ সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। এই ধর্ম্মের স্রষ্টা যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং ব্যক্তি-মানুষের মূল্য ও মর্য্যাদাকে বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ স্থানে জায়গা দিয়েছেন। তিনিই আবার বলেছেন মানুষের মুক্তির পথ, ত্যাগ ও আত্মবিলোপের মধ্য দিয়ে। যীশু এই কথাই ঘোষণা করেছেন, "যে আমার জন্য জীবন দেবে, সে নতুন জীবন

১। বলডুইন—সোস্যাল এ্যাণ্ড এথিক্যাল ইনটারপ্রিটেশন্স্ ইন মেণ্টাল ডেভেলপমেণ্ট পৃঃ ১৫

২। অ্যাডামস্—মডার্ন ডেভেলপমেণ্টস্ ইন্ এড্‌কেশনাল প্র্যাকটিসেস্

৩। নান। এড্‌কেশন, ইট্‌স্ ডাটা এ্যাণ্ড ফার্ষ্ট প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ পৃঃ ৪,

৪। ইফেসিয়ান্স্—IV, ২৫

লাভ করবে।"[১] যীশুখ্রীষ্ট স্বয়ং ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। তিনি নিজের জীবনে ও মরণে মহত্তম সমাজসেবা ও অপরের হিতকার্যে উৎসর্গীকৃত ছিলেন। তাঁর জীবন ও বাণীতে শ্রেয়ঃনৈতিক জগতের (moral universe) যে রূপকে তিনি স্পষ্ট করতে চেয়েছিলেন, তা যদি সত্যি হয় তবে একথাই বলতে হবে যে ব্যক্তির বিকাশ ও সমাজ সেবার আদর্শের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। তারা এক এবং অদ্বিতীয়। এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে আমাদের বিদ্যালয়গুলিকে এমন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারি যেখানে ব্যক্তিত্বকে অবদমিত না করে বরঞ্চ নানা সামাজিক সংযোগ ও সেবার সুযোগের মাধ্যমে তাকে বিকশিত করার চেষ্টা করা যায়। প্রতি ছাত্রের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে প্রত্যেকের বিশিষ্ট অবদানকে স্বাগত জানানো হবে – উৎসাহ দিতে হবে। এ জাতীয় আদর্শই আমাদের বিদ্যালয়গুলিকে সবচেয়ে বেশী অনুপ্রাণিত করবে। এই আদর্শকেই মূল আদর্শ বলে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার উপদেষ্টাবৃন্দ, (consultation committee on secondary education) একই কথায় বিশ্বাসী। তাঁরা বলেন, "স্বকীয়তায় উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুনাগরিকরা, সমাজের উন্নতি নিশ্চিত করবে, একথায় বিশ্বাস না করাই অসম্ভব।"

শিক্ষার ব্যক্তিমুখীন ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য দুটি বাস্তবিক পরস্পর বিরোধী নয়। শিক্ষা তখনই সার্থক হবে যখন সমাজের আধারে প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিকশিত হবার সুযোগ থাকবে। সমাজজীবনের অংশভাগী হয়েই ব্যক্তির বিকাশ অর্থবহ। সমাজকল্যাণ ও ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষের আদর্শ দুয়ের মিলনেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আদর্শ নির্দিষ্ট হতে পারে।

অ্যাডাম্‌স্।	ইভল্যুশন অব এডুকেশন থিয়োরী। পঞ্চম অধ্যায়।
ব্যাগলী।	এডুকেশনাল ভ্যালুস্।
বোর্ড অব এডুকেশন।	দি স্পেন্স রিপোর্ট।
ইউকেন।	লাইফ্‌স্ বেসিস্ অ্যাণ্ড্ লাইফ্‌স্ আইডিয়াল।
নান।	এডুকেশন ইট্‌স্ ডাটা এ্যাণ্ড ফার্ষ্ট প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্। প্রথম ও পঞ্চদশ অধ্যায়।
এফ. এইচ স্পেন্সার।	এডুকেশন ফর দ্য পিপ্‌ল্।
ওয়াট্‌স্।	এডুকেশন ফর সেল্ফ্ রিয়ালাইজেসন অ্যাণ্ড্ সোস্যাল সারভিস। প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়।
ওয়েল্টন।	প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অ্যাণ্ড্ মেথড্‌স্ অব টিচিং। প্রথম অধ্যায়।

১। ম্যাথু। X ৩৯

তৃতীয় অধ্যায়

দার্শনিক সমস্যা

দর্শনের প্রধান সমস্যা মূলতঃ দুটি। প্রথমত এই বিশ্বের স্বরূপ কি তা নিয়ে দার্শনিক আলোচনা, দ্বিতীয়ত মানুষের স্বরূপ কি তা নিয়ে বিচার। প্রথম সমস্যা সমাধানে অদ্বৈতবাদী (monist)রা এক ধরণের মত দেন, দ্বৈতবাদী (dualist)রা এবং বহু তত্ত্ববাদী (pluralist)রা অন্যরকম সমাধান দেন। সাধারণ-ভাবে দার্শনিকরা বিশ্বসত্তাকে এক ও অখণ্ড বলে গ্রহণ করেন নি তাই দ্বৈত বা বহু তত্ত্ব বিশ্বের স্বরূপ বেশীর ভাগ লোক মানেন না। গ্রীক দর্শনের জন্মদাতা থেলিসের মতে যে আদি উপাদান দ্বারা পৃথিবী সৃষ্ট তা হচ্ছে জল। তাঁর পরের দার্শনিকরা কেউ বায়ু কেউ বা আগুন বলে সেই আদি উপাদানকে বর্ণনা করেছেন। পরে অবশ্য কেউ কেউ পরমাণুর দ্বারা বা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবিভাজ্য অণু সমাবেশে জগৎ রচিত বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন।

তবে দ্বৈতবাদও একটা জনপ্রিয় মত। সেটা স্বাভাবিক, কারণ আমরা দুইটি জগতের মধ্যে বাস করি। একটি হচ্ছে বাহ্য বস্তুর জগৎ আরেকটি হচ্ছে আমাদের চিন্তার বা অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতার জগৎ। দ্বৈতবাদের দুটি উপাদান, বস্তু ও চিৎ, মানুষের দার্শনিক বিচারের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। মানুষের শরীর বস্তু দ্বারা তৈরী। মন বা আত্মা অন্য আদি উপাদান, চিৎ বা মন দিয়ে রচিত। প্রাচীন মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু দিয়ে তৈরী শরীর সম্বন্ধেই বেশী সচেতন ছিলেন, আত্মাকে তাঁরা মনে করতেন শরীরেরই সূক্ষ্ম ছায়ারূপ। খ্যাতনামা দার্শনিক দেকার্ত খোলাখুলিভাবে দ্বৈতবাদে বিশ্বাস করেছেন। মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে তৈরী। তিনি এ দুটিকে এমনভাবে আলাদা করে ফেলেছিলেন যে তার পর অন্যান্য অদ্বৈতবাদী দার্শনিকের পক্ষে এই দুটিকে এক করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। মন ও শরীরের দ্বৈতসত্তাবাদ (psychophysical dualism) এর সার কথা হচ্ছে যে বস্তু ও মন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উপাদানে তৈরী এবং এ দুটি কিছুতেই এক হতে পারে না। অথচ মন ও মস্তিষ্কের brain, নিকট সম্পর্ক সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। মনের মধ্যে যে ভাবনা উপস্থিত হয় তা মস্তিষ্ক চালনার সঙ্গে সমান্তরাল-ভাবে অবস্থিত। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টি সর্ব্বদাই উপস্থিত। মন ও শরীরের

সমান্তরাল ক্রিয়াকর্মের দরুণ মন ও দেহের সম্পর্ক ও স্বরূপ সম্বন্ধে কতগুলি সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। প্রত্যক্ষত মন ও দেহের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আছে। অতএব ‘পারস্পরিক ক্রিয়াবাদে’র (Interaction theory) মতে মানসিক ঘটনাগুলি শারীরিক ঘটনার ফলে ঘটে। অথবা বিপরীতভাবে বলা যায় শারীরিক ঘটনা মানসিক ঘটনার দ্বারা সংগঠিত। অবশ্য এই মতবাদের অসুবিধা আছে। মন ও দেহ যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু দিয়ে রচিত হয় তবে কেমন করে একটি আরেকটিকে প্রভাবিত করবে। কোন শক্তি (energy) কি একটি হতে নির্গত হয়ে (efflux) অপরটিকে ক্রিয়াশীল করে তোলে? সেই অসুবিধা দূর করতে আবার অন্য একধরণের ধারণা করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে মন ও শরীরের অভিন্ন সত্তার প্রকল্প (Identity hypothesis)। এরা যেন একই সত্তার (reality) দুই ভিন্ন অংশ, সেই সত্তার রূপ যাই হোক না কেন। এও একধরণের অদ্বৈতবাদ (monism)। এর আরো কতগুলো রূপ আছে। যেমন মনকে বস্তুর অংশ বলে বর্ণনা করা হয়। কেউ কেউ বস্তুকে চিৎ অথবা মানসিক সত্তা হতে উদ্ভূত বলে ব্যাখ্যা করেন। এই দুটি অদ্বৈতবাদ ভিন্ন ভিন্ন নাম নিয়েছে। প্রথমটিকে বলা যায় বস্তুবাদ (materialism), দ্বিতীয়টিকে বলা হয় ভাববাদ (idealism)।

অদ্বৈতবাদের একটি প্রধান রূপ বস্তুবাদ। এর সংক্ষিপ্তসার এই যে বস্তু দিয়ে এই বিশ্বজগৎ তৈরী, মন বস্তুরই এক প্রকারের রূপ। অভিজ্ঞতা, চিন্তন, চৈতন্য ইত্যাদি যেন বস্তুরই একধরণের রূপান্তর অথবা উপজাত উৎপত্তি (by-product) প্রাচীন গ্রীসদেশেও বস্তুবাদ প্রচলিত ছিল। তাঁরা অণু, অসীম আকাশ, গতি এইসব দিয়ে বিশ্বজগতের সমস্ত কার্য্যকলাপের ব্যাখ্যা করতেন। বর্তমান কালেও বস্তুবাদের আধিপত্য স্বীকৃত এবং অণু, আকাশ, নিউটনের গতিতত্ত্ব ইত্যাদি দিয়ে সমস্ত কিছু ব্যাখ্যাত। যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়ে পৃথিবীর কার্য্যকলাপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশ্বজগৎকে যেন দম দিয়ে চালু করে দেওয়া হয়েছে এবং সেটিও যন্ত্রবৎ চলছে। যান্ত্রিক বিধি অনুযায়ী চালিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন এক প্রকাণ্ড যন্ত্রের মত। তবে এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়ে জীবন্ত প্রাণীকোষকে (living cell) ব্যাখ্যা করা যায় না কেননা এখনো যান্ত্রিক অণুপরমাণুর সাহায্যে প্রাণসৃষ্টি করা যায়নি। তবে বস্তুবাদীদের বিশ্বাস যান্ত্রিক প্রক্রিয়া দিয়ে একদিন উচ্চতর প্রাণীর সৃষ্টি করা সম্ভব। এই মত অনুসারে বিশ্বজগতের মধ্যে কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই। মনঃস্তত্ত্বে ব্যবহারবাদ (Behaviourism), বস্তুবাদ-প্রচারিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ‘যান্ত্রিকতার’ তত্ত্ব হতেই উদ্ভূত।

উনবিংশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানের বিশেষ চর্চা ও সাফল্যের ফলে জগতের যন্ত্রবাদী ও বস্তুবাদী ব্যাখ্যা আরম্ভ হয়। বস্তুত বিশ্বজগতের নানা ঘটনার ব্যাখ্যা পদার্থবিজ্ঞান দিয়ে করা সম্ভব। তবে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বস্তুবাদকে দৃঢ়মূল করতে খুব বেশী সাহায্য করেনি। অবিভাজ্য পরমাণুর ধারণা উনবিংশ শতাব্দীতেই পরিত্যক্ত হয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় লর্ড কেলভিন বস্তুকে কঠিন পরমাণুতে তৈরী না বলে এক কাল্পনিক বায়বীয় ইথারে আবর্তমান বৃত্তের দ্বারা বস্তুর গঠন ও গুণাবলী ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। এরপরে দুটি নতুন আবিস্কার হয় যেমন তেজস্ক্রিয়তা ও অণুর বিশ্লেষণ। আমরা জানলাম অণুর সংগঠন জটিল এবং এটা ইলেকট্রন ও প্রোটোনে বিভাজ্য। আরো জানতে পারা গেল এরা হচ্ছে বিদ্যুতের ধনাত্মক ও ঋণাত্মক গুণ, বিদ্যুৎ হয়ে দাঁড়ালো একটা অবশ্য প্রয়োজনীয় ধারণা কিন্তু তার প্রকৃত স্বরূপটা যে কি তা কেউ জানতো না। সম্ভবত: বৈদ্যুতিক শক্তি (energy) হল মৌলিক উপাদান কিন্তু তার স্বরূপই বা কি? বাইরের বিশ্বে এই যে বিকাশ দেখি তা কি আমাদের আভ্যন্তরীণ উৎসাহ, উদ্যম, মানসিক শক্তির তুল্য কোন শক্তি? প্রাচীন বস্তুবাদী অবশ্য এ নিয়ে মাথা ঘামায় না কিন্তু বহির্বিশ্বের শক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যাও করতে পারে না। মানুষ কি বহির্বিশ্বে শক্তির প্রচার দেখে ভ্রমক্রমে তাকে নিজের শক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছে? এই ব্যাখ্যা কি মানবকেন্দ্রিক দর্শনের অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত? কোন কোন বিজ্ঞানী বিপজ্জনক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ভয়ে পদার্থবিজ্ঞান হতে শক্তির ধারণা বাদ দেবার চেষ্টা করেছেন। যাই হোক্ তার পুরাতন কঠিন সংজ্ঞা হারিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি, শক্তি (energy), ইথার, বায়ুমণ্ডল ইত্যাদি কতগুলি জটিল ধারণায় পরিণত হয়েছে। অতএব বস্তুর কঠিন রূপ আর সর্ব্বজন গ্রাহ্য রইল না।

যদিও অপরিশীলিত স্থূল বস্তুবাদ সবাই গ্রহণ করেন নি স্বভাববাদ (Naturalism) নামে দার্শনিকতত্ত্বে বহুলোক বিশ্বাস করেন। স্বভাববাদ কথাটি কিছুটা অস্পষ্ট কেন না এর কয়েকটি অর্থ আছে। দার্শনিকমণ্ডলীতে এর দুটি অর্থ প্রচলিত। প্রথমটি যান্ত্রিক বস্তুবাদ (mechanistic materialism) এর অনুরূপ। একটু আগে যান্ত্রিক বস্তুবাদের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। ওটার সঙ্গে এর তফাৎ এইটুকু যে বস্তুর স্বরূপ কি সে সম্বন্ধে আলোচনা না করে স্বভাববাদ, বিশ্বসংসার যান্ত্রিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে এই মতবাদ নিয়ে বেশী ব্যাপৃত। বস্তুর কঠিন বস্তুরূপ যদিও সংশয়াতীত নয়, বিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা অবশ্য কেউ অস্বীকার করেন না।

স্বভাববাদ তার প্রথম অর্থে, বিজ্ঞানের আইন বিধি দ্বারা জগৎকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে। বিশ্বজগৎ এক বিশাল যন্ত্রবৎ পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে চলছে। মানুষের বহির্জগৎকে যখন এর দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলে তবে তাকেও (মানুষকেও) পুরোপুরি ভাবে এর দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যাবে। পরিবেশের স্বাভাবিক নির্ব্বাচন (Natural selection) অনুযায়ী যে প্রাণী পরিবেশের সঙ্গে সবচেয়ে বেশী নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে সেই প্রাণীই টিকে থাকে (Survival of the fittest)। পদার্থবিজ্ঞানাশ্রয়ী এই স্বভাববাদ বহিঃপরিবেশ ও মানুষকে বিজ্ঞান চালিত এই জগতে বেশ ভাল ভাবে ব্যাখ্যা করতে পেরেছে।

দ্বিতীয় প্রকার স্বভাববাদকে জৈবিক স্বভাববাদ বলা হয়। এই স্বভাববাদে জীববিদ্যার কতগুলি বিধির সাহায্যে মানুষকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিবর্তনের উর্দ্ধতম প্রান্তে প্রাণকে ধরে, বিবর্তনবাদের ধারণা অনুযায়ী মানুষকে শ্রেষ্ঠ প্রাণের বিকাশ বলে বর্ণনা করার চেষ্টা হয়েছে। মানুষকে তার সর্ব্বাঙ্গীন দৈহিক বিকাশের স্তরে আসবার আগে কতগুলি অপূর্ণ জীবসত্বার স্তর পার হয়ে আসতে হয়েছে। শ্রেষ্ঠ বিবর্তিত প্রাণী মানুষকে তাই সরলতর, অপূর্ণতর প্রাণীদের স্বভাব ও ক্রিয়া কলাপ দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু এই স্বভাববাদ, সাধারণত মানুষের অতীত জন্ম ইতিহাসের ওপর খুব বেশী গুরুত্ব অর্পন করে কিন্তু মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলে না। তবে এই মতবাদের মুল্য শিক্ষা ক্ষেত্রে যথেষ্ট।

এই স্বভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির উৎপত্তি লামার্ক নামে বিখ্যাত জীববিজ্ঞানীর লেখা হতে। তিনি বিবর্তনের গতি দেখে লক্ষ্য করেন যে, সব প্রাণীর মধ্যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার একটা প্রবণতা আছে। সে ভাবেই মানুষের বিকাশকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, স্যামুয়েল বাটলার তীব্রভাবে ডারুইনের প্রকৃতির নিজস্ব ঝাড়াই, বাছাইযে দুর্ব্বলতর প্রাণীর বিলোপ ও সবলতর প্রাণীর টিঁকে যাওয়া মতটির প্রতিবাদ করেন। তিনি লামার্কিয় ধারণায় বিশ্বাসী যে প্রাণীর মধ্যে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার ও খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রবণতা আছে। বার্ণার্ড শও তাঁর 'ব্যাক টু মেথুশেলা' গ্রন্থে একই ধরণের বিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। নান্ তাঁর শিক্ষাদর্শনে ব্যক্তিমুখীন শিক্ষার লক্ষ্য বিশদ করার জন্য জীববাদের বিবর্তন তত্ত্বের সাহায্য নিয়েছিলেন। এই জন্য তাঁকে কখনো কখনো স্বভাববাদীদের সঙ্গে এক তালিকাভুক্ত করা হয়, কিন্তু নানের শিক্ষাদর্শনের সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তিনি মূলতঃ স্বভাববাদী নন কিন্তু স্বভাববাদ

হতে কিছু কিছু যুক্তির সাহায্য নিয়ে তাঁর নিজের শিক্ষাতত্ত্বকে রচনা করেছেন।

ম্যাক্ডুগাল নামে আরেকজন স্বভাববাদী তাঁর প্রথম দিকের রচনায় বলেন যে মানুষের ব্যবহার, আশা, আকাঙ্খা, কামনা, ইচ্ছা ইত্যাদি মানুষের প্রবৃত্তি-চালিত। জীববিদ্যানির্ভর স্বভাববাদের মতে মানুষের জীবনী শক্তি (elan vital) আদিম ইচ্ছা, প্রবৃত্তি (horme বা mneme) দিয়ে মানুষের ক্রিয়াকলাপকে ব্যাখ্যা করা যায়।

সুতরাং স্বভাববাদ হচ্ছে দু'ধরণের, প্রাকৃতিক স্বভাববাদ যেখানে বহিঃপ্রকৃতি, তার বিধি ও নিয়ম অনুযায়ী প্রাণ, মন ও মানুষকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে জৈবিক স্বভাববাদ (biological naturalism) যেখানে সরাসরি প্রাণকে সৃষ্টির প্রথম স্তরে বলে ধরে, নিম্নস্তর প্রাণী হতে উচ্চতম প্রাণী, মানুষের স্তরে উত্তরণের ব্যাখ্যা করা হয়। প্রথম প্রকারের স্বভাববাদ প্রাণসৃষ্টির ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারে না। দার্শনিকের ও মানুষের মৌলিক প্রশ্ন, 'অসীম বিশ্বজগতের পরিপ্রেক্ষিতে আমার আত্মা কি', এর কোন উত্তর প্রাকৃতিক স্বভাববাদ দিতে পারে না। বিশাল বিশ্বজগৎ যেন মানুষের ক্ষুদ্র প্রাণের দিকে ভ্রূকুটি করে তাকিয়ে আছে। প্রাকৃতিক স্বভাববাদ বলবে, মানুষের জীবন বিশ্বপ্রকৃতিতে একটা অনিয়ম—আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর গ্রহ (পৃথিবী)তে যেন কোন অবিশ্বাস্য দৈবলীলায় প্রাণের অনুকূল বাতাবরণ থেকে যাওয়ায় প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। অন্য কোন গ্রহে প্রাণের সম্ভাবনা অতি সামান্য। বিশ্বজগতে মানুষের জীবন তার চিন্তা ভাবনা, আশা আকাঙ্খার কোন মূল্য নেই। মানুষের কীর্ত্তির পশ্চাৎপট হওয়ার জন্য এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে একথা ভাবাও দুঃসাহস। পদার্থ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বভাববাদ প্রমাণ করে যে মানুষ অতি ক্ষুদ্র ও অবহেলার যোগ্য।

জৈবিক স্বভাববাদের অবশ্য এধরণের কোন অসুবিধা নেই। এই স্বভাববাদে ম্যাকডুগালের তত্ত্ব ও জৈবিক স্বভাববাদ থেকে প্রবৃত্তি (horme) দিয়ে মানুষের জীবন, ক্রিয়াকলাপ ও কার্য্যকরণের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা করা চলে। কিন্তু এই স্বভাববাদের দুর্ব্বলতা হচ্ছে সেখানে যখন মানুষের শিল্পধর্ম্মী আশা, আকাঙ্খা, সত্য, শুভ ও সুন্দরের প্রতি তীব্র আকুলতা ইত্যাদি ব্যাখ্যা করার দরকার হয় স্বভাববাদের ব্যাখ্যা সেখানে কার্য্যকরী নয়। এই দর্শন অনুযায়ী মানুষের আদিম জান্তব প্রবৃত্তিকে তার মৌলিক প্রকৃতি বলে ধরে নেওয়া হয়। ঠিক সেভাবেই

তার মনুষ্যেতর পূর্ব্বপুরুষ হতে বিবর্ত্তিত শরীরকেও শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নেওয়া হয়।

কোন কোন স্বভাববাদে মানুষের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করে না—কিন্তু তার প্রাচীন ইতিহাস অথবা জীবনের উৎস বা বিবর্ত্তন সম্বন্ধে মাথা ঘামায়। এই জীবন দর্শন যদি গ্রহণযোগ্য না হয় তবে অন্য কোন সম্ভাব্য দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

এই দর্শনের বিকল্প দর্শন অধ্যাত্মবাদ অথবা ভাববাদ (Idealism)। ভাববাদের নানা প্রকার রূপ আছে কিন্তু মূল স্বীকার্য্য এক। সেটি হচ্ছে এই বিশ্বসত্তা চিৎস্বরূপ, অতএব যা কিছু মানসিক যেমন অভিজ্ঞতা চিন্তন আদর্শ, ব্যক্তিত্ব সব কিছুকেই বেশী মূল্য বা গুরুত্ব দেওয়া হবে কেন না সেগুলিই বিশ্বসত্তার অন্তরে নিহিত। এগুলো বস্তু বা নিম্নতর জীবজগৎ হতে শ্রেষ্ঠতর। মন যে শুধুমাত্র মস্তিষ্ক এবং চৈতন্য মস্তিষ্ক চালনার একটি অকিঞ্চিৎকর বাড়তি ঘটনা (byproduct), এ ধারণার ভাববাদ তীব্র প্রতিবাদ করে। বরঞ্চ চেতনাই মূল অস্তিত্ব। রাস্ক সুন্দরভাবে এর বর্ণনা করে বল্লেন, "স্বভাববাদের প্রশ্ন হচ্ছে শরীরের মধ্যে মন কেন? ভাববাদ প্রশ্ন করে মনের সঙ্গে শরীর কেন?" শেষোক্ত প্রশ্নটির উত্তর যাই হোক ভাববাদ মানুষের মনকে তার শরীরের থেকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকে। জ্যোতির্বিদদের বিরাট, বৃহদাকার বিশ্বজগতের চেয়ে মানুষের মন অনেক বেশী মূল্যবান।

সক্রেটিসের কাল হতেই সমস্ত ভাববাদীরা মনে করেন যে বহিঃপ্রকৃতির চেয়ে মানুষের মনই বেশী বিবেচনার যোগ্য। সক্রেটিস কখনো এথেন্স শহরের বাইরে পা দেন নি বলে তাঁর এক বন্ধু ফাইড্রাস (Phaedrus) তাঁকে 'কূপমণ্ডূক' বলে বিদ্রূপ করেন তখন জ্ঞানবৃদ্ধ সক্রেটিস সবিনয়ে বলেছিলেন, "সে কথা অতি সত্য। তবে যে কারণে আমি শহরের বাইরে যাই না সে কথা শুনলে আপনি আমাকে নিশ্চয় মার্জ্জনা করবেন। আমি জ্ঞানের পিপাসু। এথেন্স শহরের মানুষ আমার শিক্ষক। তাদের কাছ হতে আমি জ্ঞান আহরণ করি। প্রকৃতির গাছপালা বা গ্রাম হতে আমার কিছু জ্ঞান লাভ হয় না।" ভাববাদের এইটিই মুখ্য কথা যে মূল সত্তার স্থান মানুষের মনে, বহির্বিশ্বে নয়। কাজেই তাকে চিনতে হলে মন দিয়ে মন চিনবার সাধনা করতে হবে। বাইরে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন কি আধুনিক বিজ্ঞান দিয়ে অনন্ত আকাশের বিস্তৃততর দিগন্ত আবিষ্কারেও ভাববাদী বিচলিত নন। কেননা তাঁর মতে

মানুষের যে মনীষা এই রহস্য উন্মোচন করতে পারে তা উন্মোচিত রহস্যের চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান।

ভাববাদের একটি মূল বিশ্বাস হচ্ছে, বিশ্ব নিয়মের রাজ্য—যুক্তিগ্রাহ্য (rational)। এখানে বিজ্ঞানের ধারণার সঙ্গে ভাববাদীর কিছুটা মিল আছে। বিজ্ঞানের বিধিগুলিও যুক্তিগ্রাহ্য ও অপরিবর্তনীয় তবে ভাববাদীরা বিশ্বের যৌক্তিকতা ও নিয়মতান্ত্রিকতা কতগুলি বিজ্ঞানের বিধির দ্বারা ব্যাখা না করে এক বিশ্বব্যাপী চিৎ (universal mind) দিয়ে ব্যাখ্যা করে থাকেন। ফেক্‌নারের মতে এই বিশ্ব এক প্রাণময় সত্তা। যার শরীর ও আত্মা আছে এবং এই বহির্জগৎ যেন সেই বিশ্বমনের বহিঃপ্রকাশ। "যেন এই বিশ্ব, ঈশ্বরের প্রাণময় দৃষ্টিগোচর বিচিত্র অঙ্গবস্ত্র।" হেগেল তাঁর পরম ভাববাদে (Absolute Idealism)এ জগৎকে ঈশ্বরের চিন্তন প্রক্রিয়ার বিকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। ঈশ্বর যা চিন্তা করছেন বিশ্ব যেন তারই প্রত্যক্ষরূপ, আমাদের শিল্পদর্শন ও ধর্মের মধ্য দিয়ে সেই চিন্তনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারি।

ভাববাদের অন্য কয়েকটী রূপ আছে। তারা শেষকালে এই জড় পৃথিবীকে মনপদার্থ দিয়ে তৈরী এই ধারণা দিয়ে বস্তুর আদিম উপাদান মানসিক, এই মত প্রতিষ্ঠা করেন। এই সর্ব্বচিন্ময়বাদে (panpsychism) সমস্ত সৃষ্টি মনোময়। প্রতিটি অণু প্রাণময়, মনোময় ও শক্তিসম্পন্ন। লাইব্‌নিজের মতে বস্তুর সার হচ্ছে মানসিক। অণুরা কঠিন বস্তুর টুকরো নয়। তাদের নাম দিলেন মোনাড্ (monads) বা মনপরমাণু। এরা অণু আত্মিক শক্তি, শক্তি আবর্ত্তনের কেন্দ্রবিন্দু এরা, মানুষের শরীর এই মন পরমাণুর দ্বারা গঠিত, তার মন ও একটি চালক মনপরমাণু। এই মোনাড্‌তত্ত্ব দিয়ে এমনি করে মনকে বিশ্বের সামগ্রিক চিত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে কোন অসুবিধা রইল না। সেই যুগে বিজ্ঞানীরা অণু-পরমাণুকে শক্তির কেন্দ্র বলে আগেই ব্যাখ্যা করেছিলেন, কাজেই মনপরমাণুর ধারণাটা খুব অসম্ভব বোধ হল না। তাছাড়া পদার্থ বিজ্ঞানীরা এও বলেছিলেন যে "অণুরা স্ব স্ব ভঙ্গিতে কি ঘটনা ঘটাবে তার বিশেষ কোন স্থির নিশ্চয়তা নেই।"[১] অতএব "মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার সামনে বিজ্ঞানে কোন বাঁধাধরা বিধি ও নিষেধের প্রাচীর তুলে দাঁড়াতে পেলনা।"[২]

ভাববাদের তৃতীয় একটি রূপ বলে যে সমস্ত জড়জগৎ মন সৃষ্ট প্রতিভাস

১। জীন্‌স্‌। দ্য মিষ্টিরিয়স ইউনিভার্স্‌, পৃঃ ২৮
২। ” ” ” ” ” ২৯

(appearance)। বার্কলের দর্শনে এই মত অতি উগ্র স্বজ্ঞাবাদের (subjective idealism) চেহারা নিয়েছে। এই প্রসিদ্ধ আয়র্ল্যাণ্ড বাসী দার্শনিক খুব নিপুণভাবে জড়বাদীদের দার্শনিক ধারণার যোগ্য উত্তর দিয়েছেন। এই মতবাদ বলে যে বস্তুর অস্তিত্ব ও সত্তা নির্ভর করবে কেউ তাকে প্রত্যক্ষ বা অনুভব করছে কিনা তেমন এক মানসিক সত্তার ওপর। কোন ব্যক্তিগত মন বা কোন বিশ্বমন তাদের প্রত্যক্ষ না করলে তাদের কোন বাস্তব বা স্বাধীন অস্তিত্ব থাকতে পারে না। অত্যুগ্র স্বজ্ঞাবাদী বলেন বিশ্বজগতের অস্তিত্ব ব্যক্তি বিশেষের চিন্তার উপর নির্ভরশীল অতএব জগৎ ও বিশ্বসত্তা মানসিক। আমাদের প্রত্যক্ষের বাইরে অন্য কোন অস্তিত্ব আছে কিনা আমরা জানিনা। তর্কের খাতিরে এ কথাটির সত্যতা স্বীকার করতেই হয় যে আমরা আমাদের প্রত্যক্ষ জগৎকেই দেখি; তার পেছনে বাস্তবিক কোন সত্তা আছে কিনা তা জানার বা প্রমাণ করার সামর্থ্য আমাদের নেই, কোন বিজ্ঞানীরও নেই।

প্রখ্যাত দার্শনিক কান্ট্ (Kant) তাঁর 'ক্রিটিক অব পিওর রিজনে' বলেন যে এই জগৎকে আমরা প্রাতিভাসিক সত্তা (appearance) বলেই শুধু জানতে পারি। কিন্তু তিনি বিষয়ী নিরপেক্ষ পারমার্থিক সত্তা (thing-in-itself) এর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নি। এর স্বরূপ কিন্তু আমরা জানতে পারি না, তাঁর প্রাতিভাসিক সত্তার ধারণা কাজেই ব্যক্তিনির্ভর স্বজ্ঞাবাদ নয়। তাঁর 'ক্রিটিক অব প্র্যাকটিকাল রিজনে' তিনি শেখালেন যে সদ্‌বস্তু বা noumenon-এর এক সত্য জগৎ আছে, এই অভিজ্ঞতাময়, কর্তব্য, দায়িত্ব ও নীতিবোধের জগৎ সম্বন্ধে কিন্তু আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। কাজেই কাণ্ট ভৌত জড় জগতের সত্যতাকে অস্বীকার না করলেও বিশিষ্ট ভাববাদীদের অন্যতম বলে গণ্য।

সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বজ্ঞাবাদীদের ব্যক্তিনির্ভর ধারণাতে বিশ্বাস করা শক্ত। তাদের কাছে যে জগৎ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তার সত্য অস্তিত্ব আছে, মনের ওপর সে নির্ভরশীল নয়। কেন না এর বিপরীত ধারণার সঙ্গে সাধারণ বোধের বিরোধ বাধে। এই মত কে বলা হয় বস্তুবাদ, যা বলে যে মনের বাইরে জগতের বস্তুময় অস্তিত্ব আছে। এটি স্বজ্ঞাবাদের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি।

রোনাল্ড নক্সের একটা সুন্দর কবিতায় এই ভাবটি প্রকাশিত।

"জনশূণ্য পথের ধারে
তরুটি ঐ একলসারে
থাকবে সে কি ?

নয় তো বা সে মিলিয়ে যাবে
অবাক একি ?
বিশ্বজগৎ গড়েন বিধি
অবাক তিনি হবেন নাকি
গাছ বেচারার কাণ্ড দেখি ?

' There once was a man
Who said, "God
Must think it exceedingly odd
If He finds that this tree
Continues to be
When there's no one about in the Quad."

আমি যখন থাকবো না তখন জগতের অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়ে যাবে একথা বিশ্বাস করা অত্যন্ত কঠিন। আমার প্রত্যক্ষের বাইরেও এর অস্তিত্ব অবশ্যই থাকবে। কাণ্টের (Kant) সাবধান বাণীতে আমাদের কর্ণপাত করা উচিত যে জগৎটা আমাদের প্রত্যক্ষে যেমন দেখায় ঠিক তেমনি, একথা নিতান্ত বালকোচিত বস্তুবাদ (naive realism)। বস্তুতঃপক্ষে তা অবশ্যই নয়। তবে আধুনিক বিজ্ঞানের সেই সাবধানী বাণীর প্রয়োজন নেই। অবশ্য বিজ্ঞান স্বতঃই বস্তুবাদী মতের সত্যতা স্বীকার করে নেয়, কেন না তা নইলে তার নিজের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। কিন্তু প্রত্যক্ষের পেছনে বস্তুর মৌলিক সত্তা সম্বন্ধে আলোচনার শেষ মীমাংসা বিজ্ঞান করে দেয় না। অর্থাৎ সেটা জড় কি মানসিক সে সম্বন্ধে শেষ কথা বলার চেষ্টা বিজ্ঞান করে না। বিজ্ঞানীরা আজকাল যখন দার্শনিক প্রশ্ন সম্বন্ধে তাঁদের মনোযোগ দিয়েছেন তখন তাঁদের নির্ভেজাল বস্তুবাদী হওয়ার কিন্তু প্রয়োজন নেই। তাঁদের কাছে অণুপরমাণুর চরিত্রও অনেকটা মানসিক। এমন কি বিখ্যাত বিজ্ঞানী জেম্‌স্ জীন্‌সের মতে বিশ্বজগৎ যন্ত্রবৎ নয় – এক বিশাল মনের মত। এই মনের এক প্রকাশ বিশুদ্ধ গণিতশাস্ত্র। আরো একটি বিস্ময়কর ধারণা তিনি উপস্থিত করলেন যে এই বিশাল জগতের রচয়িতা নিশ্চয়ই একজন প্রখ্যাত অংকবিদ্।

একসময় এ ধরণের ধারণা নিতান্ত অবাস্তব ও অসত্য বলে উড়িয়ে দেওয়া হত। বর্তমানে কিন্তু বস্তু শুধু কঠিন অণু দিয়ে গঠিত সে ধারণা পরিত্যক্ত হয়েছে এবং অণুপরমাণুরা স্বয়ং বস্তুহীন বিদ্যুৎ শক্তির জটিল গঠন বলে স্বীকৃত

হচ্ছে। জড় বিজ্ঞানের দ্বারা সেই আদিম উপাদান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হচ্ছে না। এখানে প্রত্যক্ষ অবসিত হচ্ছে ও দার্শনিক ভাবনা সুরু হচ্ছে।

ইংরেজ কবি পোপের ধারণা,

"Nature and Nature's laws, lay hid in night
God said "Let Newton be!" and all was light.

সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান দিয়েই জে. সি. স্কোয়ারের উত্তর

It did not last : the Devil, howling "Ho !"
"Let Einstein be !" restored the status quo.

এগুলি আজকের দিনে আর সত্যি নয়।

পদার্থবিজ্ঞানী আর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ক্রমে ক্রমে জগতের বর্ণনা অঙ্কশাস্ত্র দিয়ে করতে আরম্ভ করলেন। তাঁদের আঙ্কিক ব্যাখ্যা আমাদের বিস্ময়াভিভূত করে। প্রতিটি প্রাকৃতিক নিয়মকানুন, বস্তুতঃপক্ষে সমস্ত জগৎকেই তাঁরা গাণিতিক নিয়মে সমীকরণ করে দেখিয়েছেন। কিন্তু এ সমস্ত সমীকরণে যে অজ্ঞাত সংখ্যা x, তাঁরা ধরে নেন তাঁর স্বরূপ এঁরা ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। বস্তুর অন্তর্নিহিত রূপ সম্বন্ধে কোন ধারণা দিতে এঁরা অপারগ হয়ে স্বীকার করেন আজও তাঁদের জ্ঞান শূণ্যগর্ভ; এঁদের আকার সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলেও মূল বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। সত্তার অন্তিম বিশ্লেষণে গাণিতিক বিজ্ঞান বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। বস্তুর বহিরঙ্গ সম্বন্ধে এঁদের জ্ঞান গভীর হলেও অন্তরঙ্গ স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান সামান্য। বিশ্বের মূল উপাদান কি ? কেউ কেউ এ প্রশ্নের উত্তর দিতেই পারেন না। স্যর আর্থার এডিংটন বিশ্বসত্তাকে মানসিক চিৎ শক্তি দিয়ে রচিত বলে বর্ণনা করেন। এই মত ভাববাদকে সমর্থন করে। এডিংটনের ভাষায়, "অজানার বালুতটে আমরা আশ্চর্য্য পদচিহ্ন দেখতে পেলাম। সেই চিহ্নের উৎসকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমরা একটার পর একটা মতবাদ সৃষ্টি করলাম। তারপর যখন সেই জীবটিকে নতুনভাবে সৃষ্টি করলাম, অবাক হয়ে দেখতে পেলাম সেই পদচিহ্ন আমাদেরই।" এমন কি স্যর জেম্‌স্‌ জীন্‌স্‌ স্বজ্ঞাবাদী ভাববাদীদের সঙ্গে সহমত হয়ে বল্লেন, "এই পুরোন প্রশ্নটি তখন ওঠে, যে এই শিশুটি (মানুষ) কি কোন উপায়ে নিশ্চিত হতে পারে যে সে যা দেখছে তা স্বপ্ন নয় ? যে ছবি সে দেখছে হয়তো তা তার নিজস্ব মনের সৃষ্টি, যেখানে সে ছাড়া আর কেউ নেই। এত পরিশ্রম করে যে জগৎকে আমরা জানি তা হয়তো স্বপ্ন, আর আমরা স্বপ্নদর্শীর মস্তিষ্কের জীবকোষ সমূহ মাত্র।"

যাঁরা জগতের স্থূল জড় ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নন তাঁদের কাছে ভাববাদ একটি আকর্ষণীয় তত্ত্ব। প্রায় সমস্ত মহৎ দার্শনিকদের দ্বারা সযত্নে প্রতিষ্ঠিত ভাববাদের মূল তত্ত্বগুলি এই বিজ্ঞানের যুগেও সসম্মানে গ্রাহ্য। এও দেখা যাচ্ছে, স্থূল জড়বাদ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এ দুটোকে অভিন্ন মনে করবার কাল বিগত। স্থূল জড়বাদের সমর্থক বর্তমানে বেশী দেখা যায় না। বিজ্ঞানীরাও এখন আধুনিক ভাববাদকে গ্রহণ করতে পারেন। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারা যায় না বলে তাঁর অস্তিত্বকে সন্দেহ করতে হবে এমন ছেলেমানুষী ধারণা বিজ্ঞানীদেরও নেই। ভাববাদী দর্শনকে অলস মস্তিষ্কের খেয়ালী ভাববিলাস একথাও কেউ বলবে না। তবে বর্তমান ভাববাদীদের মতটাও স্পষ্ট করে বলা যাক্। তাঁরা যদিও বিজ্ঞানের সমর্থনকে স্বাগত জানিয়েছেন কিন্তু নিজেদের মত (ভাববাদ)কে প্রমাণ করার জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য প্রার্থনা করেন নি। বিজ্ঞান যাই বলুক যন্ত্র, যান্ত্রিকতা ও বস্তু দিয়ে সৃষ্টির মূল রহস্য বা মানুষের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় বলে ভাববাদীরা মনে করেন না। অতি নিম্নস্তর হতে জীবোত্তম মানুষের উদ্ভব সম্পূর্ণ মেনে নিতে তাঁরা প্রস্তুত নন। তাঁরা বলেন ন্যায়শাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, নন্দনতত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্ব দিয়ে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যা করা বেশী সম্ভব কিন্তু জীববিদ্যা দিয়ে মানুষকে তেমন সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাঁদের বিশ্বাস মানুষের আত্মার সঙ্গে বিশ্বের আত্মার একটি হার্দিক মিল আছে। মানুষের মন এই বিশ্বজগতের এক আকস্মিক সংঘটন নয়। বিশ্বজগতে বিশাল ঘূর্নির সংঘাতে হঠাৎ স্ফুলিঙ্গের মত জীবন কণিকার জন্ম হয় নি। বিশ্বের অন্তরে মানুষের আশা আকাঙ্খা উদ্দেশ্য, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এরা পরম সত্য এবং এক ধরণে, অনির্ব্বাণ জীবন ও অসীমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জীন্‌সের আঙ্কিকভাববাদ বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করলেও কিন্তু ভাববাদীরা তা দিয়ে নিজেদের দর্শনের ব্যাখ্যা করতে পারেন না। জীন্‌স্ বলেন বিশ্বসৃষ্টির অন্তরে 'বিশুদ্ধ চিন্তনের' স্থান আছে। কিন্তু অনুভব, সৌন্দর্য্যবোধ, নীতিবোধ ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি নীরব। সেগুলি তিনি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন নি। তাঁর আঙ্কিক ঈশ্বর হচ্ছেন তর্কশাস্ত্রের ¹বিশুদ্ধ চিন্তন। ভাববাদীরা মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ, নীতিবোধকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। প্রখ্যাত ভাববাদী প্লেটোর মত এখানে উল্লেখ করা যাক্। তাঁর মতে সত্য, শিব ও সুন্দরের পরমতম আদর্শের দিকে সংসারের সকল সীমাবদ্ধ

¹স্যর জেম্‌স্ জীন্‌স্। স্পেস, টাইম অ্যাণ্ড গ্র্যাভিটেশন। পৃঃ ২০১

অসম্পূর্ণ মানুষ উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে আছেন। শ্রেষ্ঠ সত্য, শ্রেষ্ঠ শুভ, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্যের ভাবসত্তার প্রতিচ্ছায়াতে জগতের লঘুতর শুভ, সৌন্দর্য্য ও সত্য রচিত।

প্লেটোর 'ডায়ালগ' এর মত এত সুসম্পূর্ণ ও উন্নত আর কোন নীতি শাস্ত্র আমাদের জানা নাই। এই তত্ত্বগুলি যে আমলে লেখা হয়েছিল সেই পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তখন সোফিষ্ট বলে একদল সুবিধাবাদী তার্কিকগোষ্ঠী সমাজে তাঁদের মতামত সরবে প্রচার করছেন। তাঁরা বলছিলেন কোনটা ন্যায় বা কোনটা অন্যায় তা অনেকটা নিজেদের সুবিধা, অসুবিধা হিসেবে ঠিক করে নেওয়া যায়। ন্যায়ের কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। যে কাজ এক জায়গায় অন্যায়, স্থান, কাল ভেদে তাই আবার ন্যায় সঙ্গত। প্লেটোর ডায়ালগে সক্রেটিস কিন্তু এই 'আপেক্ষিক ন্যায় তত্ত্বকে" প্রতিবাদ করে দেখালেন যে ন্যায়নীতির চিরন্তন ভূমি আছে, তা সুবিধা বা স্থান কাল ভেদ অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হয় না। নীতি, যাথার্থ্য, সাহস, ন্যায়বিচার এসব তাৎক্ষনিক নয়, চিরকালীন।

প্লেটোর বিখ্যাত গুহার রূপক (metaphor of the cave) থেকে উদ্ধৃত করছি, "দেখতে পাচ্ছ? ঐ যে মানুষের দল অন্ধকার পাতাল পথে চলেছে, তাদের দৃষ্টি আলোর দিকে নিবদ্ধ। শিশুকাল হতে তারা এই অন্ধকূপে আবদ্ধ। ওদের পায়ে ও গলায় এমন শৃঙ্খল যে ওরা নড়তে পারে না, শুধু দেখবার ক্ষমতা ওদের আছে। ওরা মাথা ফেরাতে পারে না। ওদের মাথার ওপরে ও পেছনে আগুন জ্বলছে। তাদের ও আগুনের মাঝখানে একটি উঁচু পথ। সেখানে রাস্তার ধারে এমন একটি প্রাচীর আছে, যার ওপরে পথিকদের ছায়া পড়ে। বন্দীরা খেলার পুতুলের মত সেই ভ্রমন্ত যাত্রীদের ছায়া দেখতে পায় কিন্তু কখনো সত্যিকার মানুষদের দেখতে পায় না। কেন না ওরা নিগড়ে আবদ্ধ। সেই পথ দিয়ে জনস্রোত বয়ে চলেছে, কেউ মাথায় বোঝা নিয়ে কেউ বা কথা কইতে কইতে কেউ বা নীরবে ভ্রমণ করছে। বন্দীরা শুধু আগুনের আলোয় প্রতিফলিত ছায়াছবি দেখতে পাচ্ছে, আসল লোকদের চেহারা দেখবার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা শুধু সত্যিকার বস্তুর ছায়ামাত্র দেখতে পায়।"[১]

এই রূপকের দ্বারা প্লেটো বলতে চেয়েছেন আমাদের জীবনে কি ঘটে। বাইরের প্রকৃত জগৎ সম্বন্ধে বন্দীদের কোন জ্ঞান নেই, জগতের ছায়ামাত্র তাদের কাছে উদ্ভাসিত, যদি কেউ তার শৃঙ্খলের বন্ধন পুরোপুরি ছিন্ন করতে

১। প্লেটো। রিপাবলিক। VII পৃঃ ৫১৪

পারতো তবে জগতের পূর্ণ ও সত্যজ্ঞান পেতে পারে। আমরা সবাই ঐ শৃঙ্খলিত মানুষদের মত প্রকৃত জগতের [illegible] হতে নির্ব্বাসিত। ছায়াকে আমরা কায়া বলে জানতে অভ্যস্ত। আমরা যুক্তি দ্বারা হয়তো ছায়াগুলির অর্থ বুঝতে এবং যেই কায়া সেই ছায়া সৃষ্টি করছে তার স্বরূপ অনুমান করতে পারি। যাঁরা জগতের সত্যরূপ এমন করে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেন, তারা দার্শনিক। হয়তো অবশেষে তাঁরা এই বন্ধনময় জগৎ থেকে চিন্তনের সাহায্যে ঘুরে দেখতে পাবেন সত্য জগতের রূপ, এমন কি বাইরেও এসে দাঁড়াতে পারবেন।'[১]

গুহার বাইরের ঘটনাগুলিকে প্লেটো নাম দিয়েছেন ভাবসত্তা (Ideas or essences)। এগুলি নিত্য, শাশ্বত ও সর্ব্বগ্রাহ্য (universal)। আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে যা আমরা জানি তা খণ্ডিত সত্য, ব্যক্তিগত সত্য। দার্শনিক তাঁর চিন্তা ও বুদ্ধি দিয়ে ব্যক্তিগত সত্য হতে সর্ব্বগ্রাহ্য সত্যে পৌঁছুতে পারেন। একটি মানুষ বা একটি গাছ হতে তিনি মানুষের সাধারণ ধারণা বা গাছের সাধারণ ধারণায় উপনীত হতে পারেন, প্রকৃত জগতের ধারণা তাঁর ইন্দ্রিয় হতে আসে না। আসে তাঁর চিন্তনের দ্বারা। তিনি বস্তু হতে ভাবসত্তাকে পৃথক করে দেখতে সক্ষম। ভাবসত্তাকে তিনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু মনে করেন না। ভাবসত্তাকে তিনি বস্তুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেন না"। দার্শনিক পূর্ণ জাগরিত, স্বপ্নদর্শী নন।

এই সর্বদা পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু জগতের বাইরে এক চিরন্তন, আকার (forms), স্বরূপ (nature), সার (essences) বিশিষ্ট ভাবসত্তার জগৎ আছে। মানুষ তাকে শুদ্ধজ্ঞান বা চিন্তন দিয়ে জানতে পারে। শুদ্ধ জ্ঞান যে পাওয়া সম্ভব তা মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ মত (opinion) হতেই প্রমাণিত। "প্রতিভাসিত, প্রত্যক্ষ বস্তুসমূহ, যেই যেই ভাবসত্তাগুলিকে তারা প্রতিফলিত করে, তাদেরই নাম নিয়েছে।"[২]

'একটু উদাহরণ দিয়ে রসের বক্তব্য বোঝানোর চেষ্টা করা যাক্। উপনিষদের ঋষিরা বলেন আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে যে জগৎকে জানি তা মিথ্যা। তা পরমসত্তার প্রতিভাস। প্লেটোও তেমনি বলেছেন যে মানুষকে প্রত্যক্ষ করি তা মানুষ নামে চিরন্তন ভাবসত্তার প্রতিফলন মাত্র। প্লেটোর মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য 'বিশেষ' বস্তু সমূহের যে জগৎ তা সার্বিক ভাবজগতের ছায়ামাত্র। বিশেষ

১। প্লেটো। রিপাবলিক V পৃ: ৪৭৬
২। ফাইডো। (Phaedo) পৃ: ১০২

একটি টেবিল বা বিশেষ একজন মানুষের বাস্তব সত্তা নেই। তারা ক্ষণিক ও নশ্বর। কিন্তু 'টেবিল' বা 'মানুষ' ভাবসত্তাগুলি চিরন্তন। এই ভাবজগৎ (archetypes) সকল বিশেষ বস্তুর মূল ভাবগত রূপের আশ্রয়। সমস্ত জ্ঞান সেই সার্বিক জগতের ভাবের স্মৃতিমাত্র। আমাদের আত্মা ভাবজগতের অধিবাসী, সেই আত্মবস্তুকে জানাই প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞানের চরম কথা হচ্ছে 'আত্মানং বিদ্ধি'। ইন্দ্রিয় দিয়ে আমাদের চারপাশের ছায়াজগৎকে জানা সত্যিকার শিক্ষা নয়। স্বজ্ঞা (intuition) দিয়ে চরম সদ্‌বস্তু কে জানা প্রকৃত শিক্ষা। প্লেটো কতগুলি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে এই তথ্যটি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীতে অনেক ভিন্ন ভিন্ন টেবিল খাট ইত্যাদি আছে কিন্তু সেগুলো তৈরী করার সময় ছুতোরের মনে খাট বা টেবিলের একটা সাধারণ ধারণা থাকে (universal idea)। সেই ধারণার কাছাকাছি সে কিছু বানায়। সত্যিকার ভাবসত্তা ভাবজগতেই থাকে। প্লেটোর জগৎ এক বিরাট অঙ্কশাস্ত্রের মত। আদর্শ আকৃতি (বৃত্ত ইত্যাদি) ভাবজগতে আছে। মানুষ শুদ্ধ জ্ঞান দিয়ে সেখানে পৌঁছাতে পারে কিন্তু যা তারা হাত দিয়ে আঁকতে পারে তা সেই আদর্শের অনুকৃতি মাত্র। মানুষ যত শ্রমেই আদর্শ ত্রিভুজ আঁকতে চেষ্টা করুক, যত যত্ন করেই তার ত্রিকোণের সমষ্টি মাপুক, তার মাপ সর্ব্বদাই প্রায়-নিখুঁৎ। পুরোপুরি নিখুঁৎ নয়। অথচ বিশুদ্ধ জ্ঞান দিয়ে সে জানে যে জ্যামিতির আদর্শ ত্রিভুজের ত্রিকোণের সমষ্টি অবশ্যই ১৮০° ডিগ্রী। অতএব জগতের সার্ব্বিক ধারণা, আকৃতি (Form) সার (essences) এগুলিই সত্য। বাইরের অন্য সমস্ত ঘটনা তার অস্পষ্ট, অনিখুঁৎ অনুকৃতি মাত্র। এরা চিরকালীন—অবিনাশী, অনাদি ও অনন্ত।

"এই সার্বিক জগতের ভাবসত্তাগুলি সত্য কিন্তু তারা ভাব অতএব তার তত্ত্বকে 'ভাববাদ' বলা হয়। এভাবে ভাববাদের উৎপত্তি হল।"[১]

শিক্ষণের ক্ষেত্রে ও জীবনের ক্ষেত্রে সার্বিক ভাবজগতের নীতিগত মূল্যগুলিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্লেটোর ভাববাদ বিশেষ মূল্যবান। এ সমস্ত নীতি ও নন্দনতত্ত্বের আদর্শ চিরকালীন। এদের নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। প্লেটোর ভাবজগতের সার্বিক ভাবসত্তাগুলি ব্যক্তিগত অজ্ঞতার মনের বাইরে অবস্থিত। এই ভাববাদ স্বভাববাদীদের ভাববাদ নয়। বরঞ্চ একে বস্তুবাদী বলা যায়। অবশ্য আগে যে বস্তুবাদের উল্লেখ করা হয়েছে তার সঙ্গে একে গুলিয়ে না ফেলাই ভাল।

১। ফাইডো। পৃঃ ১৭০

প্লেটোর ভাববাদের মর্ধ্যাদা ও বৈশিষ্ট হচ্ছে এটি সৌন্দর্য্য ও নীতিবোধকে চূড়ান্ত মর্য্যাদা দিয়েছে শিক্ষায় ও জীবনে। এই মূল্যগুলির যেন এক শাশ্বত ভাবজগতে সত্য বাস্তব অবস্থান রয়েছে। পদার্থ বিজ্ঞানের রাজ্যে এদের কেমন করে খাপ খাওয়াতে হবে, বা স্বভাববাদী মানুষের চালচিত্রে এদের কেমন করে ব্যাখ্যা করা যাবে তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। "ভাবজগতে পরম সৌন্দর্য্য, পরম শুভ ও পরম মহত্ত্বের অস্তিত্ব রয়েছে।"[১] জগতের যা কিছু আমরা শুভ বা সুন্দর এবং সত্য বলে মানি তারা সেই ভাবসত্তাগুলির অনুকরণে রচিত এবং কিছু পরিমাণে তাদের গুণেরও অধিকারী।

প্লেটো শুধু মাত্র তিনটি পরম ভাবসত্তাকে (সত্য, শিব ও সুন্দর) প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি বলেন এদের মধ্যে সংযোগের সূত্র আছে। তিনি হচ্ছেন পরম শুভ (the Good)। এই শুভ, জগতের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুন্দর ও ন্যায়বান। তিনি ঈশ্বর। "তিনি এই জগতের যা কিছু সুন্দর যুক্তিনিষ্ঠ তারই রচয়িতা।"[২] অপূর্ণতর আকৃতি পর্য্যবেক্ষণের শেষে চকিত উদ্ভাসনে, 'মরমী'র অনুভূতিতে এই শুভর ধারণা মনে আসে। খ্রীষ্টধর্মে এঁরই অপর নাম ঈশ্বর, যদিও প্লেটো নিজে পরমসত্তা (supreme reality) হিসেবে ঈশ্বরের নাম করেন নি।

প্লেটোর ধারণা অনুসরণ করে আমরা ঈশ্বরের ধারণায় পৌছাই। জগতের সত্য, শুভ ও সুন্দর তাঁরই গুণের প্রকাশ। মানুষের আত্মা সেই পরমাত্মার প্রতিমা হতেই রচিত। তাঁর নিত্য ভাবসত্তার প্রতিভাস এ জগতের সমস্ত বস্তু। মানুষের আত্মা সেই আত্মিক চিরন্তন ভাবজগৎ ও স্থানকালে সীমিত জগতের মাঝে যোগসূত্র। খ্রীষ্টধর্ম মূলত প্লেটোর ভাববাদের সমর্থক কিন্তু ভাববাদের অশরীরী অস্তিত্ব না মেনে মানুষের শারীর রূপে সমস্ত বাঞ্ছনীয় গুণাবলী সংযোজন করে এক ঈশ্বরের রূপ দান করেছে যাতে আমরা সকলে তাঁর মহিমা অবলোকন করতে পারি।

প্লেটোই প্রথম এই জগতের বাইরে আরেকটি জগতেরও জীবনের যুক্তিনিষ্ঠ বিবরণ দেন এবং আশা জাগিয়ে তোলেন যে সেই জীবন সুন্দরতর, কল্যাণময় ও সত্যতর। আপাতত তাকে আমরা যেন কাঁচের মধ্যে দিয়ে অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এ জীবনের অবসানে, পরিপূর্ণ ঔজ্জ্বল্যে দেখতে পাবো। সেই জগতের শুদ্ধজ্ঞান, কল্যাণ ও সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্লেটো কোনরকম পরিস্কার বিভাগ করেন

১। ফাইডো (Phaedo) পৃঃ ১০০
২। ফাইডো (Phaedo) পৃঃ ১০০

নি। কিন্তু ভাগ করা সম্ভব। রং, পাথর, শব্দতরঙ্গ সমস্তই বস্তু, যা দিয়ে সুন্দর উপাসনার জায়গা, চিত্র বা সঙ্গীত রচিত হয়। কিন্তু সেই চিত্র, মন্দির বা সঙ্গীত চরম সুন্দর নয় কেন না চরম সুন্দরের অবস্থান ভাবজগতে। প্রকৃত শিল্পী সুন্দরের ধ্যানে মগ্ন থেকে কোনক্রমে সেই সৌন্দর্য্যের খানিকটা অংশ আমাদের উপহার দিতে পারেন। যখন আমরা কোন পার্থিব মন্দিরের অনুপম কারুকলায় মুগ্ধ হই (যেমন সাত্রে'র গীর্জ্জায় দাঁড়িয়ে নেপোলিয়ান বলেছিলেন, "এখানে কেউ ভগবৎ অবিশ্বাসী থাকতে পারেনা।") তখন আমরা সেই সর্ব্বসম্পূর্ণ পরম সুন্দর ও সত্যময় জগৎপিতার মন্দিরে এসে দাঁড়াই। অর্থাৎ ভগবান বা সম্পূর্ণতার খানিকটা কাছাকাছি আসি, মন্দিরের শিল্পী বা সার্থক সঙ্গীত রচয়িতা আমাদের সেই সত্যজগতের অন্তরে নিয়ে যায়।

সৌন্দর্য্যপ্রীতি আমাদের পরম সৌন্দর্য্যের মণিকোঠায় উত্তীর্ণ করে। প্লেটোর অভিমতে, কোন না কোন সময় আকস্মিক ভাবে আমাদের 'সুন্দর'-এর দর্শন মিলবে। "যে ব্যক্তি সৌন্দর্য্যকে যথাযথভাবে পূজা ও উপভোগ করতে পারে; জীবনের শেষে সে সহসা দেখবে এক আশ্চর্য্য সুন্দর রূপ। এই সত্য জগতের ক্ষয় নেই। বিলোপ নেই। এই জগতের ন্যায়নীতি স্থির ও ধ্রুব। এই জগৎ বিস্ময়কর, সম্পূর্ণভাবে, সন্দেহাতীতভাবে, কালাতীতভাবে সুন্দর। জগতের সমস্ত মরণশীল ক্ষণিক সৌন্দর্য্যকে রূপদান করেছে এই সুন্দর। এই পরম প্রেমের জগতে উত্তরণের সোপান হল সৌন্দর্য্যবোধ ও সৌন্দর্য্যপ্রীতি। জগতের অন্যান্য গৌণতর সৌন্দর্য্যের উপভোগ হতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ জন্মায়। তার পরে আসে সমস্ত সুন্দর, কার্য্য ও ন্যায়নীতিতে আস্থা। ন্যায়নীতি হতে পরম সুন্দর পরম ন্যায়বান সত্যস্বরূপের প্রতি আকর্ষণ জন্মায় ও শেষে চরম শ্রেষ্ঠ সত্তাতে উত্তরণ—মানুষের ক্রমোন্নতির এই কটি ধাপ।"[১]

ভাববাদের এই উচ্চ ধারণা নিয়ে দার্শনিক আলোচনা করা চলতো। কিন্তু দর্শনের অঙ্গনে আরেকটি তৃতীয় মতের অস্তিত্ব আছে—এটি হচ্ছে প্রয়োগবাদ, শিক্ষাক্ষেত্রে যার প্রভাব অত্যধিক। এই মতটি কিন্তু আমাদের প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত অনেকগুলি ধারণার যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলে। দর্শন বলতে আমরা বুঝেছি জগতের মূল সত্তার অন্বেষণ করা বা চরম মূল্যের সন্ধান। অদ্বৈতবাদী দার্শনিকরা জগতের সমস্ত বস্তুনিচয়ের মধ্যে ঐক্যের অন্বেষণ করছেন।"[২] এও বলেছি যে শিক্ষা হচ্ছে দর্শনের ব্যবহারিক দিক কেননা দর্শন দ্বারা নির্ব্বাচিত

১। সিম্পোজিয়ম। পৃঃ ২১১

২। জেম্‌স—প্রাগম্যাটিজম্। পৃঃ ১২৯

মূল্যগুলোকে আমরা এমনভাবে (শিক্ষার্থীর) অভিজ্ঞতায় উপস্থিত করতে চাই যাতে সে, সেগুলো সম্বন্ধে শিক্ষা পায়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দর্শনের সেই চিরায়ত, সত্য ও সর্ব্বগ্রাহ্য মূল্য অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ স্থির করা।

প্রয়োগবাদ (Pragmatism) কিন্তু এই মূলতত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে। এই দর্শন মূলতঃ আমেরিকান এবং এর চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমেরিকান জাতির স্বভাব ও ইতিহাস এই দার্শনিক চিন্তাধারায় প্রতিফলিত। নতুন উপনিবেশ স্থাপনের সময় আমেরিকানরা বহু সমস্যার মোকাবিলা করতে বাধ্য হয়েছেন। বহু সমস্যার কোন পূর্ব্বনির্ধারিত সমাধান ছিলনা। সমস্যা সমাধানে প্রাচীন অব্যবহার্য্য ধারণা বাতিল করে নতুন ধারণার সাহায্য নিতে হয়েছে। তাঁদের জীবনের সমস্যা সমাধানের উপযোগী এক নতুন জীবন দর্শন তাঁরা সৃষ্টি করে নিয়েছেন। তাঁদের জীবন কোন পূর্ব্বপরিকল্পিত দর্শন অনুযায়ী চালনা করতে পারেননি। তাঁদের জীবনের ধারণা মূলতঃ পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক। এজন্য তাঁরা জগতের জঙ্গমতা ও পরিবর্ত্তনশীলতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। প্রয়োগবাদীরা কোন স্থির নির্দ্দিষ্ট চিরায়ত মূল্য বা আদর্শে বিশ্বাসী নন। যে কোন প্রকার স্থায়িত্বের প্রতি এদের অনাস্থা। এঁরা মনে করেন বিশ্বের সকল বস্তুই স্থান কাল পাত্র ভেদে পরিবর্তনশীল, আপেক্ষিক। এঁরা তাই আপেক্ষিকতা ও পরিবর্তনশীলতায় বিশ্বাসী। এঁরা বলেন দর্শনকে অবাস্তব সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হতে না দিয়ে জীবনের ও মানুষের দৈনিক সমস্যা সমাধানের কাজে লাগানো উচিত। প্রয়োগবাদ মুখ্যত মানবিক দর্শন (Humanistic)। মানুষ নিজেই নিজের আদর্শ (values) রচনা করে। জগতের অন্তিম সত্যস্বরূপ এখনো প্রকাশিত নয়। তা ক্রম নির্ম্মীয়মান—ক্রমে ক্রমে তার সৃষ্টি হচ্ছে। "ভবিষ্যৎ থেকে তার রূপ সঞ্চয়ন করা হচ্ছে"[১], এবং "অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণে আমাদের সত্যের ধারণা মনুষ্যসৃষ্ট।"[২]

কাজেই প্লেটো বর্ণিত পরম সত্যের মতো এই সত্য অলংঘনীয় বা অপরিবর্ত্তনীয় নয়।

প্রয়োগবাদের একটি মূল তত্ত্ব হল, যার সন্তোষজনক ফল দেখা যাচ্ছে তাই সত্য, এই ধারণা। সত্যতা নির্ভর করে কার্য্যকারিতার উপর। অতএব কার্য্য-কারিতা ও প্রয়োজনীয়তাই হচ্ছে সত্যের বা নীতির মাপকাঠি। কোন মত

১। জেমস্। প্রাগম্যাটিজম্ পৃঃ ২৫৭
২। " " পৃঃ ২৪২

সত্য কিনা সেটা জানবার উপায় হল খতিয়ে দেখা যে সেটা কার্য্যকরী কি না। সেই উপায়েই এটা সত্য কি ভুল ঠিক করা যাবে। যে সমস্ত দর্শন আমরা এ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যা করেছি যেমন জড়বাদ, প্রকৃতিবাদ ও ভাববাদ সেগুলির কার্য্য-কারিতা দেখে সত্য বলে প্রতিপন্ন করা যাবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব হল কোন মত বা যুক্তির সত্যতা "ঘটে থাকে"। অর্থাৎ যখন সন্তোষজনকভাবে কোন মতবাদ কাজে লাগে, তখনই সেটা সত্য "হয়ে ওঠে"। তেমনি অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই হওরার আগে কোন তত্ত্ব বা মতকে সত্য বা ভ্রান্ত বলা চলেনা। তৃতীয়তঃ এই বিপজ্জনক প্রস্তাবটি হল যে যদি কোন বিশ্বাস বা মতবাদ কার্য্যকরী হয় তাহলেই আমরা সেটিকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে গ্রহণ করতে পারবো।

প্রয়োগবাদের প্রবক্তারা সকলেই বাগ্মী ও সুলেখক। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়ম জেম্‌স্ তাঁর বক্তৃতামালা সঙ্কলিত 'প্রয়োগবাদ' গ্রন্থে সুতীক্ষ্ণ যুক্তি এবং উদাহরণ সহযোগে প্রয়োগবাদের প্রচার করেছেন। তাঁর লেখার নামকরণ তিনি করলেন 'নতুন নামে পুরানো চিন্তা'। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫০০ সনেও গ্রীক দার্শনিক হিরাক্লিটাস এই ধরণেরই এক মতবাদ প্রচার করেন। তিনি বলতেন "জগতে সমস্ত কিছুই প্রবহমান, চঞ্চল ও গতিশীল কাজেই একই নদীতে কেউ দুবার অবগাহন করতে পারেনা। নদীর জলধারা নিয়ত প্রবহমান কাজেই প্রথম সেই জলধারায় পদার্পণ করা হয়েছিল তা বয়ে চলে গিয়েছে এবং নতুন জলধারা সেই জায়গা দখল করেছে।"[১] যদি কোন বস্তুই চিরন্তন নয় তবে কেমন করে জ্ঞান লাভ সম্ভব? হিরাক্লিটাসের অনুগামীরা তাদের গুরুর চেয়ে আরো নিষ্ঠাবান 'পরিবর্তনবাদী'। তাঁরা তো বলেন দুবার কেন, একবারও তো কেউ একটি নদীতে নামতে পারেনা। কেননা উর্ম্মিমালা সর্ব্বদাই স্থান পরিবর্তন করছে। হিরাক্লিটাসের মতের মধ্যেই প্রয়োগবাদের পূর্বাভাস দেখা যায়। ইয়োরোপের প্রথম শিক্ষকগোষ্ঠী সফিষ্টদের যদি দার্শনিক বলা যায় তবে তাদেরই সম্ভবত প্রথম প্রয়োগবাদী বলা যাবে। তাঁরা পূর্ব্ববর্তী "দার্শনিকদের পন্থা ও ফলাফল, মানুষের দৈনন্দিন কার্য্যাবলীতে প্রয়োগ করে"[২] কোন চরম সত্য সন্ধানের চেষ্টা না করে, বরঞ্চ তাঁদের ছাত্রদের এমন কুশলতাশিক্ষায় রত হলেন যা তাদের এথেন্সের জনজীবনে কিছু ব্যবহারিক কাজে লাগবে। এর দ্বারা এঁরা সক্রেটিসের বিরক্তি-ভাজন হন কেন না তিনি (শিক্ষায়) সুবিধা ও ব্যবহারিক উপযোগিতার চেয়ে

১। সি. সি. জে. ওয়েব্। হিসট্রি অব ফিলসফি পৃ: ১৬
২। ডিউই। ডেমোক্রেসী অ্যাণ্ড এড্‌কেশন। পৃ: ৩৮৫

চিরন্তন মূল্য ও আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু প্রয়োগবাদ অনেক দার্শনিক সমস্যার সুবিন্যস্ত, সুউপস্থাপিত উত্তর দিয়েছে। জেমসের ভাষায় শুনি "কোন ধারণা ও বিশ্বাসকে সত্যি বলে ধরে নিলে, এইটি দেখা দরকার যে সেটি সত্য হলে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কি পার্থক্য ঘটে? সেই সত্যিকে কেমন করে রূপায়িত করা যাবে? আর মতটি যদি ভ্রান্ত হয় তবেই বা অভিজ্ঞতায় কি রকম বৈষম্য দেখা যাবে? সংক্ষেপে বলা যায়, অভিজ্ঞতার মাপকাঠিতে সেই সত্য (মত)টির নগদমূল্য কতটুকু?"[১]

যে সমস্ত ধারণাকে আমরা সংগ্রহ, যাচাই, মিলিয়ে দেখতে ও সত্যতা বিচার করতে পারি সেগুলি হচ্ছে সত্য ধারণা। ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে কিন্তু তেমনি করে যাচাই করতে পারিনা। ধারণা সত্য 'হয়ে ওঠে', বা সত্য বলে 'দৃষ্ট হয়' ঘটনার দ্বারা। বস্তুতঃ এর 'সত্যতা' হচ্ছে ঘটনা বা প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার নাম, যাচাই করা, এটাকেই বলে সত্যতা প্রতিষ্ঠা (veri-fication)। এর গ্রহণযোগ্যতা (validation) হচ্ছে এই সত্যতা ঘটানো বা যাচাই করে নেওয়া প্রক্রিয়ার দ্বারা।[২] অতএব স্বাস্থ্য, অর্থ, শক্তি যেমন জীবনের নানা প্রক্রিয়ার নাম, তেমনি সত্য হচ্ছে যাচাই করে নেওয়ার সাধারণ নাম। এবং যেমন ভাবে অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলো কাজে লাগে বলে লোকে পাওয়ার চেষ্টা করে, তেমনি সত্যকে লোকে অন্বেষণ করবে তার 'কাজে লাগার' ক্ষমতার জন্য। যেমন ভাবে জীবন পথে অভিজ্ঞতার দ্বারা মানুষ স্বাস্থ্য, ধন বা ক্ষমতা অর্জন করে তেমনি ভাবে সত্যও অর্জন করবে।[৩] অতএব সংক্ষেপে বলা যায় আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে যা 'সুবিধাজনক' তাই হচ্ছে সত্য। যেমন আমাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে যা 'সুবিধাজনক' তাই হচ্ছে 'শুভ' (right)। 'সুবিধাজনক' যে কোন অর্থে, এবং 'সুবিধাজনক' দূর ভবিষ্যতেও। কেন না কতগুলি ধারণা আপাত দৃষ্টিতে 'কাজের' বা 'সুবিধাজনক' হলেও ভবিষ্যতে তেমন 'কাজের' নাও হতে পারে।'[৪]

ঠিক এরকম ভাবে আরেকজন খ্যাতনামা দার্শনিক ডিউই শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদের প্রচার করলেন যে দর্শন যদি শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে তবেই সেই দর্শন সার্থক।

১। প্র্যাগম্যাটিজম্—জেম্‌স, পৃঃ ২০৩।
২। প্র্যাগম্যাটিজম্—জেম্‌স, পৃঃ ২০১
৩। " " পৃঃ ২১৮
৪। " " পৃঃ ২২২

"সামাজিক জীবনের নানা রকম অসুবিধা ও সংঘর্ষ হতে সমস্যার সৃষ্টি হয়। সমস্যাগুলি মন ও বস্তু, শরীরও আত্মা, তত্ত্ব ও কার্য্য ইত্যাদির সম্বন্ধে সৃষ্ট।"[১]

কাজেই যদিও তিনি দর্শনের চিরন্তন বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করেছেন। তাকে শিক্ষার সমস্যা সমাধানের কাজে লাগাতে চেয়েছেন। "যখনই দর্শনকে গভীর ভাবে গ্রহণ করা হয়েছে তখন কোন জ্ঞানপূর্ণ তত্ত্ব বা ধারণা দিয়ে জীবনসমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হয়েছে। একদিক দিয়ে দেখলে সমস্ত প্রাচীন দর্শনতত্ত্বই এক একটি সুসংগঠিত জীবন ধারার পরিকল্পনা দিয়েছে এবং যাঁরাই সেই দর্শন গ্রহণ করেছেন, এক বিশেষ ধরণে নিজেদের আচার আচরণ পরিচালনা করেছেন। মধ্য যুগে রোমান ধর্ম্মীয় মঠগুলোর সঙ্গে দর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লক্ষ্য করলে দেখি কি ভাবে দর্শনের সঙ্গে ধর্ম্মীয় স্বার্থ, সামাজিক সঙ্কট ও রাজনৈতিক সংঘাত যুক্ত হয়ে গিয়েছিল।"[২]

অতএব দর্শন অর্থ জীবনের নানা অবস্থায় কি করা যায় এই চিন্তা। যখন সমস্যার কারণ ঘটে, তখনই দর্শনের উদ্ভব। এদিক দিয়ে দেখলে, দর্শনকে চরম সত্তার অপ্রয়োজনীয় আলোচনা বা সন্ধান না বলে, প্রয়োগবাদীরা তাকে সচেতন ও উদ্দেশ্যযুক্ত ভাবে জীবনের সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করতে চেয়েছেন। অত্যধিক চিন্তনের প্রতি প্রয়োগবাদীদের বিরাগ লক্ষ্যণীয়। এঁরা বরঞ্চ মানব মনের সৃষ্টিশীলতা ও কর্মশীলতার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই বিষয়ে তাঁরা আধুনিক মনঃস্তত্ত্বের সমর্থন পেয়েছেন। এই সময় মনোবিজ্ঞান দর্শন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের মনের প্রকৃতি বিষয়ে দুরূহ প্রশ্নের সমাধান না খুঁজে মানুষের আচরণ পর্য্যবেক্ষণ শুরু করে। সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারবাদী মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইকের মনোবিজ্ঞানতত্ত্ব আমেরিকান প্রয়োগবাদকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। তিনি শেখান যে মানসিক প্রক্রিয়া হচ্ছে কোন উদ্দীপকের সংস্পর্শে এলে সমতা রক্ষার চেষ্টা। মানুষ তার পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতি বিধান করে ও উদ্দীপকে সাড়া দিয়ে, বাড়ে। তার বেড়ে উঠা নির্ভর করছে তার পরিবেশের সঙ্গে সার্থক আদানপ্রদানের ওপর। 'যেই সাড়াগুলি সামঞ্জস্য বিধানে সার্থক হয়, সেই সাড়া দিতে সে উৎসাহিত হয় এবং যে সাড়াগুলো অসফল হয় সেই সাড়া দিতে তেমনি নিরুৎসাহিত হয়। সফল 'সাড়া' গুলো ক্রমে অভ্যস্ত হয়ে যায় কেন না সার্থকতাই সার্থকতার

১। ডিউই: ডেমোক্রেসী অ্যাণ্ড এডুকেশন। পৃঃ ৩৭৮

২। ডিউই: ডেমোক্রেসী অ্যাণ্ড এডুকেশন। পৃঃ ৩৭৮—৩৭৯

সবচেয়ে বড় উপায়। যে সাড়াগুলো 'অসার্থক' সেগুলির পুনরাবৃত্তি হয় না। মন তখনই চিন্তা করে, যখন কোন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। সমস্যা না থাকলে, চিন্তাও হয় না। সমস্যাহীন জীবনযাত্রায় মন অনেকটা যান্ত্রিক ভাবে কাজ করে। যে চিন্তন কোন সমস্যা সমাধানে সক্ষম, সেই চিন্তনই নির্ভুল। এই সংজ্ঞা অনুযায়ী কোহলারের শিম্পাঞ্জীরা সার্থক চিন্তনে সক্ষম। এই ধরণের মনঃস্তাত্ত্বিক মতবাদ মানুষের জৈব সত্তাতে বিশ্বাসী ও মানব মন জান্তব মনেরই ক্রমান্বিত প্রকাশ বলে মনে করে। ব্যবহারবাদীদের এই ধারণা যে, সব চিন্তনই সামঞ্জস্য সাধনের হাতিয়ারস্বরূপ এবং সৃষ্টির বিবর্তনে কোন একসময় জীবনের সমস্যা মেটানোর প্রয়োজন নির্বস্তুক চিন্তনের ক্ষমতা উদ্ভূত হয়েছে, প্রয়োগবাদীদের মতের সঙ্গে মিলে যায়। তবে ব্যবহারবাদের আরেকটি মূল বিশ্বাস যে পরিবেশ অপরিবর্তনীয়। এইটি অবশ্য প্রয়োগবাদী দর্শনের কাজে আসবে না কেননা প্রয়োগবাদের একটি মূল ধারণা হচ্ছে মানুষ তার প্রয়োজন মত পরিবেশকে পরিবর্তন করতে পারার ক্ষমতা রাখে এবং নিজের সমস্যা দূর করে সুখকর ও সুন্দরতর পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে।

প্রয়োগবাদের মত সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করলেও জীবন ও শিক্ষার ক্ষেত্রে এই মতবাদের মূল্য অস্বীকার করা একেবারেই উচিত হবে না। প্রয়োগবাদের কয়েকটি মূলতত্ত্ব বিশদ করা যাক্।

অভিজ্ঞতার সন্তোষজনক ফল হচ্ছে সত্যের মাপকাঠি। সন্তোষজনক ফল বলতে প্রয়োগবাদীরা সুখকর অভিজ্ঞতা বোঝান না এবং একজন মাত্র ব্যক্তির অভিজ্ঞতাও এটা নয়। এই সংযোজনটুকু করা হয়েছে এই জন্য যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সত্য এই সিদ্ধান্তে আমরা যেন না উপনীত হই। জেম্‌স্‌ নিজেও এমনি সত্যের বহুমাত্রিক (pluralistic) ধারণায় বিশ্বাসী নন। তিনি নিজের মতকে জোরদার করার জন্য বল্লেন যে সন্তোষজনক কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা, 'সর্ব্বঅবস্থাতেই' কার্যকরী হওয়া দরকার, অতএব 'সত্য' নিয়ত পরিবর্তনশীল নয়। সত্যকে যে কোন অবস্থাতে যাচাই করলে দেখা যাবে তা কার্য্যকরী ও ও সন্তোষজনক। চিন্তার জগতেও এটা সত্য। এতদিন পর্য্যন্ত আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে আমাদের সীমিত চিন্তনের বাইরে কোন প্রকৃত জগৎ আছে যার সঙ্গে আমাদের চিন্তার পূর্ণ সামঞ্জস্য হলেই আমাদের চিন্তাকে সত্য বলে ধরতে পারি। কিন্তু চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য হল কিনা তা বোঝবার কোন উপায় নেই। প্রয়োগবাদীরা সেই সামঞ্জস্য রক্ষা হচ্ছে কিনা তা বোঝার একটা মানদণ্ড দিলেন,

কার্য্যকারীতা। আমাদের চিন্তন দিয়ে সফলভাবে যদি আমাদের সমস্যা মোচন হয় তা হলে সেই চিন্তাকে সত্য বলে ধরতে পারি। এর ফলে অবাস্তব ধারণা মতবাদ ইত্যাদিগুলোকে পরীক্ষা করার বা গ্রহণ করার একটা উপায় হল। বস্তুত এ ছাড়া অন্য কোন ভাবে তত্ত্ব বা মতকে যাচাই করবার উপায় নেই। সুতরাং জেমস বল্লেন এটি সত্য এবং সেই জন্যই এটি উপযোগী, অথবা এটি উপযোগী বলেই সত্য দুভাবেই এ কথাটা আমরা বলতে পারি। দুটি বাক্যেরই অর্থ এক, এবং ধারণাকে যাচাই করা চলে।

অবশ্য প্রয়োগবাদীদের একটি ধারণার সত্য "হয়ে ওঠা," অথবা ঘটনার দ্বারা তাকে সত্য 'বানানো', তত্ত্বটা ভাববাদীদের 'সত্যে'র ধারণার সঙ্গে মেলে না। ভাববাদীরা মনে করেন এক বিষয়ী নিরপেক্ষ সত্য (objective reality) আছে, যাকে জানা যায় এবং তার সঙ্গে চিন্তনের সঠিক মিল হলেই চিন্তনটিকে সত্য বলতে পারি। ভাববাদীদের বিশ্বাস যে তাঁদের চিন্তা যদি বিষয়ীনিরপেক্ষ সত্তার সঙ্গে মেলে তবেই তা সত্য, না মিল্লে ভ্রান্ত। তা হতে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে সত্য পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট। ঘটনার পরিবর্তনে এর পরিবর্তন হয় না। প্রমাণ? নেপচুন গ্রহকে জ্যোতির্বিজ্ঞানী জানতে পারেন বহু পরে। কিন্তু তার অস্তিত্ব সেই জানার আগেই ছিল। অ্যাডাম বা লা ভেরিয়ার যখন অঙ্ক কষে এর অস্তিত্ব প্রমাণ করেন তারও আগে থেকেই তো এই গ্রহটি আছে। বাস্তবিক অঙ্ক করতে বসার আগে এঁরা অনুমান করেছিলেন যে ইউরেনিয়াস গ্রহের বাইরেও আরেকটি গ্রহ আছে। সুতরাং তাঁদের চিন্তার আগেই গ্রহটি উপস্থিত। সত্য মানুষের অনুমান ও ধারণার পূর্বাহ্নেই আছে। অবশ্য প্রয়োগবাদীরা বলবেন ধারণা মানুষের দ্বারা 'সৃষ্টি করা'র আগে নিশ্চয় উপস্থিত ছিল না কাজেই তখন সেটি সত্য কি ভ্রান্ত, কিছুই ছিল না। কিন্তু ভাববাদীরা বলবেন ধারণা সৃষ্টি করা হক বা না হক, যেহেতু যার সম্বন্ধে ধারণা সেরকম একটি বস্তুর, ধারণা-নিরপেক্ষভাবে, অস্তিত্ব ছিল, ধারণাটা সৃষ্ট হতেও পারতো। কাজেই এই দুই দলের মধ্যে মত বিরোধ এখানে দেখা যায়।

তার উপর যেহেতু কোন বিশ্বাস কার্য্যকরী হল অমনি সেটাকে ব্যবহার করার আমাদের নীতিগত অধিকার জন্মে গেল, এমন বলাটা হবে যুক্তি বর্জ্জন করে 'সুবিধাবাদের' আশ্রয় নেওয়া। বস্তুতঃ আমরা যাচাই করেছি কি? না, বিশ্বাসটিকে ব্যবহার করে আমাদের বেশ সন্তোষজনক ফল পেয়েছি। তাই বলে সেটা সত্য কি ভ্রান্ত সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তো রয়েই গেল।

প্রয়োগবাদীরা কোন নির্দ্দিষ্ট আদর্শ বা মূল্যে বিশ্বাসী নন বলে কোন লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করতে পারেন নি। অথচ আমেরিকান প্রয়োগবাদীরা একথা বলেছেন যে শিক্ষা ক্রমে ক্রমে সুন্দরতর সুষ্ঠুতর সামঞ্জস্যপূর্ণ সভ্যতার সৃষ্টি করবে। এই দুই মতের মধ্যে স্ববিরোধ লক্ষ্যণীয়। কি মাপকাঠি দিয়ে সভ্যতার অগ্রগতি বোঝা যাবে? উন্নততর সভ্যতা বলার সঙ্গে দেখা যায় প্রয়োগবাদীরা সভ্যতা সম্বন্ধে একটা বিশেষ আদর্শ মেনে নিচ্ছেন। তবে প্রয়োগবাদীরা বলেছেন সভ্যতার উন্নততর, সুষ্ঠুতর কি রূপ হবে তা এখন বলা যায় না। এইটুকু বলা যায় যে, সে সভ্যতা বর্তমান সভ্যতার চেয়ে সুষম হবে এবং মানুষও উন্নততর সুখী জীবন যাপন করবে। কিন্তু সেই উন্নততর সভ্যতা রচনা করার জন্য নিশ্চয়ই কিছু লক্ষ্য, আদর্শ, মূল্য অস্পষ্টভাবে হলেও ধারণায় থাকা দরকার। তাছাড়া কোন দিক্ লক্ষ্য করে আমরা প্রচেষ্টা করবো? প্রয়োগবাদে এই 'দিকে'র (direction) উদ্দেশ মেলে না। বস্তুতঃ প্রয়োগবাদীদের মধ্যে যেন মূল্যবোধ অন্তর্নিহিতভাবে উপস্থিত।

কেউ কেউ অবশ্য বলেন "প্রয়োগবাদীরা পথ ও লক্ষ্যের মধ্যে একটা বিচিত্র জগাখিচুড়ী তৈরী করেছেন।"[১] উইলিয়ম জেম্‌স্ সম্বন্ধে একটু মন্তব্য খাটেনা কেন না তাঁর চিন্তনের মধ্যে কিছুমাত্র বিভ্রান্তি নেই। একথাও স্বীকার করতেই হবে যে প্রয়োগবাদী চিন্তার মধ্যে আশ্চর্য্য স্বচ্ছতা ও দার্শনিক প্রশ্নের উত্তরে এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়। একে পূর্ণাঙ্গ দর্শন না বলে দর্শন সম্বন্ধে চিন্তা বা দৃষ্টিভঙ্গী বল্‌লে বোধ করি অন্যায় হয় না। এর বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে উইলিয়ম জেম্‌স্ বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি মানুষের জীবনে ব্যবহার করে প্রয়োগবাদকে দর্শনের স্তরে উত্তীর্ণ করেন। অবশ্য দর্শন অর্থ যদি বিষয়ী-নিরপেক্ষ সত্তা বা বস্তুর প্রকৃত সত্তা সম্বন্ধে নিরাসক্ত আলোচনা হয় তবে হয়তো প্রয়োগবাদকে দর্শন বলা চলবে না কেন না প্রয়োগবাদ নিজেকে ব্যপৃত রেখেছে বস্তুরা কি প্রক্রিয়ায় কাজ করে বা ঘটে তাই নিয়ে। বস্তুজগতে আবদ্ধ থেকেও মানুষ কতগুলি গভীর তত্ত্ব ও প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে চায়— এক পরম সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে ও তাঁর সঙ্গে নিজের জীবনের অর্থপূর্ণ যোগ আছে এমন ভরসা রাখে। প্রয়োগবাদ কিন্তু এসব আলোচনা নিতান্ত নিষ্ফল মনে করে। এই জন্য দার্শনিকদের দরবারে প্রয়োগবাদ সমাদৃত নয়।

প্রয়োগবাদ মূলতঃ মধ্যপন্থা অবলম্বী। উগ্র ভাববাদ ও চরম স্বভাববাদ,

---

১। উইজেলব্যান্ড্—দ্য ওয়ার্ল্ড্ এ্যাণ্ড ইট্স্ মীনীং পৃঃ ৩৯৭

দুই দল দ্বারাই প্রয়োগবাদের কিছু কিছু অংশ গ্রহণযোগ্য। তবে ভাববাদ ও স্বভাববাদের মধ্যে ভাববাদের সঙ্গে এর আত্মীয়তা নিবিড়তর। তবে সত্য ও মূল্য মনুষ্যনির্ম্মিত ও সার্থক কর্ম ও পরীক্ষার দ্বারা এদের উদ্ভব হয় এই ধারণার সঙ্গে, গতিশীল ভাববাদের (dynamic idealism) কিছুটা নৈকট্য দেখা যায়। তবে প্লেটোর স্থাবর ভাববাদের সঙ্গে এর সম্পূর্ণ বিরোধ। কেননা প্লেটোর ভাববাদ বলে আদর্শ মূল্য ইত্যাদি অনড় ও পূর্ব নির্দ্দিষ্ট বিশ্বের সত্তায় চিরন্তন-ভাবে তারা প্রতিষ্ঠিত। অতএব মানুষের দ্বারা তারা কখনো 'তৈরী হতে' পারেনা বরঞ্চ মানুষ তাদের আবিষ্কার করতে পারে। এই কট্টর ভাববাদ অনুসারে প্রয়োগবাদ একটি অসম্পূর্ণ মতবাদ।

রস্ গোড়াতেই নিজের মত ও দৃষ্টিভঙ্গী পাঠককে জানিয়েছেন যে তিনি ভাববাদে বিশ্বাসী। তিনি মনে করেন স্বভাববাদ (naturalism) অসম্পূর্ণ। অন্ততঃ মানুষের প্রকৃত সত্তার পরিচয় দেওয়ার জন্য স্বভাববাদ যথেষ্ট নয়। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বভাববাদের অবদান যথেষ্ট। এবং প্রয়োগবাদের বহু সম্ভাবনা সত্বেও তিনি মনে করেন মানুষের মনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও গভীর অন্বেষার ক্ষেত্রে এঁরা যে নেতিবাচক ভূমিকা নেয়, তা ঠিক নয়। মানুষ বিশ্বের স্বরূপ ও সত্তা সম্বন্ধে কৌতূহলী। প্রয়োগবাদ এ বিষয়ে কোন আলোকপাত করতে পারে না। তবে শিক্ষাবিদ্‌রা প্রয়োগবাদ হতে ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে বা প্রয়োগের ব্যবহারে বহু মূল্যবান শিক্ষা পেতে পারেন। মোটামুটি ভাবে রস্ বিশ্বাস করেন ভাববাদই মৌলিক দর্শন। অন্যান্য দর্শনগুলি (স্বভাববাদ কি প্রয়োগবাদ) শিক্ষার পদ্ধতির ক্ষেত্রে কিছু কিছু সাহায্য করেছে বটে কিন্তু শিক্ষার লক্ষ্য ও আদর্শ নির্ধারণে ভাববাদেরই সাহায্য নিতে হয়। এমন কি প্রয়োগ-বাদীরাও বর্তমান কালের মূল্যহীনতা ও অস্থিরতার যুগে যখন মূল্যের জন্য মানুষের আকুতি ক্রমবর্দ্ধমান, তখন ভাববাদের আশ্রয় নেওয়ায় সমর্থন জানাবে। কেন না একমাত্র ভাববাদের স্থির নিশ্চিত আদর্শ এই বিভ্রান্তির যুগে উদ্ধারের পথ দেখাতে সমর্থ। আর প্রয়োগবাদও তো কার্য্যকারিতায় বিশ্বাসী।

অতিরিক্ত পাঠসূচী

কানিংহাম। প্রবলেম্‌স্ অব ফিলসফি
ডিউই। ডেমোক্রেসী অ্যাণ্ড এডুকেশন চ্যাপ্টার XXIV

ড্রেক। ইনভিটেশন টু ফিলসফি।
এডিংটন। স্পেশ, টাইম অ্যাণ্ড গ্র্যাভিটেশন।
হৰ্ফডিংটন। আউটলাইনস্ অব সাইকোলজি। চ্যাপ্টার II
জেম্‌স্। প্র্যাগম্যাটিজ্‌ম্।
জীন্‌স্। দ্য মিসটিরিয়াস ইউনিভারস্।
জোড। রিটার্ন টু ফিলসফি। রিভিয়্যু অব ফিলসফি।
প্যাট্রিক। দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাণ্ড ইটস্ মীনীং।
রাস্ক। দি ফিলসফিক্যাল বেসিস অব এডুকেশন। চ্যাপ্টার II
রাসেল। প্রবলেম্‌স অব ফিলসফি।
শ। ব্যাক টু মেথুশেলা।
ওয়েব। হিষ্ট্রি অব ফিলসফি।

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষায় স্বভাববাদ

প্রথম কটি অধ্যায়ে আমরা বলেছি ও উদাহরণ দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছি যে শিক্ষার বিভিন্ন তত্ত্ব ও বিভিন্ন রূপ নানা প্রকার দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হতে উদ্ভূত। এই অধ্যায় ও পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে সেই কথাটি, স্বভাববাদ, ভাববাদ ও প্রয়োগবাদ এই তিনটি দার্শনিক মতবাদকে উদাহরণ সহকারে বিশদ করার চেষ্টা করবো। অবশ্য এই তিনটি মতবাদ মূলতঃ জীবন সম্বন্ধে সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী, কাজেই এদের সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গতি একেবারে নিখুঁৎ নয়। মোটামুটিভাবে কিছুটা ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। একথাটা প্রথম থেকে বুঝে নেওয়া ভাল যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থাই তার সমস্ত খুঁটিনাটি পরিকল্পনা স্থির করার জন্য কোন বিশেষ দর্শনকে অবিকল অনুসরণ করে না। দর্শন ও শিক্ষার মধ্যে একটা সাধারণ সমান্তরাল ধারা দেখা যায়। বেশীর ভাগ শিক্ষাব্যবস্থা একাধিক দর্শন হতে প্রাণরস আহরণ করে থাকে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী সমন্বয়বাদী (eclectic)। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। অ্যাডাম্‌স্ রুশোকে শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্বভাববাদী বলেছেন অথচ রাস্ক তার নিজের বইতে রুশোকে ভাববাদী বলে অভিহিত করেছেন। রুশো যদিও স্বভাববাদের মুখ্য মুখপাত্র ও 'প্রকৃতি'কে সবচেয়ে ওপরে স্থান দিয়েছেন কিন্তু এই প্রকৃতি ঠিক আদর্শের বা আধ্যাত্মিকতার বিপরীত নয় বরঞ্চ বলা যায় সামাজিক বাধ্যবাধকতামূলক নিয়মনীতির বিরুদ্ধে। রুশো তাঁর ছাত্রকে প্রকৃতির মধ্যে রেখেছেন যাতে তার নৈতিক নান্দনিক ও ধর্মীয় প্রস্তুতি চলে তাই, যদিও শিক্ষার প্রথমাংশে রুশোর শিক্ষা পদ্ধতি নিশ্চিতভাবে স্বভাববাদী, তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য কিন্তু আদর্শবাদী বা ভাববাদী। এই উদাহরণ হতে এটা স্পষ্ট যে কোন বিশেষ দর্শনের ছাপে কোন শিক্ষা ব্যবস্থাকে অভিহিত করা যায়না।

স্বভাববাদের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে যে দর্শনটি এই নামে অভিহিত তার কয়েকটা প্রধান দিকের কথা স্মরণ করে নিলে ভাল হয়। প্রথমে পদার্থবিজ্ঞানাশ্রয়ী স্বভাববাদকে দেখেছি যার দৃষ্টি সম্পূর্ণভাবে বহির্জগতের প্রতি নিবদ্ধ থাকায়, মানুষের নিজের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে অসুবিধায় পড়েছে।

স্বভাববাদের এই রূপ, জগৎ সম্বন্ধে এমন এক ধারণা নিয়েছে যাতে করে মানুষকে একেবারে পশ্চাতে গৌণ করে রাখা হয়েছে। কাজেই, শিক্ষা, যা বিশেষ করে মানুষী ক্রিয়াকলাপ, তার সম্বন্ধে কোন বক্তব্য এই স্বভাববাদ থেকে আমরা পাইনা। দ্বিতীয় ধরণের স্বভাববাদ যন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। এরা মনে করেন মানুষ যন্ত্রবৎ এবং শিক্ষায় এই মতের অবদান একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়। আগেই আমরা দেখেছি এই মত থেকে আমরা ব্যবহারবাদী মনোবিজ্ঞানের ধারণা পেয়েছি। অবশ্য তৃতীয় প্রকার স্বভাববাদের তুলনায় এদের অবদান সামান্য। তৃতীয় স্বভাববাদের মূল তত্ত্ব বিবর্তনবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। একে জৈবিক স্বভাববাদ (Biological Naturalism) বলা যায়। জীবজগতে মানবেতর জীব ও মানুষের বিবর্তনের মধ্যে ছেদ নেই বলে বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে স্বভাববাদের গভীর আস্থা। প্রকৃতির বক্ষে একসময় স্বাভাবিক বন্য মানুষ লালিত হয়েছে। মানুষের প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষের থেকে পাওয়া বন্য প্রাকৃতিক স্বভাবের উপর, স্বভাববাদ গুরুত্ব অর্পণ করে। তার আধ্যাত্মিক স্বভাবকে অগ্রাহ্য ও তুচ্ছ জ্ঞান করে। এঁরা বিশ্বাস করেন জৈবিক শরীরই মানুষের সবচেয়ে বড় পরিচয়। মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। মানুষের সহজাত সংস্কার, প্রাথমিক আবেগ, অসংস্কৃত বিচার ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে যে মনুষ্য-প্রকৃতি তা মানুষের সব কাজের নিয়ন্তা। মানুষের পরিশীলিত বিচারবোধ বা সমাজের মিলিত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় দিয়ে মানুষের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় না। সুতরাং মানুষের পক্ষে সমাজের আচার ব্যবহার বা রীতিনীতি শিক্ষা করার দরকার নেই। বরঞ্চ সেটা হবে ক্ষতিকর। তাই রুশোর মতে, "শিশুকে শুধু একটাই অভ্যাস করানো দরকার যে সে যেন কোন (সামাজিক) অভ্যাসের দাস না হয়।"[১]

অ্যাডামসের মতে স্বভাববাদ অর্থ এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা যেখানে বই পুস্তক বা বিদ্যালয়, পাঠক্রম ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল না হয়ে শিক্ষা শিক্ষার্থীর নিজস্ব জীবনধারার ওপর কেন্দ্রায়িত। এই মতবাদ সমস্ত প্রকার পুঁথিগত শিক্ষার বিরোধী। শিক্ষার্থীর জীবন হতে উপকরণ নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে। বই পুস্তকের সম্বন্ধে এদের ভয়ানক অবিশ্বাস। এঁরা মনে করেন শিশুর জন্য এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে তার স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব। যুদ্ধোত্তর ইউরোপে (১৯১৪-১৮) যখনই শিক্ষাপদ্ধতি প্রাচীন ধারণার আবর্জনায় বদ্ধাশয়

১। এমিল। রুশো পৃঃ ৩০।

তখনই স্বভাববাদের ঢেউ এসে অচলায়তনকে নাড়া দিয়েছে তাই শিক্ষার ইতিহাসে এই দর্শনের ভূমিকা বিদ্রোহীর। এরা সহজ উপকরণহীন সরল শিক্ষাব্যবস্থার সপক্ষে। এদের দৃপ্ত ঘোষণা 'প্রকৃতির কোলে ফিরে যাও' এবং এদের মুখ্য বিশেষণ 'সহজিয়া'।

ইতিহাস থেকে নজীর দেখাই। নবজাগরণের কালে মানববাদ (Renaissance Humanism) আশ্রিত শিক্ষাতত্ত্ব ক্রমে অন্তঃসারশূন্য শুষ্ক পাণ্ডিত্যের মধ্যে লুপ্ত হয়েছিল। তার প্রতিবাদ স্বরূপ স্বভাববাদ আত্মপ্রকাশ করে। মানববাদও মধ্যযুগের চুলচেরা পাণ্ডিত্যের প্রতি অশ্রদ্ধা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। সেইজন্য মানুষ তার আশা আকাঙ্খা, কামনা হাসি কান্না এগুলিকে বোঝার জন্য গ্রীক সাহিত্যের মহৎ চরিত্রগুলো পড়তে আরম্ভ করে। কিন্তু গোড়ায় উদ্দেশ্য মহৎ হলেও পরের দিকে এই সাহিত্য পাঠ মানুষকে বোঝার মহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ না করে নিতান্ত শুষ্ক নীরস ব্যাকরণের চর্চায় পর্য্যবসিত হয়। অর্থহীন সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তখন একবার স্বভাববাদের আন্দোলন আলোড়িত হয়ে ওঠে। তেমনি উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষাবিদ্‌রা যে সার্ব্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের আদর্শে উদ্বোধিত হয়েছিলেন, কালের প্রভাবে যখন বিদ্যালয়গুলি সেই আদর্শ হারিয়ে একধরণের অন্তঃসারশূন্য বিদ্যাবিক্রয় বিপণী হয়ে দাঁড়ায়, তখন প্রথম মহাযুদ্ধের পর আরেকবার শিক্ষার লক্ষ্য পদ্ধতি, পাঠক্রম ইত্যাদিকে সম্পূর্ণ সংস্কার করবার স্বভাববাদী প্রয়োজন অনুভূত হয়।

রুশোর চরিত্রের মধ্যে স্বভাববাদের প্রতিবাদী বৈশিষ্ট্য বিধৃত। এই কারণেই সম্ভবতঃ তাঁর শিক্ষাদর্শন ভাববাদের আদর্শে রঞ্জিত হলেও তাঁকে প্রধানত স্বভাববাদের হোতা বলে ব্যাখ্যা করা হয়। জেনেভায় ১৭১২ সালে তাঁর জন্ম। তাঁর চরিত্র ও জীবনী বিশেষ বর্ণময়। সমস্ত প্রচলিত রীতিনীতি ও সংস্কার প্রতি তাঁর তীব্র বিরাগ, তাঁর বিখ্যাত বই এমিলে তাঁর বিদ্রোহের রূপ স্পষ্ট। এ রূপটি অতি প্রকট যখন তিনি বল্লেন "চলতি সমস্ত প্রথাকে উল্টে দিলেই সঠিক পথে চলা সম্ভব (Reverse the usual practice and you will almost always do right)"। আরো বল্লেন "মানুষ রচিত সংস্থাগুলো মূঢ়তা ও স্ববিরোধের জলন্ত নিদর্শন।" অথবা "নগর মানুষকে নিষ্পেষণ করে ফেলছে।" অতএব তাঁর কাল্পনিক ছাত্র এমিল (তাঁর 'এমিল' শিক্ষাগ্রন্থের নায়ক)কে তার বাবা মা হতে, নগর, বিদ্যালয় হতে দূরে সরিয়ে প্রকৃতির বক্ষে নিয়ে এসে শিক্ষা দিতে হবে। সেখানে 'স্বাভাবিক নিয়মে' দরদী আদর্শ শিক্ষক তাঁকে শিক্ষা দান করবেন।

"ঈশ্বর রচিত সমস্ত সৃষ্টি পবিত্র। মানুষ তাতে হস্তক্ষেপ করে সমস্ত কিছুকে কলুষিত করছে। সুতরাং আমাদের বেছে নিতে হবে যথার্থ মানুষ ও নাগরিক-দের মধ্যে একটিকে। দুয়ের সমন্বয় হতে পারে না। নাগরিকদের সৎ মানুষ হওয়ার সামর্থ্য নেই।" নাগরিক বলতে রুশো দুর্নীতিপরায়ণ ভণ্ড মানুষ বুঝিয়েছেন।

রুশোর আন্তরিকতায় অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কেউ কেউ শিক্ষাবিদ্ হিসাবে তাঁর মহত্ত্বে আস্থা রাখেন নি। ভলটেয়ার তো পরিস্কারই বল্লেন যে রুশোর ব্যক্তিত্ব আগাগোড়া কৃত্রিম। কিন্তু নেপোলিয়ন ঘোষণা করলেন যে রুশো ছাড়া ফরাসীবিপ্লব ঘটতো না। বহু লোকের চিন্তাধারাকে রুশো বিপর্য্যস্ত করেছেন কিন্তু সক্রেটিস যেমন তাঁর সমসাময়িক নগরবাসীদের মনে নবীন চিন্তাধারার উদ্রেক করেন ঠিক তেমনি রুশোও জনগনকে নতুন চিন্তাধারায় উদ্‌বুদ্ধ করেছেন। যদি ফল দিয়ে বিচার করতে হয় তবে রুশোর মহত্ত্ব অনস্বীকার্য্য কেন না 'এমিল' বা রুশোর শিক্ষাগ্রন্থ শিক্ষা-জগতে আমূল পরিবর্তন এনেছে। শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাধারাকে উদ্দীপ্ত করায় ও পথনির্দ্দেশে এমিলের প্রভাব, প্লেটোর রিপাবলিকের সঙ্গে তুলনীয়। রুশোর নিজের মতে রিপাবলিক শিক্ষাজগতের এক অতুলনীয় পুস্তক। কিন্তু শিক্ষা-বিষয়ে, শুধু শিক্ষায় কেন সাহিত্যেও যে 'এমিল' অদ্ভুত ফলপ্রসবিনী তাতে সন্দেহ নেই। রুশো এক নতুন পথের পথিকৃৎ যে পথে অনেকেই তাঁর ঋণ সচেতন-ভাবে না জেনে এবং স্বীকার না করেই অগ্রসর হয়েছে। অবশেষে তাঁর প্রদর্শিত পথটি প্রশস্ত রাজপথের মর্য্যাদা লাভ করেছে।[১] অবশ্য একথা সত্য যে শিক্ষা-বিষয়ে যে নবজাগরণ তিনি সুরু করেছিলেন সে আলোড়ন আজও জীবন্ত। তিনি ভাববাদী কি স্বভাববাদী সেটা নির্ণয় করা সম্ভবতঃ এই জন্যই এত কঠিন কেন না তাঁর রচনা বিপুল ও বিচিত্র ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ। শিক্ষার লক্ষ্য বিচার করে রুশোকে যদি স্বভাববাদী না বলে ভাববাদী বলি তবে স্বভাববাদী দর্শনের কি কোন বিশিষ্ট লক্ষ্য নেই? যান্ত্রিক স্বভাববাদের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি মাত্র লক্ষ্য দৃষ্টিগোচর হয়। মানুষ একটি যন্ত্র বিশেষ এবং সেই যন্ত্রটিকে যথাসাধ্য ভালভাবে দেখাশোনা করে এর দ্বারা ক্রমেই জটিল হতে জটিলতর কাজ আদায় করার চেষ্টা, এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। ব্যবহারবাদী মনঃস্তাত্ত্বিকদের দিক দিয়ে দেখলে উদ্দীপক দিয়ে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে যান্ত্রিক সংবেদন (conditioned reflex) ও চিন্তন ও কর্মের বর্তমান যুগোপযোগী অভ্যাস সৃষ্টি করা বাদে, শিক্ষার আর কোন উদ্দেশ্য নেই।

১। মনরো। টেক্সটবুক ইন দ্য হিসট্রি অব এডুকেশন পৃঃ ৫৭২

স্বাভাবিক বন্য মানুষ ও তার স্বাভাবিক প্রক্ষোভ (impulses)কে সবচেয়ে বেশী সত্য বলে স্বীকার করে নিলে প্রাথমিক আবেগ ও প্রক্ষোভের অকুণ্ঠ প্রকাশ শিক্ষার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। কেন না প্রক্ষোভের প্রকাশে সুখানুভূতি হয় এবং শিক্ষার উদ্দেশ্যও সুখানুভব। এই সুখানুভূতি বর্তমানের না হয়ে দূর ভবিষ্যতের এবং দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। সেই জন্য শিক্ষায় আত্মসংযমেরও প্রয়োজন আছে। সুখের স্তর ভাগ করার বিচারবোধ চরিত্রের একটি গুণ বলে স্বীকৃত। এই বিচার-বোধের চর্চা করে মানুষ শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক আনন্দ নয় দূরভবিষ্যতেও আনন্দের ব্যবস্থা পাকা করতে পারবে।

ম্যাকডুগল নামে আরেকজন প্রসিদ্ধ স্বভাববাদী মনোবৈজ্ঞানিক কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য সুখের সন্ধান এই মতে বিশ্বাসী নন। আমাদের সমস্ত কাজ সুখলাভ বা দুঃখ এড়ানোর চেষ্টা দিয়ে প্রভাবিত একথা সত্যি নয়। তাঁর মতে কতগুলো স্বাভাবিক লক্ষ্যে পৌঁছুনোর ঝোঁক আমাদের প্রকৃতিগত এবং আমাদের কর্মে আগ্রহগুলো বাস্তবিক সেই প্রকৃতিরই প্রকাশ। অতএব সুখ বা বেদনা-লাভ, সেই স্বাভাবিক লক্ষ্যতে সার্থকভাবে পৌঁছুতে পারা বা না পারার অকিঞ্চিৎকর আনুষঙ্গ (by products) মাত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গি হতে শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের প্রকৃতির উদ্যমকে ঊর্দ্ধগামী (sublimation) করা। সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে ঊর্দ্ধমুখী করে, সুসংহত ও সুসম্বদ্ধ করে ভিন্ন পথে পরিচালনা করা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তি-গুলি যাতে পরস্পরবিরুদ্ধ না থেকে সহযোগী ভাবে কাজ করে প্রাণীকে পূর্ণ-শক্তির অধিকারী করে সেটাই শিক্ষাবিদদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অবশ্য ঠিক কোন পথে বা আদর্শে মানুষের সহজাত সংস্কারকে চালনা করা যাবে স্বভাববাদের পক্ষে সে বিষয়ে পরিস্কার নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়।

স্বভাববাদ বিবর্তনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং যেহেতু বিবর্তনবাদের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা আছে, সেই জন্য স্বভাববাদেরও ভিন্ন ভিন্ন রূপ আছে। বিবর্তনের ধারণা অনুসারে শিক্ষার লক্ষ্য এদের সকলের ক্ষেত্রে পৃথক্ পৃথক্। যদি নিও-ডারুইনিজম্ মতকে সত্য বলে ধরা হয় (এঁদের ধারণা হচ্ছে পরিবেশ জীবন্ত প্রাণীর ওপর বিশেষ প্রভাব খাটায়, অপরপক্ষে প্রাণীও অস্তিত্বের জন্য সংঘর্ষ চালায় পরিবেশের প্রভাবের বিরুদ্ধে। ফলস্বরূপ শুধুমাত্র যোগ্যতম প্রাণীই টিঁকে থাকতে পারে।) তাহলে পরিস্কার ভাবে, শিক্ষার আদর্শ হবে ব্যক্তিকে বা

জাতিকে সেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা যাতে বেঁচে থাকা নিশ্চিত হয়।[১] অন্য পক্ষে নিও লামার্কপন্থীদের মত যদি সত্য হয় যে উন্নততর প্রাণীস্তরের বিবর্তনের গোড়ায় হচ্ছে জীবন্ত প্রাণীর, তার পরিবেশের সঙ্গে নিজের অভ্যাস এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন ইত্যাদিকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা, তবে কিন্তু (শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে) অন্য একটি সিদ্ধান্তে আসতে হবে। তখন শিক্ষা হবে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সঙ্গে প্রক্রিয়া। এর লক্ষ্য হবে ব্যক্তিকে তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে শেখানো। মনের ও দেহের স্বাস্থ্য হবে বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য এবং আদর্শ হবে পরিবেশের সঙ্গে হার্দ্দ্য সমন্বয়। এখানে ব্যক্তির চিন্তায় 'দৈবী' বা অন্য কোন প্রকার অসন্তোষ থাকবে না।

তবে বার্ণার্ড শ প্রমুখ কয়েকজন স্বভাববাদী শিক্ষার লক্ষ্য আরেকটু দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত করেন। এঁদের মতে মানুষ বিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হয়ে যা করে তাই শিক্ষা। এই শিক্ষার দরুণ জাতিগত ভাবে মানুষের উন্নতি হয়। বিবর্তনের ধারায় মানুষের এই ক্রমোন্নতি শিক্ষার লক্ষ্য। এই মতবাদ গ্রহণ করার পক্ষে অসুবিধা হচ্ছে এই যে মানুষের অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্যগুলি বংশপরম্পরায় সঞ্চারিত হয় না। যদি অর্জ্জিত বৈশিষ্ট্যগুলি পরবর্তী পুরুষে সঞ্চারিত হওয়ার একটা ঘটনাও প্রমাণিত হত তবে লামার্কপন্থীদের সুবিধা হয়ে যেত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এমন কোন নজীর মেলে না। তবে এঁরা বলেন দৈহিকভাবে অর্জ্জিতগুণের সঞ্চারণ সম্ভব না হলেও সামাজিক গুণগুলি একপুরুষ হতে দ্বিতীয় পুরুষে অনুকরণের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হওয়া সম্ভব। কাজেই শিক্ষার অর্থ হল প্রত্যেক পুরুষের ভাল ভাল সামাজিক গুণগুলির (racial gains) রক্ষা করা ও পরিবর্দ্ধিত আকারে পরের পুরুষে পৌঁছিয়ে দেওয়া। বংশানুক্রমে এভাবে মানুষ ভাল হতে আরো ভাল হয়ে বিবর্তিত হবে।

স্বভাববাদী শিক্ষাদর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করা যাক্। এর প্রথম বৈশিষ্ট্য শিশুর আন্তরপ্রকৃতির উপর গুরুত্বদান। এঁরা বলেন শিশু স্বভাবতঃ অতি পবিত্র, সুতরাং শিক্ষার কাজ হবে সেই পবিত্রতাকে রক্ষা করা। ওয়ার্ডস্-

১। "If the Neo Darwinian view which emphasises the selective action of the environment on the living creature along with the struggle for existence, and the consequent survival of the fittest be correct, then clearly the aim of education must be to equip the individual or the nation, for that Struggle and so to (ensure) survival"—Ross p 91.

ওয়র্থ শিশুকে স্বর্গ হতে গৌরবের জ্যোতির্ময় পথে নেমে এসেছে বলে কল্পনা করেছেন।"[১]

এদিকে খ্রীষ্টধর্মে শিশুকে কল্পনা করা হয়েছে "যার মন কুটিলতায় ভরা ও যে সবচেয়ে বেশী মন্দ—"এইভাবে। (জেরেমাইয়ার এমনই বিশ্বাস)। স্বভাববাদীরা ঠিক এর বিপরীত মতে বিশ্বাসী এবং তাঁরা শিশু শিক্ষা দেবার পর কেমন হবে, তার চেয়ে শিক্ষা পাওয়ার আগে যেমনি নিষ্কলুষ পবিত্র ছিল তেমনভাবে রক্ষা করতেই বেশী উৎসাহিত। তাঁরা বলেন বয়স্ক লোকদের সৎ আচার আচরণ সম্বন্ধে ধারণার বিশেষ কোন মূল্য নেই বরঞ্চ শিশুর আচার আচরণ তার মন্দরূপেও আদরনীয়। শিক্ষার কাজ ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতি নয়, বর্ত্তমানের বাঁচার প্রক্রিয়াটুকুই শিক্ষা (They took on education not so much as preparation for living as living itself)। তাঁরা শৈশবকে বিশেষ মূল্য দেন এবং শিশুকে শিশু হয়েই থাকতে দিতে চান। রুশো বলেছেন "প্রকৃতি স্থির করে দিয়েছেন বয়স্ক মানুষ হবার আগে শিশু শিশুই থাকবে।"[৩] এবং "যে নিষ্ঠুর শিক্ষা বর্ত্তমানকে সুদূর ভবিষ্যতের যূপকাষ্ঠে বলি চড়ায়, যা নিতান্ত হৃদয়হীন আইনকানুনের ভার শিশুর উপর চাপায়, তা একান্ত নিন্দনীয়। দূর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সুখের আশায় তাকে এখনই নানা বিধিনিয়মের নিগড়ে বেঁধে অসুখী করে লাভ কি ?"[৪]

ঐতিহাসিক মনরোর মতে রুশোই প্রথম এই বাণী প্রচার করেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও পদ্ধতি, শিশুর জীবন ও শিশুর অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্পূর্ণ সীমিত থাকবে। 'সম্পূর্ণ সীমিত' কথাটি কিছু উগ্র। একটু ঘুরিয়ে রুশোর শিক্ষার ধারণা হচ্ছে শিশুর আন্তর বৈশিষ্টগুলির সুসমন্বিত, যুক্তিযুক্ত, আনন্দিত ও সামঞ্জস্য পূর্ণভাবে বেড়ে উঠা। কেননা শিশুর প্রকৃতি বর্দ্ধমান, তা স্থবির নিশ্চল নয়, অতএব শিশুর প্রকৃতির স্বাভাবিক বৃদ্ধি শিক্ষার উদ্দেশ্য।

কাজেই শিশুর অন্তপ্রকৃতির ওপরে যে ঝোঁকটা দেওয়া হচ্ছিল সেই ঝোঁকটা গিয়ে পড়লো শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির উপর। কিন্তু বৃদ্ধির কোন দিকটা স্বাভাবিক এবং কোন দিকটাই বা অস্বাভাবিক। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আধুনিক স্বভাববাদী সাহায্য নিলেন মনোবিজ্ঞানের। জ্যেষ্ঠ দার্শনিকদের চিন্তনের অন্তর্মুখী

১। ওয়ার্ডস্‌ওয়র্থ। ওড অন ইন্টিমেশন্‌স্‌ অব ইম্মরটালিটি।
২। জেরেমাইয়া। XVII ৯
৩। রুশো। এমিল পৃঃ ৫৪
৪। রুশো। এমিল পৃঃ ৫৪

চর্চা (introspective studies of intellectual) শিশুমনের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন আলোকপাত করতে পারেনি, কেননা বয়স্কদের মনের ক্ষুদ্র সংস্করণ তো শিশু নয়, সে বয়স্ক মানুষ হয়ে উঠতে যাচ্ছে মাত্র। অতএব নতুন একটি মনোবিদ্যার প্রয়োজন হল শিক্ষার ক্ষেত্রে। তাকে বলা যাক্ "ক্রমবিকাশের মনোবিদ্যা" (Developmental psychology)। কেউ বলেন শিশুর বিকাশের ধারাটা সমাজবিকাশের ধারার মতো। তাই সেভাবে শিক্ষার পরিকল্পনা করা যাক্। কেউবা জীববিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে "প্রবৃত্তি মনোবিদ্যা"র (instinct psychology)র সাহায্য নিলেন, তবে এটা সহজাত সংস্কারের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক মনোবিদ্যা, তবে বর্তমান ধারা হচ্ছে, শিশু বালক কিশোরদের দৈহিক মানসিক আত্মিক বিকাশকে যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করে তাদের বুদ্ধির বৈশিষ্ট্যগুলি লিপিবদ্ধ করা। এই থেকে বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা পরিকল্পনা করা সম্ভব হবে।

তবে বিশুদ্ধ স্বভাববাদী কোন বিশেষ মনঃস্তত্ব অনুযায়ী কোন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবার পক্ষপাতী নন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য শিশুর প্রকৃতিকে বিনা বাধায় পূর্ণ প্রস্ফুটিত হতে দেওয়া। শিক্ষা অর্থ স্বভাবজ বিকাশকে সাহায্য করা। যখনই শিশুর মন শক্তি ইচ্ছা আবেগ ইত্যাদি কোন পরিচালনা বিনা বিকশিত হতে পারে তখনই শিক্ষালাভ হয়েছে বলা যাবে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ কমেনিয়াস বলেছেন প্রকৃতির নিজস্ব সময়সূচী আছে। স্বভাববাদী এই কথায় বিশ্বাসী। এরা তাই শিশুকে তার নিজের স্বভাব অনুযায়ী বাড়তে দেওয়ার পক্ষপাতী। শিশু তার খুসীমত কাজ বেছে নেবে। শিক্ষক এতে কোন বাধা দেবেন না। কোন পরিচালনাও করবেন না। যা কিছু এই বিকাশকে বাধা দেয় তাঁরা তাকেই নিন্দা করেন। বিদ্যালয়কে এরা সন্দেহের চোখে দেখেন যে আদর্শ পরিবারে শিশুর সহজাত বিকাশের সব ব্যবস্থা আছে সেখানে শিশুর পূর্ণ বিকাশ যেমন সম্ভব স্কুলের নিতান্ত ধরাবাঁধা ব্যবস্থার মধ্যে তেমন বিকাশ কিছুতেই সম্ভব নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেখানে গৃহ পরিবেশ শিশুর বিকাশের অনুকূল নয় সেখানে মন্দ পরিবেশের জন্য শিশু পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারেনা। যেখানে শিশুর নিজের মা বাবা তাকে যোগ্য শিক্ষা দিতে পারেনা সেক্ষেত্রে তাকে সেই পরিবেশ থেকে সরিয়ে বিদ্যালয়ের এমন পরিবেশের মধ্যে নেওয়া দরকার যেখানে তার পূর্ণ স্ফূর্তি হতে পারে। সেই স্কুলে কোন মন্দ প্রভাব কোনভাবে শিশুকে নষ্ট করতে পারবে না। এখানের পরিবেশ

মুক্ত। বিদ্যালয়ের রুটিনবাঁধা ছককাটা শ্রেণীকক্ষে বসিয়ে শিক্ষার এরা বিষম বিরোধী। কারণ এই নিয়মবাঁধা শিক্ষায় এটা ধরে নেওয়া গেছে যে সব শিশুই একই গতিতে পড়াশোনা করে, একই গতিতে বিকশিত হতে পারে। সেইজন্য রয়েছে স্কুলের নির্দ্দিষ্ট সময় সূচী। শিশু কোন সময়ে কি পড়বে সবই এখানে ছকে বাঁধা। এসব প্রতিষ্ঠানগত ছকবাঁধা অনুষ্ঠানের প্রতি স্বভাববাদের প্রবল বিরাগ।

তবে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের কর্ত্তব্য কি? বস্তুতঃ স্বভাববাদীরা মোটেও চাননা শিক্ষক শিশুর পড়াশোনা পরিচালনা করার চেষ্টা করেন। শিক্ষক যে শুধু 'গুরুগিরি' বা জোরজবরদস্তমূলক শিক্ষাদান করতে পারবে না তা নয়, তিনি কোন রকমে ছাত্রদের প্রভাবিত করতে পারবেন না। তার ভূমিকা পাদপ্রদীপের সামনে নয় পেছনে। পেছন থেকে তিনি শিশুর বিকাশ লক্ষ্য করবেন। শিশুর উপর তিনি নিজের জ্ঞান, বিদ্যা, আদর্শ কিছুর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না। তিনি শিশুর চরিত্রগঠনে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নন। শিশু নিজের চেষ্টায় নিজেকে গড়ে তুলবে। তার শিক্ষা, তার নিজেরই স্বাধীন ইচ্ছার ও আবেগের বিকাশ। তার শিক্ষা হবে তার নিজের উৎসাহ ও আগ্রহের দ্বারা। শিক্ষকের কৃত্রিম বাইরে থেকে জোর করা প্রচেষ্টা দিয়ে নয়। তবে শিক্ষকের ভূমিকা গৌণ হলেও স্বভাববাদী শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষককে একেবারে বর্জ্জন করেন নি। বস্তুতঃ স্বভাববাদীরা তাঁকে শিক্ষার প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলে মনে করেন। তিনি শিশুর বিকাশের জন্য পরিবেশ প্রস্তুত করবেন। নানারকম প্রয়োজনীয় জিনিষ সংগ্রহ করবেন। শিশুকে বাড়বার সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেবেন। তাঁর উপর থাকবে আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব। তাঁর সৃষ্ট পরিবেশ এমন হওয়া চাই যেখানে স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে। কাজেই মন্তেসরী তাঁর শিশু শিক্ষার্থীর চারপাশে শিক্ষাপ্রদ খেলনা (didactic apparatus) ছড়িয়ে রাখার পক্ষপাতী যাতে শিশু নিজেই সেগুলি নাড়াচাড়া করতে চায় ও তা দিয়ে কিছু শিখতে আগ্রহী হয়। শিশুর শিক্ষা হবে স্বয়ংশিক্ষা। সে নিজেকে নিজেই শেখাবে। এমন কি নর্ম্যান ম্যাক্‌মান তাঁর 'দ্য চাইল্ড্‌স্ পাথ অব ফ্রীডম' বইতে প্রস্তাব করেন যে শিশুরা স্বাভাবিকভাবে নিজেরা নিজেদের শেখাতে ভালবাসে। আমরা শিশুর সেই স্বাভাবিক আগ্রহকে কাজে লাগাতে পারি। প্রাচীন ভারতে প্রচলিত সর্দ্দার পোড়ো প্রথা (monitor system) একই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে একটু বেশী বয়সী ছাত্ররা নীচু শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াশোনা শেখার ভার গ্রহণ করত।

স্বভাববাদী আন্দোলনের মূল প্রধানত রুশোর বইয়ের পাতায়। যদিও বর্তমানকালের মনঃস্তত্ত্ববিদরা রুশোর মতো বিশ্বাস করেন না যে "জন্ম হতে বারো বৎসর বয়স মানুষের জীবনের সবচেয়ে সঙ্কটপূর্ণ কাল।"[১] তবু এতক্ষণ ধরে যে মতের ব্যাখ্যা হল সেই মতবাদীরা রুশোর সঙ্গে একমত যে পাঁচবৎসর হতে বারো বৎসর কালের শিক্ষা বেশির ভাগ হবে নেতিবাচক। শিক্ষক নিজে, বিশেষ চেষ্টা করে, শিক্ষা দান হতে বিরত থাকবেন শিশুকে সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দেবেন এবং কেমন করে 'বুদ্ধিমানের মতো সময় বইয়ে দিতে হয়" তার শিক্ষা দেবেন। রুশো এক চিঠিতে লেখেন "আমি ইতিবাচক শিক্ষা বলতে এমন শিক্ষা বুঝি যা মনকে অকালে পাকিয়ে দেয়। এর দ্বারা শিশুকে অকালে বয়স্কদের কাজ শেখানো হয়। আমার 'নেতিবাচক শিক্ষা' কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলিকে পূর্ণ বিকাশে সাহায্য করবে। যেহেতু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই সমস্ত জ্ঞান লাভ হয় তাই প্রথমে সরাসরি জ্ঞান দান না করে ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ করে তুলতে হবে। এখন এরা নিজেদের কাজ করার জন্য প্রস্তুত। নেতিবাচক শিক্ষা মানে আলস্যের বা নিষ্ক্রিয়তার শিক্ষা নয়। এর দ্বারা যদি কোন লাভ না হয় অন্ততঃ এর দ্বারা কোন ক্ষতি হবে না। যদি খাঁটি জ্ঞানের চর্চা এই সময় নাও হয় অন্তত ভেজাল বা ভুলও শিখবে না। এই শিক্ষার ফলে শিশু এমন প্রস্তুত হবে যে উপযুক্ত বয়সকালে সে জ্ঞানকে উপলব্ধি করতে পারে এবং মঙ্গলকেও আগ্রহের সঙ্গে চিনে বেছে নিতে পারে।"[২]

এসময় এমন কিছু করা হবে না যাতে শিশুর মন চিরদিনের মত ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায়। এজন্য তাকে পড়তে শেখানোর দরকার নেই। বয়স ও পরিণতি এলে সে নিজেই সেই কৌশল আয়ত্ত করে নেবে। তার শরীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শক্তিগুলোর চর্চা করতে হবে কিন্তু মনকে নিষ্ক্রিয় রাখতে হবে। কোন নৈতিক শিক্ষা দেবার দরকার নেই। তবে প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করার ফল যে অমোঘ এটা তাকে শেখাতে হবে।

স্বভাববাদের মূল কথাটি সম্ভবতঃ এভাবে বলা যায় যে এ মতবাদে শিক্ষক, পুঁথিপুস্তক, জ্ঞানভাণ্ডার, সমস্ত কিছু ছাপিয়ে, শিশুকে পাদপ্রদীপের সামনে রাখা হয়েছে। স্ট্যানলীহল্ একটি নতুন শব্দ চয়ন করেছেন 'শিশু কেন্দ্রিক'। স্যর জন অ্যাডাম্স্ সেই নতুন বিশেষণটী ব্যবহার করে বল্লেন স্বভাববাদের দৃষ্টি-

১। রুশো। এমিল পৃঃ ৫৭

১। রুশোর প্যারিসের আর্চবিশপ ক্রিস্তফ দ্য ব্যুমন্তের কাছে লেখা চিঠি ঃ৯১৮

ভঙ্গী শিশুকেন্দ্রিক। তিনি তাঁর সুসমন্বিত বোধ বুদ্ধি কাণ্ডজ্ঞান, মূলতত্ত্বে অবরোহন করার ক্ষমতা ও মূল্যায়নের শক্তি দিয়ে সহজেই গত শতাব্দীর প্রথমাংশের শিক্ষা ক্ষেত্রকে বিশ্লেষণ করে তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো জনসমক্ষে তুলে ধরেছেন। নানাবিষয়বিশারদের শিক্ষা পদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করে তিনি দেখিয়েছেন মূলত এই 'নবীন শিক্ষা পদ্ধতি' হচ্ছে শিশু কেন্দ্রিক তাঁর মডার্ণ ডেভেলপমেণ্টস ইন এডুকেশনাল প্র্যাকটিশের মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন বর্তমান শিক্ষা নিরীক্ষার জটিলতা ও বিস্তারের মধ্যে যে জিনিষটী প্রমুখ তা হচ্ছে এখানে শিশু যেন তার নিজের সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছে। বর্তমান শিক্ষার গতি ও প্রকৃতি শিশুকেন্দ্রিক তাই মূলতঃ স্বভাববাদী।

স্বভাববাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি মনঃস্তত্ব নির্ভর। রুশোই প্রথম শিক্ষাক্ষেত্রে মনঃস্তাত্বিক ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি যেই বল্লেন শিক্ষা শিশুর আন্তর প্রকৃতিকে অনুসরণ করবে, তখনই একথাও ঘোষিত হল যে সেই আন্তর প্রকৃতিকে জানা দরকার। শিশুমনকে বুঝতে হলে মনঃস্তত্বের প্রয়োজন। একথা বলার জন্য পৃথিবীর প্রথম মনঃস্তাত্বিক ধারা বয়ে আনবার ভগীরথ বলে রুশো স্বীকৃত হলেন। এর আগেও টমাস ফুলার বলেছিলেন যে আদর্শ শিক্ষক হচ্ছেন তিনি যিনি "ছাত্ররা তাদের পাঠ্যপুস্তক যেমন যত্নের সঙ্গে পাঠ করে তেমনিই যত্নের সঙ্গে ছাত্রদের চরিত্র অধ্যয়ন করেন।"[১] রুশোর বলিষ্ঠ রচনার ফলেই শিশুর মনঃস্তত্বকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। পেষ্টালৎসী, হার্ব্বার্ট, ফ্রোবেল প্রমুখ রুশোর অনুবর্তী শিক্ষাবিদরা তাঁর স্বপ্নকে বস্তুরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মনঃস্তাত্বিক ধারা এদের পরে দ্রুত এগিয়ে গিয়েছে। এখনো আমরা শিশু প্রকৃতি বোঝার চেষ্টায় ইচ্ছুক। শিশু প্রকৃতি যে শিক্ষা ব্যবস্থার সর্ব্বপ্রধান উপকরণ রুশোর এ মত আজ সর্ব্বজনগ্রাহ্য।

এই মনঃস্তাত্বিক ধারা স্বভাববাদের কেন্দ্রবিন্দু। এর বহুবিধ শাখা ও প্রাচীন ইতিহাস রয়েছে। শিশু প্রকৃতি জানবার চেষ্টায় বহু লোক আত্মনিয়োগ করেছে, বহু পুঁথিপুস্তক লেখা হয়েছে। তাকে বোঝার জন্য সমবেত জ্ঞানীগুণীদের চেষ্টার ফলে নানা বই প্রকাশিত হয়ে আজ শিক্ষকের করতলগত। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের উপরও অনেক আলোচনার বই মুদ্রিত হয়ে বেরিয়েছে। দু'য়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক্। ম্যাকডুগালের মনোবিজ্ঞান হতে শিক্ষাবিদ্‌রা জেনেছেন

১। **Thomas Fuller—"...the good schoolmaster as one who studieth his scholars' natures as carefully as they their books".**

প্রাথমিক সহজাত সংস্কারকে কেন্দ্রে রেখে ক্রমে ক্রমে পরিশীলিত আবেগ, আগ্রহ ও ইচ্ছাশক্তিকে গড়ে তোলা যায়। অনিচ্ছুক শিক্ষার্থীকে নীরসপাঠে উৎসাহিত করতে হলে তার সহজাত সংস্কার-নির্ভর-আগ্রহ ও ইচ্ছাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এর পরে শিশু নিজের ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তিকে মূল্য দিতে শিখবে এবং নিজের আত্মপ্রত্যয় গড়ে উঠলে শ্রমসাধ্য পড়াশোনাতেও বিমুখ হবে না। ক্রমে ক্রমে শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠন করা সম্ভব হবে। সুতরাং মনঃস্তাত্ত্বিক মতবাদকে সরাসরি ভাবে শ্রেণীঘরে পাঠদানের কাজে লাগানো যাবে। থর্ণডাইকের 'শেখা' মতবাদ আজকাল নানা ভাবে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান ও শিক্ষাগ্রহণের কাজে নানা রকম মানসিক কুশলতা শেখানোর কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শিশুর চিন্তাশক্তি কেমন করে বিকশিত হয় বা কল্পনার বিস্তার কেমন করে হয় এ সমস্ত সম্বন্ধেও অনেক মনঃস্তাত্ত্বিক নিরীক্ষণ হয়েছে। এসবের ফলে শিক্ষা পদ্ধতির বহু পরিবর্তন হয়েছে। শিশুর বয়োবৃদ্ধি অনুসারে তার বিকাশ ও বৃদ্ধি আজ মনঃস্তত্ত্বের বিষয়বস্তু। এর থেকে দেখা যায় একই শিশু তার বয়োবৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থায় একেবারে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে আগ্রহী এবং ভিন্ন ভিন্ন কুশলতায় পারঙ্গম। এমন কি বলা চলে বিভিন্ন স্তরে সে বিভিন্ন ব্যক্তি। এই সত্যটি প্রত্যক্ষ হওয়ার পরে শুধু যে বিদ্যালয়ের পাঠসূচী তার জীবন পরিক্রমার স্তরভেদ অনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট হয়েছে অথবা শিক্ষার পদ্ধতি নানা শ্রেণীতে ভিন্ন হয়েছে, তাই নয়। এই আবিষ্কারের ফলে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক হেরফের হয়েছে – শৈশব, বাল্যকাল, কৈশোর ইত্যাদির বয়ঃক্রমের স্তর অনুসরণ করে সম্পূর্ণ বিভিন্ন শিক্ষার আয়োজনও স্বীকৃত হয়েছে। বুদ্ধির নানা রকম বৈশিষ্ট্য আলোচনার পর একথাও শিক্ষাবিদরা মেনে নিয়েছেন যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বুদ্ধিক্ষমতার পার্থক্য আছে এবং সকলের কাছ থেকে একই ধরণের পারদর্শীতা আশা করা যায় না। তাছাড়া অনুভূতি ও আবেগের ধরণ অনুযায়ী মানুষের শ্রেণী (type) ভাগ করা যায় কিনা তা নিয়েও নানা বিতর্ক ও উত্তরের প্রতীক্ষা চলছে। এ সবের ফলাফলের ওপর স্বভাবতই শিক্ষার রীতিনীতি অনেকটা নির্ভর করবে।

মনঃস্তত্ত্বের আরেকটি নতুন দিগন্ত মনোসমীক্ষণ অথবা মনোবিকলনবাদ (Psychoanalysis)। এর সঙ্গে বর্ত্তমান কালের স্বভাববাদী শিক্ষাদর্শের বিশেষ যোগ আছে। এই বিশেষ মতবাদে বিশ্বাসী মনোবিদরা বলেন নানাবিধ মানসিক রুগ্নতার কারণ হচ্ছে সমাজের অস্বাভাবিক বাধা নিষেধের নিগ্রহ। বিশেষ করে যৌন বিষয়ক বিধি নিষেধ ভবিষ্যৎ জীবনের নানা প্রকার মানসিক রোগের

মূল। ফ্রয়েডের মনোবিকলনবাদ, যুদ্ধোত্তর স্বভাববাদীদের কাছে প্রায় ঐশী-বাণীর মত হয়ে দাঁড়ায়। এঁরা ফ্রয়েডকে উদ্ধৃত করে সহজেই দেখাতে পারলেন যে শৈশবে পূর্ণ আত্মপ্রকাশের সুযোগ ও স্বাধীনতা না পাওয়ার দরুন সমাজের মধ্যে মানসিক রুগ্নতা দেখা দিয়েছে। সুতরাং মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য বিধি নিষেধকে দূর করে মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হতে দেওয়া দরকার। মনোসমীক্ষণের ওপর লেখা বইতে বাজার পরিপ্লাবিত। বহু সাধারণ লোকও আজ এই মতবাদ সম্বন্ধে বই পড়তে আগ্রহী।

যদিও এ সমস্ত মনঃস্তত্বের কিছু কিছু অপব্যবহার হয় এবং অনেকে এর সপক্ষে খুব অবাস্তব দাবী করেন তবু মোটামুটিভাবে বলা যায় এ সমস্ত মনোবিজ্ঞান-নির্ভর শিক্ষাতত্ত্ব স্বাস্থ্যকর পথই অবলম্বন করেছিল। মনোসমীক্ষণ নির্ভর শিক্ষাতত্ত্বের উদ্দেশ্য হল অনর্থক বাধা নিষেধের নিগড় থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্তি দিয়ে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধির পথ করা। এর ফলে অবচেতন মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা মানসিক রুগ্নতা থেকেও সে মুক্ত থাকবে। শিক্ষা-তত্ত্বে যৌনপ্রসঙ্গ বিষয়ে এই স্বাস্থ্যকর দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হওয়ার ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অতিরিক্ত শুচিবায়ুতা, দৈহিক নির্য্যাতন ও শাস্তিকে পরিহার করা হতে থাকলো। শিক্ষকরা বুঝতে শিখলেন যে শিশুর উৎসাহ উদ্দীপনাকে জোর করে রুদ্ধ করা চলবে না। এই মনঃস্তত্বের সবচেয়ে মূল্যবান অবদান হচ্ছে যে এর দ্বারা কিশোর অসামাজিক দুষ্টু ছেলেদের ব্যবহার ও মানসিকতাকে (delinquency) দরদের সঙ্গে বোঝবার চেষ্টা করা হতে লাগলো। কোন কোন ক্ষেত্রে তেমন আচরণ সংশোধনেরও চেষ্টা করা হল। তা ভিন্ন অসামাজিক ব্যবহারের কারণ-গুলোকে দূর করার দৃঢ় প্রচেষ্টাও চলতে লাগলো।

স্বভাববাদীরা শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে বলেন যে সমস্ত শিক্ষা বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে দিতে হবে। রুশোর সাবধানবাণীর প্রতিধ্বনি শোনা যায় "তোমার শিক্ষার্থীকে কোনরকম পুঁথিগত পাঠ দিও না, অভিজ্ঞতা হতেই সে শিক্ষালাভ করবে।"[১] বস্তুবাদীরা স্বভাববাদের এই বৈশিষ্ট্যটি সমর্থন করেন যে প্রকৃত বস্তুর সাহায্যে শিক্ষা দিতে হবে। পুঁথিগত বিদ্যা নিতান্ত নিরর্থক। তবে বস্তুবাদের "কথার আগে বস্তু (object before words)" পুরো না মানলেও এই মতটি দ্বারা সাধারণ শিক্ষক শুধুমাত্র কথার খেলা দিয়ে শিক্ষকতা চালানোর ব্যর্থতা সম্বন্ধে কিছুটা সচেতন হয়ে ওঠেন।

১। রুশো। এমিল। পৃঃ ৫৫।

সকলেই এখন ভাবতে সুরু করেন যে শিক্ষার্থীদের নির্বস্তুক জ্ঞানের পিছনে একটা বাস্তব অভিজ্ঞতার বুনিয়াদ থাকা দরকার, বিজ্ঞান কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তক দেখে চকখড়ি আর গলার জোরের সাহায্যে পড়ানো যাবে না। ছাত্রদের গবেষণাঘরে হাতে কলমে কাজ করতে দিতে হবে। অথবা যেখানে সম্ভব বাইরে প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে বিজ্ঞানের তত্ত্ব শেখার চেষ্টা করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক হতে জ্যামিতি শেখার চেয়ে স্কুলের খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ অথবা স্কুল বাড়ী কতটুকু উঁচু তা মাপতে শিখলে, জ্যামিতি শিক্ষা অনেকখানি বাস্তব হয়ে ওঠে। এই রকমভাবে জ্যামিতির নানা রকম বাস্তব সমস্যা চিন্তা করে কাজে লাগানো যেতে পারে। তাছাড়া পরিভ্রমণ ও পর্য্যটন দিয়ে ভূগোল শেখানো যায়। স্বভাববাদী শিক্ষক নিজের ব্যাখানের চেয়ে ছাত্রদের স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শেখার ওপর অনেক বেশী গুরুত্ব দেন।

এঁরা নৈতিক শিক্ষাও পুঁথিগত ভাবে না দিয়ে সমাজের প্রত্যক্ষ বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী। নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা না দিয়ে, বিদ্যালয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে সামাজিকতার শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। বিদ্যালয়ের পরিবেশ হবে মুক্ত স্বাভাবিক যেখানে সকলেরই অধিকার স্বীকৃত। কেউ বা এখানে দলপতির ভূমিকায় কেউ বা দলের অনুগামী। প্রাচীনকালের 'শিক্ষক শাসিত' পদ্ধতি বর্জন করে ছাত্র শাসনতন্ত্র চালু করা হয়। সে রাজ্যের কর্মকর্ত্তারা ছাত্রদের মধ্য হতে স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচিত হবে, আর শিক্ষক ?

নান বলেন "শিক্ষক এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা নয় যদিও এই ক্ষুদ্র শাসনতন্ত্রে তিনি চিরকালের অধ্যক্ষের পদাধিকারী। এই বিশিষ্ট পদাধিকারের কারণেই নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য তিনি আরো অনেক বেশী নিষ্ঠা ও বিবেচনার সঙ্গে পালন করবেন।"[১]

যাতে স্কুলের সমাজ স্বাভাবিক সমাজের একটি সংস্করণ হয় তাই এখানে সহশিক্ষা প্রবর্তনের উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। ছেলে মেয়েদের অস্বাভাবিকভাবে আলাদা করে রাখলে পরস্পরের সম্বন্ধে অস্বাস্থ্যকর মনোভাবের সৃষ্টি হবে সুতরাং দুই দলকে একত্র রাখাই শ্রেয়। সহশিক্ষা প্রসঙ্গটি অবশ্য বিতর্কমূলক। এখানে কারো কারো অতি শুচিবায়ুগ্রস্ত মত যে এর চেয়ে বেশী সাংঘাতিক বিপজ্জনক ও দুর্নীতিমূলক ব্যবস্থা আর কিছু হতে পারে না এবং কারো কারো

১। নান। এডুকেশন, ইটস্‌, ডাটা এ্যাণ্ড ফার্ষ্ট প্রিন্সিপল্‌স্‌। পৃঃ ১১২

অতি আধুনিক, নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে সহশিক্ষা মেনে নেওয়া এই দুই মেরু প্রমাণ পৃথক মতবাদ লক্ষ্য করা যায়।

ইংল্যাণ্ডে কতগুলি আবাসিক স্কুলে সহশিক্ষা পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে। এটা স্বভাববাদী শিক্ষা আন্দোলনের নীতিসম্মত। যদি কেউ তর্ক করেন যে বাবা-মার কাছ হতে সন্তানকে সরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অস্বাভাবিক, তবে তার উত্তর হবে এই যে আদর্শ আবাসিক বিদ্যালয়ে পরিবারের চেয়ে আরো ভাল স্বাভাবিক পরিবেশে শিক্ষার আয়োজন করা সম্ভব। এর দ্বারা ছেলে মেয়েদের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হবে কারণ বিদ্যালয়ে সে আদর্শ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের স্বাদ পাবে।

স্বভাববাদীদের শিক্ষাপদ্ধতি আলোচনায় ক্রীড়াভিত্তিক শিক্ষার বিশেষ মর্য্যাদা আছে। বস্তুতঃ ক্রীড়াভিত্তিক শিক্ষার বর্ণনা ভিন্ন স্বভাববাদের আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। এই কথার একটা পশ্চাৎপট আছে। স্বভাববাদীদের বিশ্বাস হল সমস্ত শিক্ষা খেলার মনোভাব ও পদ্ধতিতে দেওয়া দরকার। মনঃস্তাত্ত্বিক গবেষণায় দেখা যায় শিশু সহজ খেলার মধ্য দিয়েই নিজের প্রকৃতিকে প্রকাশ করে এবং কোন ধারায় সে বিকশিত হবে তারও ইঙ্গিত তার খেলা হতেই পাওয়া যায়। খেলাকে কোন কোন মনঃস্তাত্ত্বিকরা মনে করেন আদিম জাতির কার্য্যাবলীর পুনরাবৃত্তি, কেউ বা মনে করেন ভবিষ্যৎ বয়স্ক জীবনের প্রস্তুতি অথবা জৈব প্রাণশক্তির অসম্বৃত অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশ। কিন্তু সকলেই স্বীকার করেন খেলা প্রকৃতির নিজস্ব পদ্ধতি যার সাহায্যে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হয়।

একথা শুধুমাত্র শৈশবের খেলা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয় খেলা সময়ের নিরর্থক অপচয় নয়। খেলার ছলে মানুষ নানারকম সৃজনী কাজে রত হয়েছে। শিশুর আনন্দময় ক্রীড়াচাঞ্চল্যকে তাই শিক্ষার মাধ্যম ও উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, খেলার দ্বারা শিক্ষা পদ্ধতি বিশেষভাবে স্বভাববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতের প্রকাশ সমস্ত প্রাক্‌প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুব ছোট শিশুদের শিক্ষায় দেখা যায়। সেখানে সম্পূর্ণ শিক্ষা ক্রীড়াভিত্তিক। মন্তেসরী স্কুলে তো অবশ্যই, অন্য সমস্ত আধুনিক প্রাক্‌প্রাথমিক স্কুলেও এই ক্রীড়াভিত্তিক পদ্ধতি প্রচলিত। বয়স্কাউট আন্দোলন, নানাপ্রকারের শিক্ষামূলক দেশভ্রমণ, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বায়ত্বশাসনেরমধ্যে ক্রীড়া ভিত্তিক শিক্ষানীতির প্রকাশ। যে কোন প্রাণবন্ত আনন্দময় সৃজনীক্রিয়ার মধ্যে খেলারই সক্রিয় ভূমিকা। কতভাবে যে এই মাধ্যমটি ব্যবহার করা চলে তার ইয়ত্তা নেই।

শিক্ষায় এক নতুন স্বভাববাদী ধারার পরিচয় পাওয়া যায় এ. এস. নীলের দুঃসাহসিক লেখায়। 'এ ডমিনিজ লগ' থেকে 'দ্যাট্ ড্রেডফুল স্কুল" পর্য্যন্ত বেশ কয়েকটি বই পর্য্যায়ক্রমে লিখে স্বভাববাদী শিক্ষার সপক্ষে তাঁর জোরালো মত প্রকাশ করেন। প্রচলিত শিক্ষাবিধির বিরুদ্ধে তাঁর প্রবল প্রতিবাদ এই বইগুলিতে সোচ্চার। তিনি বলেন যে প্রচলিত বিদ্যালয়ের শিক্ষায় নানা ধরণের গলদ আছে কিন্তু কি ভাবে যে সেগুলিকে সংশোধন করা যায় তা তিনি জানেন না। পরের বইগুলোতে তিনি পথ প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন। সামার স্কুলে তাঁর "ভয়ঙ্কর স্কুলে" (a dreadful school) এ তিনি সরস কৌতুকের সঙ্গে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন ও ব্যাখ্যা করেছেন। বইটির খানিকটা সংক্ষিপ্ত সার দেওয়ার চেষ্টা করছি। নীলের মতে জীবনের উদ্দেশ্য সুখলাভ করা। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি তাঁর সামার হিল স্কুলকে শিশুদের আনন্দ নিকেতন করে গড়ে তুলবেন। তাঁর উদ্দেশ্য হবে শিশুদের বিদ্যালয়ে খাপ খাইযে না নিয়ে, বিদ্যালয়টিকে শিশুদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো। এটি একটি আবাসিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে শিশুরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে, এখানে কোন শৃঙ্খলা নেই, উপদেশ নেই, তাড়না নেই, নীতিশিক্ষা নেই, ক্লাসের তাড়া নেই, শাস্তির ভয়ও নেই, এভাবে নীল শিশুদের, তাবা যা তাই হবার স্বাধীনতা দেবেন। তিনি এই দাবী করেন যে সামার হিল স্কুলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে ছেলেরা ঘৃণা ও ভয় হতে মুক্ত হয়ে নিজেদের মত করে গড়ে উঠবার সুযোগ পায়।

তিনিও রুশোর মত সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন যে শিশুরা স্বভাবতই সৎ, গঠনকার্য্যে আগ্রহী ও পরিশ্রমে ইচ্ছুক। তিনি তাদের বিদ্যালয়ে নিজেদের খুসীমত খেলা ও গঠনাত্মক কাজ করতে দেন। বড়দের দৃষ্টিভঙ্গি, নৈতিক আদর্শ বা মত তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেন না। তিনি বিশ্বাস করেন যে ছোটরা বড়দের ক্ষুদ্র সংস্করণ নয়। তাদের নিজস্ব আগ্রহ, উৎসাহ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্য বোধ আছে, ভবিষ্যতে তাদের আগ্রহ নেই। যা তাদের বর্তমানের আগ্রহ কৌতূহল ও প্রয়োজন মেটায় তা তাদের আকর্ষণ করে। কাজেই স্কুলে ধর্মনৈতিকতা সংস্কৃতি এসবের কথা তাদের কাছে নিরর্থক। এই বিদ্যালয়ে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও ভয় হতে ছেলেরা মুক্ত। খেলাধূলা এখানে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। খেলাধূলা শৈশব সীমান্ত পার হয়েও বেশ কিছুদূর বিস্তৃত। শিশুরা স্বাভাবিক ভাবে অবাধ, বন্য। যতদিন না তারা যথেষ্ট পরিণত হয়ে সভ্যতার বাধানিষেধ

নিজেরাই দাবী করে ততদিন তাদের স্বাভাবিক হতে দেওয়া হয়। খুব কম শিশুরাই মার্গ সঙ্গীত বা উচ্চাঙ্গ চিত্র কলা বুঝতে পারে, তাই স্কুলের দেওয়ালে উচ্চাঙ্গ চিত্রলিপি টাঙ্গিয়ে বা সুদৃশ্য আসবাবপত্রে স্কুল ঘর সাজিয়ে তাদের রুচি 'উন্নত' করার চেষ্টা হবে পণ্ডশ্রম মাত্র।

উপরের বর্ণনা হতে দেখা যায় যে শিক্ষক সর্ব্বদা শিশুর সপক্ষে থাকবেন। তিনি শিশুকে বুঝবেন। তিনি যা করা ঠিক নয় সেটা সম্বন্ধে নেতিবাচক হবেন আবার ভালবাসায় আর সমর্থনে সোচ্চার হবেন তবেই তিনি তাদের কাছ থেকেও আন্তরিকতা পারেন। শিশুকে ভালবাসা ও সমর্থন দিতে গিয়ে তাঁর নিজেকে বেড়ে ওঠার আর শৈশবকে ভুলে যাওয়ার দুঃখকর ঘটনা এড়িয়ে আবার শিশু হতে হবে। শিক্ষকের শিশুসুলভ কৌতুকবোধ থাকা দরকার যাতে শিশুদের 'মজায়' তিনিও যোগ দিতে পারেন। নিজেকে দূরে সরিয়ে না রেখে এবং শ্রদ্ধা প্রত্যাশা না করে শিশুদের দলে তিনি তাদের একজন হয়ে মিশবেন। নীল বলেন শিক্ষকের জীবন হবে এক নিরবিচ্ছিন্ন দেবার পালা।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা নীলকে দৃঢ়নিশ্চয় করেছে শিশুর স্বভাবের মৌলিক ভালত্বের সম্বন্ধে। কখনো কোন দুষ্টামী, যেমন দামী যন্ত্রপাতির অপব্যবহার করা বা ভেঙ্গে ফেলাকে যন্ত্রণা মনে করার কারণ হল, শিশুদেরও সম্পত্তি সম্বন্ধে 'বয়স্ক ধারণা' থাকবে এটা প্রত্যাশা করা। অনেক সময় বাড়ীতে শিশুদের সঙ্গে বুদ্ধিহীন ব্যবহারের ফলে তার শিশুমনকে বিকৃত করে ফেলা হয় যাতে করে সেই সব শিশুরা গুণ্ডামী, বা সমাজ বিরোধী কাজে রত হয়। বাবা-মারা যৌন প্রসঙ্গ বিষয়ে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং ছেলেমেয়েদের সমস্ত প্রকার যৌন কৌতূহল এরা চাপা দিয়ে রাখার পক্ষপাতী। এর দ্বারাই কিন্তু নানারকম জটিলতা ও গোলযোগের সূত্রপাত হয় বলে নীল মনে করেন। নীল এ ধরণের বিধি নিষেধের বিপক্ষে। যৌনবিষয়ক প্রশ্ন নীলের স্কুলে খোলাখুলিভাবে আলোচনা হয়ে থাকে। কোন প্রকার নৈতিক নিষেধও সেখানে নেই। তিনি যৌনজ্ঞানকে নৈতিক সমস্যা বলে মনে করেন না এবং বিদ্যালয়ে নগ্নতা (nudism) অনুমোদন করেন। ছেলেমেয়েরা গালাগালি দিতে অনুমতি পায় কেন না গালাগালি এক প্রকারের স্বাভাবিক ভাষা বলেই ছোটদের কাছে গ্রাহ্য। তাঁর স্কুলে 'অকথ্য' কিছু নেই। যৌনতার প্রতি সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান করার স্বাভাবিক ফল স্বরূপ এখানে সহশিক্ষা উৎসাহের সঙ্গে প্রচলিত। বস্তুতঃ সেটাই স্বাভাবিক শিক্ষা। তিনি মনে করেন এতে বিপদের কোন আশঙ্কা নেই, কেননা

ছেলে মেয়েরা পরস্পরকে ছোটবেলা হতে দেখতে অভ্যস্ত হলে পরস্পর সম্বন্ধে কোন অস্বাভাবিক অবদমিত কৌতূহল বোধ করবে না। কোন রকম অবাঞ্ছনীয় ঘটনাও ঘটবে না।* সামারহিলে কোন গুপ্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন গলিঘুঁজি নেই এবং ছেলেমেয়েদের জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী সত্যিই পরিচ্ছন্ন। নীল ভরসা দিয়ে বলেছিলেন যে ইংল্যাণ্ডের সমস্ত সহশিক্ষালয়ের প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে নিরুদ্বিগ্ন।

বাড়ী থেকে যে সব ছেলেমেয়ে অস্বাস্থ্যকর যৌন আচরণ বা যৌন বিষয়ে জানবার রুগ্ন কৌতূহল নিয়ে এই বিদ্যালয়ে আসে তাদের জন্য আলাদা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। এগুলো ঠিক মনোসমীক্ষণ প্রথায় নয় বরঞ্চ বন্ধুত্বপূর্ণ খোলাখুলি আলোচনার মত। নীল মনে করেন এই শিক্ষাদান বিশেষ জরুরী। এর উদ্দেশ্য হবে বাড়ীর আবহাওয়া হতে যে সব সমস্যা জন্মেছে সেগুলোর আলোচনা করে, যৌন নিষেধ ভয় ও নৈতিকতার থেকে উদ্ভূত সমস্ত প্রকার জটিলতাগুলো দূর করা। এগুলোকে তিনি বলেন পূর্ণশিক্ষাদান এবং মনের জট খুলে স্বাধীনতার খোলা হাওয়ায় আসার আগে মনের অস্বাস্থ্যকর গলিঘুঁজিকে ঝাঁট দেওয়া খুব প্রয়োজনীয় বলে তাঁর বিশ্বাস। এই আলোচনাগুলো তিনি বস্তুনিষ্ঠ রাখার পক্ষপাতী। এবং তিনি কোন বিশেষ বাঁধাধরা বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য নেন না, কেন না তিনি মনে করেন শিশুরা যখন নির্ভয়ে তাদের জটিলতাগুলোর সম্বন্ধে আলোচনা করে তখন বিশ্লেষণ হবে অপ্রয়োজনীয়। শিশুর ক্ষেত্রে মানসিক রুগ্নতা সারানো হয় অনুভূতির পূর্ণ প্রকাশের সাহায্যে। ভালবাসা দিয়ে, বাঞ্ছিত ব্যবহারকে উৎসাহিত করে, তাদের বোঝাতে হবে যে তারা প্রত্যেকে এক একজন অনন্য স্বাধীন সত্তা। তাহলেই মনের অসুখ সারবে। অসুখ সারে ধীরে ধীরে। কেবল মনঃস্তত্ত্বের বইয়ের পাতাতেই অসুখ সেরে যায় নাটকীয় ভাবে দ্রুতগতিতে। এই সব আলাদা ক্লাসগুলো দেওয়া হয় মানসিক কারণে। বস্তুতঃ এই ক্লাসগুলোকে ছেলেমেয়েরা শুধু যে স্বাগত জানায় তাই নয় কখনো কখনো দাবীও করে এই বিশেষ ক্লাসগুলোর। তবে কেউ অনিচ্ছা প্রকাশ করলে সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়।

শাসন কিন্তু সামারহিলে দরকারী বলে অনুমোদিত। এখানে সকলের ব্যক্তি-স্বাধীনতা স্বীকৃত কিন্তু গোষ্ঠীর সকলের অধিকার স্বীকৃত হওয়ার দরুন সামাজিক স্বাধীনতা কারো নেই। শিশুকে অবশ্য সর্ব্বদা নিজের ইচ্ছানুযায়ী যা ইচ্ছা তাই করতে দেওয়া হয় না কেননা তার নিজের রচিত নিয়মের নিগড়ে সে বাঁধা। স্কুলের সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য শাসন আছে তবে সেটা স্বায়ত্ত

শাসন। তাদের স্বায়ত্তশাসনে শাসনকর্তা নিজেরাই, ওপর থেকে কোন নির্দ্দেশ না নিয়ে নিজেরাই নিজেদের সামাজিক জীবন পরিচালনা করবার জন্য তাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এই স্বায়ত্তশাসনতন্ত্রের কাজ হবে আইন প্রণয়ন এবং নিজেদের সংঘের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোচনা করা, পুলিসী শাসন এর কাজ নয়। তাছাড়া আইনগুলো, মূল ব্যাপারগুলো সম্বন্ধেই মাত্র খাটবে, খুঁটিনাটি অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার সম্বন্ধে নয়।

প্রত্যেক টার্ম আরম্ভ হওয়ার আগে 'মত দানে'র দ্বারা পাঁচজন শাসনতন্ত্রের কর্মকর্তা নির্ব্বাচিত হবেন। এই 'মুখ্য পঞ্চ' হবেন উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা। প্রথমে জনপ্রিয় সদস্যেরা নির্বাচিত হলেও ক্রমে ক্রমে তারা শান্ত কার্য্যক্ষম ছেলেদের জায়গা ছেড়ে দেবে। তাদের একটা প্রধান কাজ হবে বাইরে স্কুলের সুনাম রক্ষা করা। তাদের একধরণের মন্ত্রীসভা থাকবে যারা সব রকম দোষক্রটি অপরাধ ও নিয়মভঙ্গের বিচার করবে এবং জুরী হয়ে শাস্তি বিধান করবে। তারপর এক সাধারণ জনসভায় প্রতি শনিবার রাত্রে একজন সভাপতি অকুস্থলেই নিযুক্ত হবেন। মন্ত্রীসভা, বড়দের কোন উপদেশ না নিয়ে, সভায় তাদের বিধান দেবে। জনসভার কিন্তু সে বিধানগুলোকে সমর্থন, বর্জ্জন বা পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা থাকবে। এ ছাড়া মন্ত্রীসভার ক্ষমতা প্রায় অসীম। এমন কি স্কুল থেকে কোন ছাত্রের বহিষ্কার পর্য্যন্ত তারা করতে পারে। যদিও এ প্রকার শাস্তি খুব কমই দেওয়া হয় তবে নীল বলেছেন দুয়েকবার এ ধরণের বহিষ্কার তিনি করেছেন তবে সেই সব ছেলেদের জন্য পূর্ব্বাহ্নেই বিকল্প জায়গা খুঁজে দেওয়া হয়। তবে তার আগে অবশ্য মনঃস্তাত্ত্বিক উপায়ে তাকে সাহায্য করার প্রচুর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। গুণ্ডামী চুরী ইত্যাদির জন্য মন্ত্রীসভা ও সাধারণজনসভায় বিচার হয় এবং যথাযোগ্য শাস্তি দেওয়া হয়। ছোটখাটো দোষক্রটিতে জরিমানার ব্যবস্থা থাকে। নিজেদের সৃষ্ট এই গণতন্ত্রের ওপর শিশুদের বিস্ময়কর নিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। কোন অপরাধী তার সহপাঠীদের শাসনের প্রতিবাদ জানায় না এবং সংঘ ও অপরাধী দুয়েই শাসনতন্ত্রের বিধান মেনে নেয়।

নীল বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে শিক্ষাপদ্ধতি হিসেবে স্বায়ত্ত শাসনের মূল্য অপরিসীম এবং সাপ্তাহিক একটি সাধারণ সভার মূল্য এক সপ্তাহব্যাপী স্কুল পাঠক্রম পড়ানোর চেয়ে বেশী। তিনি বিশ্বাস করেন যদি সমস্ত বিদ্যালয়ে এমনি 'প্রকৃত' স্বায়ত্তশাসনতন্ত্র থাকতো (যেখানে ছাত্রদের দিয়ে শুধু মাত্র নোংরা পুলিসী শাসনকার্য্য চালানো হয় না) তবে আমরা এমন একটি নতুন প্রজন্ম

পেতাম যারা জনজীবনে উচ্চতম নৈতিক বোধ নিয়ে আসতো। তাছাড়া 'ভদ্রতা বোধ' অর্থ যদি হয় অপরের জন্য চিন্তা ও বোধ করা, তবে এমনি স্বায়ত্তশাসন থেকে ভদ্রতাবোধ জন্মাতো কেন না এই শাসনব্যবস্থায় সর্ব্বদাই ছাত্ররা অন্যের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে একটি অবস্থাকে বিবেচনা করতে শেখে।

তিনি আরো বলেন 'শেখা'র বাস্তবিক কোন মূল্য নেই, সত্যিকার যার মূল্য আছে তা হচ্ছে চরিত্র গঠনের। কাজেই তিনি ছাত্রদের শেখা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ দেখান না। তিনি ও তাঁর শিক্ষকরা নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়েও মাথা ঘামান না কেননা তাঁরা ছেলেদের 'শিক্ষণ' দেওয়াতে আগ্রহী নন। পরীক্ষা সম্বন্ধেও তাঁদের প্রকাশ্য বিরাগ আছে। এদের মতে বইপুস্তকেরও সামান্য মূল্য আছে। এগুলি স্কুলের সাজসরঞ্জামের মধ্যে সবচেয়ে কম দরকারী, শুধুমাত্র গ্রন্থকীটরাই বলবেন বইয়ের থেকে পড়া মানে শিক্ষা পাওয়া। সামারহিলে শিক্ষা দেওয়া হয় তারজন্য, শ্রেণীঘরে উপস্থিত থাকা আবশ্যিক নয়। বাস্তবিক পক্ষে ঐ স্কুলে যথেষ্ট পড়াশোনা হয় এবং প্রতি ক্লাসেই অনেক কাজ হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পড়াশোনাকে শিল্পঘর, কুমোরের ঘর, কাঠের ও ধাতুর কাজের ঘরের সৃজনী কাজের চেয়ে কম মর্য্যাদা দেওয়া হয়। কেন না এখানে ছাত্ররা, যে যাতে আগ্রহী সে তাই করতে পায়। এমন কি, পড়াশোনা সাধারণ খেলাধূলার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ। অভিনয়কে সৃজনী শক্তির মাধ্যম হিসাবে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেই নাটকগুলি লেখেনও ছাত্র ও শিক্ষকরা। এমন কি সেক্সপীয়রের নিজের লেখা নাটকের চেয়ে তাঁকে নিয়ে লেখা ছাত্র বা শিক্ষকদের নাটকের আদর এই স্কুলে বেশী।

সামারহিলে স্বভাববাদের এই ব্যবহারিক পরিকল্পনাতে দেখা গেছে ছেলেরা স্বাধীন পরিবেশে বেশ স্বয়ংনির্ভর হয়ে বেড়ে উঠছে। অন্যের প্রতি শিষ্টাচার ও মমত্ববোধও তারা আয়ত্ত করে। এই স্কুলের ছাত্রদের শারীরিক স্বাস্থ্য অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছাত্রদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর; বুদ্ধি, স্বাভাবিক রুচি ও মানবিক গুণেও তারা শ্রেষ্ঠ। এখানে নানারকম হাতের কাজ ও শিক্ষার মাধ্যমে শিশুর সৃজনী প্রতিভাকে কাজে লাগানো হয়।

স্বভাববাদী এই আদর্শ বিদ্যালয়কে সামনে রেখে, স্বভাববাদের গুণাগুণের খতিয়ান নেওয়া যাক্। এতে কোন সন্দেহ নেই যে আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সব নতুন ও বিশেষ কার্য্যকরী শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছে তাদের সকলেরই

মূল, স্বভাববাদে। সমস্তগুলিই শিশুকেন্দ্রিক। শাসন ও শৃঙ্খলাতেও সম্পূর্ণ নতুন ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন হয়েছে স্বভাববাদ হতে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুস্বভাবের ওপর শিক্ষার পদ্ধতি, করণ ইত্যাদি রচিত হওয়া উচিত এ দৃষ্টিভঙ্গী যেমন মূল্যবান তেমনি বিতর্কমূলক। ভাববাদীরা বলবেন শিশুকে তার জীবনের প্রাথমিক আদিম স্তরে ফেলে রাখা উচিত নয়। শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শের বিষয়ে, স্বভাববাদী সকলকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। স্বভাববাদে "পৃথিবীর যা কিছুর স্বকীয় মূল্য আছে অর্থাৎ শুধু উপকরণ হিসাবেই যার মূল্য নয়, তাই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যেটা উপযোগী (useful) যেটা জীবন্ত প্রাণীর কোন না কোন স্বার্থ সিদ্ধ করছে, জীবনসংগ্রামে সেইটিই যেন সর্বব্যাপী মূল্য হয়ে টিঁকে যাচ্ছে"। স্বভাববাদীর দৃষ্টিভঙ্গী হতে তাই শিক্ষার কোন উর্দ্ধমুখী আদর্শ চয়ন করা যায় না। চরম স্বভাববাদে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশকে এত মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে যে কোন প্রকার বাধা বা হস্তক্ষেপ সেখানে চলবেনা। অবশ্য যদি বর্তমান প্রকৃতি উত্তম হয়ে থাকে তবে তো বিদ্যালয় আর শিক্ষক সবই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তবে দেখা যায় চরম স্বভাববাদ সমস্ত শিক্ষার ধারণাকে বাতিল করে দেয় কাজেই তাকে অগ্রাহ্য করে বরঞ্চ স্বভাববাদীরা একজন শিক্ষক নিয়োগ করবার পক্ষপাতী। তা হলেও এটা অস্বীকার করা যায় না যে স্বভাব-বাদের প্রধান ঝোঁক হচ্ছে বর্তমান ও অতিনিকট ভবিষ্যতের ওপর—দূর লক্ষ্যকে সম্পূর্ণভাবে অপ্রত্যক্ষ করে দেওয়া হচ্ছে এখানে, মোটামুটিভাবে লক্ষ্য দাঁড়াচ্ছে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান। সেই লক্ষ্যে তো বন্য মানুষ পূর্ণভাবেই পৌঁছে গেছে কিন্তু তার বৌদ্ধিক, শৈল্পিক ও নৈতিক সম্ভাবনাগুলো যে অপূর্ণ থেকে গেল?

অবশ্য প্রকৃতি বলতে কি অর্থ বোঝাচ্ছে তা স্পষ্ট হওয়া দরকার। এখানে মানুষের আন্তবপ্রকৃতির কথাই বলা হয়েছে, বহিপ্রকৃতির কথা তত নয়। অবশ্য স্বভাববাদ ধরে নেয় যে মানুষের প্রকৃতি কিছুটা জান্তব, তার ক্ষুধা, সহজাত প্রবৃত্তি, প্রাথমিক আবেগ তার জন্তু-প্রতিবেশীর সঙ্গে এক। কাজেই মানুষের উর্দ্ধতর আত্মিক প্রকৃতিকে স্বভাববাদ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য না করলেও অনেকটা উপেক্ষা করেছে। অবশ্য কোন কোন স্বভাববাদে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকেও মনুষ্য চরিত্রের অবশ্যম্ভাবী অঙ্গ বলে মেনে নিতে পারতো। তাতে করে আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে জৈব প্রকৃতির সঙ্গে মেলানো গেল না বলে সম্পূর্ণ ছাঁটাই করতে হয় না। তারা বলতে পারতো যে মানুষের আদর্শ মূল্য ইত্যাদিও তার প্রকৃতিরই

অংশ এবং তার উচ্চতর ও নিম্নতর দুরকমের প্রকৃতিই 'স্বাভাবিক', তেমন স্বভাববাদের সঙ্গে ভাববাদের নৈকট্য থাকতো। এবং যেটুকু দূরত্ব থাকতো তাকে মেলানো অসম্ভব হত না। কিন্তু স্বভাববাদের যেই রূপটী সাধারণভাবে গ্রাহ্য তাতে দেখা যায় তার মধ্যে অসম্পূর্ণতার দোষ রয়েছে, যেটা ভাববাদ দিয়ে পরিপূরণ করা দরকার। অবশ্য বিবেকবান স্বভাববাদীরা, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানতে এ ধরণের ভুলের শুদ্ধি করার চেষ্টা করেছেন। শিশুরা যেমন তেমনভাবে বিকশিত হ'ক এই কথাটায় সন্তুষ্ট না থেকে তাঁরা বলেন যে তারা যেন একটা অস্পষ্ট লক্ষ্যের দিকে বিকশিত হয়। ভাববাদীই শিক্ষার পরিস্কার সন্তোষজনক লক্ষ্যের ধারণা দিতে পারে তাই সত্যিকার দিক্‌দর্শন ভাববাদের সাহায্য নিয়ে কেমন করে হতে পারে পরের অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাবো।

অতিরিক্ত পাঠসূচী

অ্যাডাম্‌স্। ইভল্যুশন অব এডুকেশনাল থিয়োরী। নবম অধ্যায়।

কল্ডওয়েল কুক। দ্য প্লে ওয়ে।

ক্রীচন মিলার। দ্য নিউ সাইকোলজি এ্যাণ্ড দ্য টিচার।

কারী। দ্য স্কুল।

গ্রীন। সাইকোঅ্যানালিসিস্ ইন দ্য ক্লাসরুম।

" দ্য ডে ড্রীম

" দ্য মাইণ্ড ইন্ অ্যাকসন্।

ম্যাকমান। দ্য চাইল্ড্‌স্ পাথ টু ফ্রীডম।

মনরো। এ টেক্সটবুক ইন দ্য হিস্ট্রী অব এডুকেশন। দশম অধ্যায়।

মন্তেসরি। দ্য মন্তেসরী মেথড।

" দ্য এ্যাডভান্সড্ মন্তেসরী মেথড্।

নীল। এ ডমিনিস লগ।

" দ্যাট ড্রেডফুল স্কুল।

নান। এডুকেশন ইট্‌স্ ডাটা অ্যাণ্ড ফার্স্ট প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়।

অ্যাডাম্‌স্। মডার্ণ ডেভেলপমেণ্ট্‌স্ ইন প্র্যাকটিশ। প্রথম, নবম ও দশম অধ্যায়।

রুশো। এ মিল
রাস্ক। দ্য ফিলসফিক্যাল বেসিস অব এডুকেশন। দ্বিতীয় অধ্যায়
শ। ব্যাক টু মেথুশেল।
টমাস অ্যাণ্ড ল্যাঙ্গ -প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব মডার্ন এডুকেশন। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়
ওয়াটস। এডুকেশন ফর সেলফ রিয়ালাইজেশন অ্যাণ্ড সোস্যাল সারভিস।

পঞ্চম অধ্যায়।

শিক্ষায় ভাববাদ।

দর্শনে ভাববাদের ইতিহাস দীর্ঘ এবং তার প্রাচীন ও আধুনিক নানা রকমের রূপ আছে। বস্তুতঃ এটি একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী। এ শুধুমাত্র কতগুলি বাঁধাধরা অনড় বিধির সমষ্টি নয়, দর্শনের মত শিক্ষাক্ষেত্রেও ভাববাদের নানারকম রূপ দেখা যায়। শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার প্রতি এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ভাববাদীরা শিক্ষার করণ ইত্যাদি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা এতে নেই। শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি হতে ভাববাদকে অনুধাবন করা যাক্। শিক্ষাতত্ত্বের ভিত্তি রচনায় এই দর্শনের অসীম গুরুত্ব ভালো করে বোঝা বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্ত প্রকার মূল্যবান প্রচেষ্টার জন্য ভাববাদের সাহায্য খোঁজা হয়েছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দর্শনের বিতর্কজাল দূরে সরিয়ে রেখে ভাববাদের মৌলিক সূত্রগুলোকে অনুধাবন করা যাক্। দেখা যাবে শিক্ষার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি স্থির করার চেয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ণয়ে ভাববাদের অবদান বেশী।

ভাববাদীরা বলেন একমাত্র ভাব (ideas) বা ধারণা সত্য। মন বা আধ্যাত্মিক শক্তি জড়বস্তু হতে অনেক বেশী সত্য ও মূল্যবান। আমাদের সঙ্গে যে দুই জগতের আদানপ্রদান চলে, জড় জগৎ ও অভিজ্ঞতার জগৎ, তার মধ্যে দ্বিতীয়টিই পারমার্থিক সত্তার বেশী অন্তরঙ্গ। পারমার্থিক সত্তার রূপ জড় নয়—চিণ্ময়। শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব বিষয়গুলি মানুষের সম্বন্ধে জ্ঞান দেয় অর্থাৎ মানবশাস্ত্র (Humanities) অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান হতে শিক্ষার পক্ষে অনেক বেশী মূল্যবান। মনের যে কোন রূপ মানব অভিজ্ঞতা-পুষ্ট সংস্কৃতি, শিল্প, নৈতিকতা, ধর্ম্ম, মনের উপাদানে তৈরী বলে পারমার্থিক সত্তার অন্তরে প্রবেশ করতে পারে কেননা পারমার্থিক সত্তাও বিশাল এক মন। বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান সেই মনের মধ্যে অবাধ প্রবেশ করতে পারে না। তাই শিল্প সাহিত্য চর্চা দিয়ে মানুষ সেই সত্তার অন্দরমহলের যে রূপটি দেখতে পাবে বিজ্ঞানচর্চার দ্বারা তা হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য বিজ্ঞানচর্চাও মন দিয়েই সম্ভব। সেভাবে দেখতে গেলে সমস্ত বিদ্যাচর্চা মনেরই অবদান। জগৎটাকে বিজ্ঞানীরা যখন নানাভাবে

পরিদর্শন করেন—সেটা করেন মনের সাহায্যে কাজেই পৃথিবী মন দিয়ে সৃষ্ট বল্লে ভুল হয় না। এমন কি প্রখ্যাত আঙ্কিক বিজ্ঞানী স্যর জেম্‌স জীন্‌স্‌ জগৎকে এ আঙ্কিক ধারণা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এই বর্ণনা, জগৎ একটি মনোময় সত্তা, এই ধারণাকে সমর্থন করে। অবশ্য সাধারণ ভাবে পদার্থবিজ্ঞানী নিজেকে যথাসম্ভব তার থেকে সরিয়ে রাখেন ও তাঁর অনুসন্ধান অভিজ্ঞতার জগৎ সম্বন্ধে না চালিয়ে জড়জগতেই সীমাবদ্ধ রাখেন।

যদি অভিজ্ঞতার জগৎ, বহির্জগৎ অপেক্ষা বেশী মূল্যবান হয় তাহলে মানুষের মন জগতের আর সব কিছুর চেয়ে বেশী মূল্যবান কারণ মনই জ্ঞাতা, মনই অভিজ্ঞতার কর্তা। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস একথা বহুদিন আগেই বলেছিলেন। আরেকজন প্রাচীন ভাববাদী সমস্ত বিশ্বজগতের আকাশ বাতাস গ্রহ নক্ষত্র হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে মানুষকেই পর্য্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিলেন যে মানুষ স্বর্গের খুব কাছাকাছি—শুধুমাত্র দেবদূতদের চেয়ে একটু নীচে মাত্র। সে সম্মান ও মর্য্যাদায় ভূষিত এবং ঈশ্বরের অন্যান্য সমস্ত কর্মের ওপরেই তার প্রভুত্ব। মানুষের আত্মিক শক্তি ও তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের ওপর এই মর্য্যাদা আরোপ হচ্ছে ভাববাদের সার কথা।

বিখ্যাত ভাস্কর রদাঁর গড়া 'ধ্যানমগ্ন মানুষের' অনুপম ভাস্কর্য্য যেমন মানুষের চিন্তাশীল স্বভাবের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ভাববাদী দর্শনও মানুষের চিন্তা করার ক্ষমতাকে জগতের এক অপূর্ব্ব বস্তু বলে ধরে নেয়। সে যেন সর্ব্বোত্তম প্রাণীদের চেয়েও এক ভিন্ন ধরণের সত্তা। তবে বিবর্তনবাদকে সব ভাববাদীরা অস্বীকার করে না। তবে জীববিদ্যা মানুষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী বলে যে বিবরণ দেয় তাকে এঁরা অসম্পূর্ণ বলে মনে করেন। যে সব ভাববাদীরা বিবর্তনে বিশ্বাসী তাঁরা বলেন বিবর্তনের উৎস এমনকি ক্রমিকপরিণতির পর্য্যায়গুলি অপেক্ষা বিবর্তনের অন্তিম লক্ষ্য অনেক বেশী তাৎপর্য্যপূর্ণ। সুতরাং মানুষ প্রাথমিক অবস্থায় কি ছিল তা এঁদের ভাববার বিষয় নয়। উন্মেষার্থ বিবর্তনে (emergent evolution) যাঁরা বিশ্বাসী সেই ভাববাদ বলে যে ক্রমবিবর্তনের ফলে আগে যা ছিল না, তা বিকশিত হচ্ছে। হয়তো বা অকস্মাৎ কোন নতুন মূল্যবোধের বা আদর্শের জন্ম হচ্ছে। বিবর্তনের সমস্ত গতিই হয়তো পারমার্থিক সত্তার অন্তরে নিহিত চরমতম মূল্যের উপলব্ধির দিকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হওয়া। স্বর্গের নন্দনকানন হতে মানুষের নির্ব্বাসনের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে ভাববাদীরা বল্লেন যে কোন এক সময় মানুষ পরিপূর্ণ আদর্শের অবস্থায় বিকশিত ছিল।

তারপরে তার পতন হয়। তাই বাইবেলের গল্প হচ্ছে সেই উন্নততর পরিপূর্ণাবস্থার স্তরে মানুষের আরোহণের চেষ্টা। এই উত্তরণের কতগুলি ধাপ আছে। একটি উঁচু ধাপ হলো মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের স্তর। যখনই মানুষ ভাল ও মন্দের বিচার করতে শেখে তখন সে দেবপ্রতিম হয়ে দাঁড়ায়, মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি দিয়ে সে শ্রেয়ঃনীতিকে পেতে শেখে। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান নয়। এই মূল্যগুলির পূর্ণ উপলব্ধি হচ্ছে বিবর্তনের অন্তিম লক্ষ্য। অবশ্য ভাববাদীরা বলবেন মানুষের পরিবেশ হচ্ছে তার উচ্চতম মূল্যবোধ এবং তার সঙ্গে মিলনেই তার স্বধর্ম।

স্বভাববাদীরা মানুষের যে জৈবিক রূপকে প্রাধান্য দেয় ভাববাদীর কাছে তার বিশেষ মূল্য নেই, সেটা মানুষের খণ্ডাংশ মাত্র। মানুষের জান্তব উৎপত্তি দিয়ে তাকে জানা যাবে না। মানুষের চিন্ময় সত্তা তার প্রকৃত সত্তা। জৈবিকতার জগৎ অকিঞ্চিৎকর, আধ্যাত্মিকতা প্রকৃত সত্য। মানুষের চিন্ময়, আধ্যাত্মিক সত্তা তার একটি অতিরিক্ত গুণ নয়। এটিই তার মূল স্বভাব, সত্তা।

মানুষের ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা ও মূল্য ভাববাদে বিশেষভাবে স্বীকৃত। এঁরা মনে করে মানুষের ব্যক্তিত্ব অমূল্য কেননা এ হচ্ছে ঈশ্বরের সর্ব্বোত্তম সৃষ্টি। খ্রীষ্টধর্মে এই মতের প্রকাশ এভাবে—ঈশ্বর মানুষকে নিজের আদলে গড়েছেন[১] কাজেই শিক্ষাতে সবচেয়ে বড় আদর্শ হল মানবব্যক্তিত্বের গৌরব ঘোষণা (exaltation of personality), এবং আত্মোপলব্ধি অর্থাৎ সম্ভাবনাকে বাস্তব করে তোলা। শিক্ষার লক্ষ্য মানুষের অন্তর্লীন সম্ভাবনাকে পরিস্ফুট করা ও মানুষের সত্যকার অমৃতরূপের উন্মোচন। প্লেটোর অনুগামী ভাববাদীদের মতে বিশ্বের মধ্যে মানবচরিত্র সবচেয়ে সুসম্বদ্ধ সৃষ্টি। এই সুসম্বদ্ধ ব্যক্তিত্ব মানুষের জৈবিক সত্তা নয় এবং সেই ব্যক্তিত্ব অর্জন মানুষের সবচেয়ে জরুরী লক্ষ্য। প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য নিজের মহত্তম পরিপূর্ণতম সত্তাকে জানতে পারা ও তাকে লাভ করা। এতে অধিকারী ভেদ নেই। ভাববাদী দর্শনের এই রূপ থেকে ''সার্ব্বজনীন শিক্ষার' আদর্শটি পাওয়া গেল।

রাস্ক তাঁর বই দ্য ফিলসফিক্যাল বেসেস্ অব এডুকেশনে খুব সুন্দর ভাবে

১। বেদে ও উপনিষদে একই বার্তা পাই। মানব ঈশ্বরের সন্তান—অমৃতস্য পুত্রাঃ। সেই অমৃতত্বের কথা জানতে পারলেই মানুষের চরম উত্তরণ। এই জগৎ পারাবারের কূলে অমৃতের সন্তান মানুষের খেলাঘর। কিন্তু একসময় সসীম মানুষ অসীম হয়ে উঠতে চায়। সমস্ত সৃষ্টি বৃহতের দিকে, ভূমার দিকে সম্পূর্ণ হওয়ার দিকে অবিশ্রান্ত চলছে। এই হচ্ছে ভারতীয় ভাববাদের মূল কথা।

বল্লেন আজকের দিনের মানুষ তার জড়পরিবেশ সম্বন্ধে খুব সচেতন অথচ তার নিজের অন্তরনিহিত সত্তার ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। তিনি পরিবেশকে দুভাগ করে বল্লেন, একটি পরিবেশ জড় ও প্রাকৃতিক, দ্বিতীয় পরিবেশ মানসিক ও সাংস্কৃতিক। রাস্ক লক্ষ্য করছেন যে এই দুই পরিবেশের সম্বন্ধে মানুষ আর অন্য প্রাণীর দৃষ্টিভঙ্গিতে মৌলিক পার্থক্য আছে। অন্য প্রাণীরা তাদের জড় পরিবেশকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করে নিয়েছে কেন না সেই পরিবেশ পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা তাদের নেই। হয় তারা সেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে অথবা লুপ্ত হবে, মানুষ কিন্তু ততটা অসহায় নয়। জড় পরিবেশকে সে অপরিবর্তনীয় বলে মানে না। তার সৃজনীশক্তি ও কুশলতা দিয়ে সে পরিবেশকে নিজের প্রয়োজন মত বদলে নিতে পারে। সে নিজের প্রয়োজন মত তাকে পরিবর্ত্তিত করে, এবং ইচ্ছামত কৃত্রিম পরিবেশ রচনা করে নিতে পারে। কাজেই স্বভাববাদীদের মত অনুযায়ী পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার তার কোন দরকার নেই। যে কোন প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত মানুষের সৃজনীপ্রতিভার বিকাশ করা যাতে সে তার পরিবেশ ও জড় বস্তুর ওপর নিজের প্রভূত্ব বিস্তার করতে পারে। অন্ততঃ যাতে কৃত্রিম পরিবেশ তৈরী করার মত শক্তি অন্ততঃ তার লাভ হয়, কমপক্ষেও শিক্ষার লক্ষ্য হবে সেইটি।

তবে ইতর প্রাণীও যে প্রাকৃতিক পরিবেশকে কিছুদূর পরিবর্তিত করতে পারে সে কথা জীববিদ্যা থেকে জানতে পারা যায়, কিন্তু সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্বন্ধে মানবেতর ও মানব অবস্থার গভীরতর পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। মানবেতর জীবের জীবনে সাংস্কৃতিক পরিবেশ অনুপস্থিত। সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ মানুষের একার সৃষ্টি। তার সৃজন কর্মের ফল।[১]

ধর্ম, শ্রেয়ঃনীতি, কারুশিল্প, সাহিত্য, অঙ্ক, বিজ্ঞান ইত্যাদি মানুষের নৈতিক বৌদ্ধিক নান্দনিক কর্মের বহুযুগব্যাপী ফল। এগুলি প্রকৃত অর্থেই মানবশাস্ত্র (Humanities)। সংস্কৃতি ক্রমে বিবর্তিত হয়েছে। বহু মানসের ধারা এই সম্পূর্ণ সংস্কৃতির সাগরে মিলেছে। এখানে মানুষের ঐক্য রূপায়িত। মানুষের পরস্পরের সংযোগে সংস্কৃতি বর্ধিত হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক পরিবেশে সমস্ত মানুষের মিলিত উত্তরাধিকার। মানবমনই এই সংস্কৃতির স্রষ্টা, ধারক ও বাহক।

তাই মানুষকে সত্যিকার মানুষ হতে হলে নিজের চেষ্টায় ও শ্রমে সেই

১। রাস্ক। দ্য ফিলসফিক্যাল বেসেস্ অব এড্‌কেশন পৃঃ ৯৮।

সাংস্কৃতিক পরিবেশের উত্তরাধিকার আয়ত্ত করতে হবে। সংস্কৃতির পূর্ণকুম্ভে নিজের সাধনার আহুতি ঢালতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে প্রত্যেক মানুষকে, প্রত্যেক প্রজন্মকে এমন শিক্ষা দেওয়া যাতে সে সেই সাংস্কৃতিক পরিবেশে নিজের অবদান কিছু রাখতে পারে। ব্যক্তি এই মানব উত্তরাধিকারের অংশভাগী হতে গিয়ে নিজেকে আরো পূর্ণতর করে তুলবে, সুতরাং আবার আমরা আরেকটু বিশেষ ঐশ্বর্য্যময় 'আত্মোপলব্ধির আদর্শে উপনীত হলাম। সর্ব্বকালের এই মানব পরিবারের সদস্য হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এক অমূল্য উত্তরাধিকার অর্জন করেছে, যা অন্যান্য জড় সম্পত্তির মত ছিনিয়ে নেওয়া যাবে না। এই এক অক্ষয় সম্পত্তি সে নিজের শ্রমে সৃষ্টি করেছে।

সংস্কৃতিকে আত্মগত করতে হলে মানুষের নিজের কিছু অবদান রাখা দরকার যাতে প্রতি প্রজন্মেই সংস্কৃতি আরো ঐশ্বর্য্যবান হয়। এই সংস্কৃতির ঐশ্বর্য্যের যত বৃদ্ধি হয় শিক্ষার কাজ ততই জটিলতর হতে থাকে। এর নিদর্শন মধ্যযুগ হতে দেওয়া যাক্। সেকালে সপ্তবিদ্যা (seven arts) জানলেই মানুষকে সংস্কৃতিবান বলে গণ্য করা হত কিন্তু আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রও বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ্য বিদ্যার এক ভগ্নাংশও আয়ত্ত করতে পারে না। দিনে দিনে সংস্কৃতি বর্দ্ধমান। সুতরাং যোগ্যতর, আরো উত্তম শিক্ষার প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত না হলে সংস্কৃতিকে পরের প্রজন্মে পৌঁছে দেওয়া যাবে না। কিছু বর্জন ও নির্ব্বাচন অবশ্য প্রয়োজন। তাছাড়া মানুষের সংস্কৃতির রক্ষণ ও বর্দ্ধনের জন্য শ্রম বিভাগ করাও স্পষ্টভাবেই প্রয়োজন।

মানুষ কি সত্যি তার সাংস্কৃতিক পরিবেশ রচনা করে নাকি সে আবহমানকালব্যাপী এক সাংস্কৃতিক রাজ্যে বিনা আয়াসে প্রবেশ করে? উদাহরণ দিয়ে বলি, মানুষ কি সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে না সে তাকে শুধুমাত্র আবিষ্কার করে? প্লেটো ও তাঁর অনুগামীরা বলেন মানুষ শুধুমাত্র আবিষ্কর্তা, রচয়িতা নয়। সৌন্দর্য্য শুভ ও সত্য আবহমানকাল বিরাজিত। অবশ্য কিছু কিছু ভাববাদীর বিশ্বাস পারমার্থিক সত্তা চিরবিকাশমান। এই ভাবময় সত্তা ক্রম উন্মোচিত। মানুষ নিজেও এই বিকাশের কাজে সাহায্য করছে। দার্শনিক প্রশ্ন হচ্ছে যে মানুষ কি তার নৈতিক বৌদ্ধিক ও নান্দনিক কর্ম দ্বারা নিশ্চিতভাবে সেই সত্তাকে আরো ঐশ্বর্য্যযুক্ত করছে অথবা যা চিরন্তন সেই সত্তার ঐশ্বর্য্যের গভীরে অনুপ্রবেশ করে তাকেই ক্রমে ক্রমে আবিষ্কার করছে? প্লেটোর গতিহীন (static) ভাববাদ এই দ্বিতীয় মতই সমর্থন করবে যে মূল্য ও আদর্শদের অনুসন্ধান করে

পাওয়া যাবে। আগেই বলা হয়েছে গতিময় ভাববাদ মানুষকে স্রষ্টার ভূমিকায় পরিকল্পনা করে। অবশ্য মানুষ আদর্শের স্রষ্টা বা আবিষ্কর্তা যাই হোক্ না শিক্ষার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের বিশেষ কোন তফাৎ হবে না। প্লেটোর অনুগামী হলে শিক্ষা মানুষকে আরো গভীরভাবে আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করার জন্য তৈরী করবে। গতিময় উন্মেষার্থক ভাববাদের সমর্থকরা বলবেন শিক্ষা মানুষকে নিজের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক রাজ্যের পরিসীমা বাড়াতে সাহায্য করবে। যেভাবেই হ'ক মোট সাংস্কৃতিক জগৎ ক্রমেই প্রশস্ততর হচ্ছে।

অ্যাডামস্ জগৎসংসারের যুক্তিময়তার দিক দিয়ে ভাববাদের ধারণা আলোচনা করেছেন। আগেই দেখেছি ভাববাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বীকার্য্য হল জগতের যুক্তিযুক্ততা। অর্থাৎ সমস্ত বস্তুর কেন্দ্রে যদি একটি মনের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় এবং জগৎকে একটি মনের প্রক্রিয়া বলে ভাবা হয় তবে এও নিশ্চিত যে মানুষ ও সম্পূর্ণ জগৎই যুক্তি পরিচালিত। বিশ্বসংসার যেমন সুসম্বন্ধ নিয়মের রাজত্ব, মানুষও তেমনি স্বভাবতঃ যুক্তিনিষ্ঠ ও যুক্তির দ্বারা বোধগম্য।

অবশ্য বৈজ্ঞানিকরা ভৌতজগৎ সম্বন্ধে একথা আগেই বলেছেন ও বিভিন্ন আবিষ্কার দ্বারা এই স্বীকার্য্যের (জগৎ যুক্তিনিষ্ঠ) প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। কেননা বিজ্ঞানের জগতে প্রতিটি ঘটনা কার্য্যকারণের সূত্রে আবদ্ধ, যে কোন ঘটনা যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব। কোন ঘটনার ফলে কি ঘটবে তাও বিজ্ঞানের সূত্র দিয়ে ঘটনার পূর্ব্বেই জানা যায়। কিন্তু জড়জগৎ ছেড়ে শ্রেয়ঃ-নীতির জগতে প্রবেশ করলে এই যুক্তিনিষ্ঠতার ধারণা বজায় রাখা কিছুটা কঠিন হয়ে পড়ে। ভাববাদী এই প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করতে পারেন না কেননা তিনি নিজেও সেই জগতের বাসিন্দা এবং জগৎটি ছেড়ে বাইরে এসে বস্তুনিষ্ঠভাবে তাকে দেখার সাধ্য তাঁর নেই, কিন্তু ভৌত জগতে অনিয়ম থাকলে বিজ্ঞান যেমন মিথ্যা হয়ে যাবে তেমনি শ্রেয়ঃনীতির রাজ্যে অরাজকতা থাকলে দর্শনও মিথ্যা প্রমাণিত হবে। ভাববাদীরা তাই আধ্যাত্মিক রাজ্যে নিয়মের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন।

ব্রাউনিংয়ের কবিতা "স্বর্গে র'য়েছে ঈশ্বর এবং সব কিছুই র'য়েছে ঠিকমত এ সংসারে" (God's in His heaven—all's right with the world), ভাববাদীদের মনের কথা। কিন্তু কাবো কারো মতে এ ধারণা হচ্ছে অতি আশাবাদী ও আত্মসন্তোষে ভরা। লাইব্নিজের মন্তব্য 'এই সেরা জগৎটিতে সব কিছুই সেরা (All is for the best in the best of all possible

worlds)" একই জাতীয় নির্বিচার আত্মসন্তুষ্টির অবস্থা। কিন্তু যা কিছু ঘটছে, সবই ভাল এই মতটিকে 'নির্জলা' গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। যীশুখ্রীষ্ট তাঁর জীবনের অন্ধকারতম মুহূর্তে আরেকটি গভীর বাণী উচ্চারণ করেছেন "এই পৃথিবীতে তোমাদের আরো কষ্টের পরীক্ষা আসবে। ভরসা হারিওনা কেননা আমি সেই কষ্ট উত্তীর্ণ হব।"[১] এখানে একটু ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে ভাববাদীদের নিরঙ্কুশ সরল আশাবাদী হওয়ার দরকার নেই। তাঁরা স্বীকার করতে পারেন যে পৃথিবীতে সততা সুখ পুণ্য ইত্যাদির সঙ্গে দুঃখ কষ্ট অন্যায় ও পাপাচার আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের শ্রেয়ঃনৈতিক বোধের উপর বেশি জোর দেন। কেন না এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে তার অন্যায়কে বর্জন করে শুভকে বরণ করার শক্তি আছে। নিকট থেকে দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখি জগৎ যেন এক উদ্দেশ্যের দিকে বিকশিত। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি বিশ্ব পরিপূর্ণ শৃঙ্খলার দিকে এগিয়ে চলেছে। কাজেই শিক্ষা হল মানুষের এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রচেষ্টা।

মানুষ এই বিশ্বের অন্তরে আরেকটি ক্ষুদ্র জগৎ। তার অন্তরে রয়েছে সুশৃঙ্খল ঐক্যের দিকে অগ্রসর হবার ঝোঁক। প্রাণী হিসেবে তার ভিতরে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সূত্র লক্ষ্য করা যায়। তার সমস্ত ক্ষমতা বুদ্ধি মেধা ইচ্ছা স্মৃতি কল্পনা সবই সেই একমুখী। ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি এক হয়ে ক্রমবিকশিত হচ্ছে। মানুষ তো শুধু বৃদ্ধি পায়না সে পরিণত হয়। স্বভাববাদীরা একথা সমর্থন করবেন কিন্তু মানুষের বিকাশের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এঁরা ভাববাদীদের সঙ্গে ভিন্নমত, ছিন্নপথ। প্রাণীর বৃদ্ধি বলতে যদি বুঝি "এক পরিণত 'আকারের' দিকে প্রাণীর স্বনিযুক্ত যাত্রা, কারণ সেই পরিণতির জন্য তার আছে অন্তর্নিহিত আগ্রহ",[২] তবে স্বভাববাদীরা 'আকার' বলতে বুঝবেন পূর্ণতর প্রাণী দেহ ও তার কার্য্যাবলী কিন্তু ভাববাদীরা বুঝবেন পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিক রূপ।

আরেকটি কথা। শিশু যদি নিজের তাগিদেই সম্পূর্ণতার দিকে বিকশিত তবে আর সেখানে শিক্ষকের প্রয়োজন কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর স্বভাববাদী ও ভাববাদীরা দুরকম ভাবে দেন। স্বভাববাদীরা শিক্ষকের উপস্থিতি নিতান্ত অনিচ্ছুক ভাবে শর্তসাপেক্ষ স্বীকার করেন। এঁরা মনে করেন 'শিশু যদি স্বর্গের অধিবাসী হয়, তবে বয়স্ক শিক্ষক অন্যরকম কোন জায়গার অধিবাসী'। শিশুর

১। জন। XVI 33.
২। অ্যাডামস্। এভল্যুশন অব এড্‌কেশনাল থিয়োরী পৃঃ ২৮৪.

পবিত্রতার জ্যোতি যে সমাজের আবহাওয়ায় ম্লান হয়ে যায় তার কারণ শিক্ষকের সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হস্তক্ষেপ।

কিন্তু ভাববাদীরা শিক্ষক সম্বন্ধে এমন অকরুণ মত পোষণ করেন না। অ্যাডাম্স্ স্মরণ করিয়ে দেন যে শিক্ষকও একদা শিশু ছিলেন সুতরাং তিনিও স্বর্গের পবিত্রতার উত্তরাধিকারী। তিনিও যুক্তিচালিত বিশ্বের একটি অঙ্গ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই এক বৃহত্তর সমষ্টির অঙ্গ। বৃহত্তর বিশ্বসংসারে সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার মধ্যে দুজনেই নিজের নিজের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছেন এবং নিজস্ব দায়িত্ব পালন করছেন। দুজনের মধ্যে সম্বন্ধটা হচ্ছে এরকম—শিক্ষক শিক্ষার্থীর পরিবেশের একটি অঙ্গ। তাঁর কাজ হবে শিক্ষার্থীকে পরমসত্তার কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং শিশুর নিজের পূর্ণ বিকাশ।

বোধ হয় ফ্রোয়েবলের শিশু উদ্যানের পরিচিত উপমা দিয়ে ভাববাদী শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে বোঝানো যাবে। বিদ্যালয় যেন এক উদ্যান, শিশু সেখানে সুকুমার চারাগাছ ও শিক্ষক সেই বাগানের সতর্ক মালী। অবশ্য চারাগাছ অন্যের সাহায্য ছাড়াই বাড়বে ও নিজের আকার ধরবে। যদিও সব চারাগাছই নিজের স্বভাবের নিয়মে বাড়বে এবং একটি বাঁধাকপি কিছুতেই গোলাপ ফুল ফোটাতে পারবে না তবু মালীর একটা ভূমিকা আছে। ভাল মালী তার কুশলতা দিয়ে চেষ্টা করবে বাগানের বাঁধাকপি ও গোলাপ গাছেও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশের। যদিও তাকে ছাড়া চারাগাছের এতটা বৃদ্ধি সম্ভব হবেনা, তবুও বলা যায় অনুকূল অবস্থায় গাছ আপন স্বাভাবিক বৃদ্ধি লাভ করবে। স্বভাববাদীরা হয়তো বাড়ন্ত কাঁটাঝাড়েও সুখী কিন্তু ভাববাদীর চাই উত্তম গোলাপ। তাই শিক্ষক নিজের স্বভাবে বেড়ে ওঠা শিক্ষার্থীর এমন উৎকর্ষের জন্য চেষ্টা করবেন, যা, তাঁর সাহায্য বিনা সম্ভব হত না।

সুতরাং ভাববাদীর মতে সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধি (self realization) হল শিক্ষার চরম লক্ষ্য। অ্যাডাম্সের মতে শিক্ষার বহু আদর্শের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মোপলব্ধির আদর্শই ভাববাদীদের গৃহীত আদর্শ। ভাববাদী নানা রূপে এই আদর্শকে সমর্থন করেছে। স্বভাববাদ ও ভাববাদের পার্থক্যটুকু এই যে স্বভাববাদীরা বলেন শিক্ষার লক্ষ্য শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশ (self expression) ভাববাদ বলে আত্মোপলব্ধি। ভাববাদী আদর্শে আরেকটি জিনিষও স্পষ্ট যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক দুয়ে মিলে পারস্পরিক আদান প্রদানের ভিতর দিয়ে উভয়েরই আত্মোপলব্ধির কাজে সাহায্য করবে।

প্রাচীন ভারতীয় দর্শনে আত্মোপলব্ধি আসে নির্জ্জন ধ্যানে, আত্মমগ্নতায়—জনতার সঙ্গে সংযোগে নয়। পশ্চিমী ভাববাদীরা এখানে ভিন্নমত। রাস্ক জোর দিয়ে বলেন মানুষের উচ্চতর চরিত্র হচ্ছে সামাজিক। সামাজিক মানুষ পারমার্থিক সত্তার অংশ, মানুষ তার পূর্ণ আত্মোপলব্ধি ও বিকাশ সমাজের একজন অংশভাগী হয়েই করতে পারে। জগতের সর্ব্বজনের সাংস্কৃতিক জীবনে ভাগ নিয়ে ও নিজের অবদান যুক্ত করে মানুষ উচ্চতর আধ্যাত্মিক আদর্শে পৌছুতে পারে। ভাববাদীরা কয়েকটি আধ্যাত্মিক মূল্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী যেগুলি সার্ব্বিক (universal) ও সত্য (real)। এই মূল্যগুলির বাস্তব অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং তাদের চিরন্তন স্বভাব ও সর্ব্বজনীনতার দ্বারা ভাববাদ শিক্ষার সামাজিক আদর্শে গুরুত্ব আরোপ করে।

সক্রেটিস সত্যসন্ধানে সঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এই বলে যে দুই মনের মতৈক্য দ্বারা সত্যপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। তখন তিনি ভাববাদের একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞার কথা ধরে নিলেন যে সত্য চিরন্তন ও অপরিবর্তনীয়, তা ঘটনা ও কালের ওপর নির্ভরশীল নয়। বিভিন্ন মন একই তথ্য হতে শুদ্ধভাবে চিন্তা করলে একই সিদ্ধান্তে পৌছুতে বাধ্য। এবং একই ধরণের পরিস্থিতিতে ও এক মন বিভিন্ন সময়েও সেই এক সিদ্ধান্তে পৌছুবে। এ যেন বেলম্যানের কথা (লুই ক্যারলের চরিত্র) "আমি তিনবার যা বলব, তাই হচ্ছে সত্য।"[১]

এই মতৈক্য ঘটে কেননা সত্য সার্ব্বজনীন ও চিরন্তন। একই কথা শ্রেয়ঃ-নীতি সম্বন্ধে সত্য। শ্রেয়ঃনৈতিক আদর্শগুলিও বিভিন্ন মনের কাছেও একরকমই আবেদনময়। তাদের লাভ করার জন্যও মানুষ একই ভূমি থেকে অগ্রসর হয়। কাণ্ট শ্রেয়ঃনীতির সর্ব্বজনীনতা সম্বন্ধে তাঁর চরম নীতিবোধের তত্ত্বে (Categorical imperative, বল্লেন যে "স্ব ইচ্ছার অনুশাসন মেনে এমন ভাবে কাজ করতে হবে, যাতে (শুভ) ইচ্ছাকে সার্ব্বজনীন অমোঘ আইন বলে ধরে নেওয়া চলে।"[২]

ভাববাদের এই শ্রেয়ঃনীতিবোধের সামান্য ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কাণ্টের মতে good will বা অন্তরের নীতিবুদ্ধি, মানুষের স্বধর্ম। তাই মানুষ একে লংঘন করতে পারে না।"[৩]

১। লুই ক্যারল। দ্য হাণ্টিং অব দ্য স্নার্ক।

২। **So act that the maxim of thy will may always hold good as a principle of universal legislation. —Kant.**

৩। ইউকেন। লাইফ্স্ বেসিস অ্যাণ্ড লাইফস্ আইডিয়াল। পৃঃ ৩৭০

পূর্ব্বেই দেখেছি প্লেটোর ভাববাদে, একটি বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যে আধ্যাত্মিক মূল্য ও আদর্শগুলি শাশ্বত ও নিত্য। এরা ভাবসত্তা বা সারসত্তা (essences) যাদের সার্ব্বিক (universal) চরিত্র বিদ্যমান। সমস্ত ভাবসত্তার মিলনে 'পরম শুভ' (the Good) রচিত হয়েছে। জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে 'অসীমের সঙ্গে আন্তর সম্বন্ধ স্থাপন করা,' পরম শুভের অন্বেষণ ও ধ্যানের দ্বারা পারমার্থিক সত্তার অন্তরাত্মার সঙ্গে যুক্ত হওয়া। "শিক্ষার কাজ হচ্ছে চরম সার্ব্বজনীন আদর্শগুলির সন্ধান পেতে সাহায্য করা যাতে করে বিশ্বের সত্য আমাদের সত্য হয়ে ওঠে এবং আমাদের জীবনশক্তির সঞ্চার করে।"[১] এই পরম শুভর সার্ব্বিক চরিত্রের দরুণ, যে ব্যক্তিরা এর অন্বেষণ করবেন, তাঁদেরও আত্মার মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হবে। বিশ্বসত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলে পরস্পরের সঙ্গেও মিলন সম্ভব হবে। "আধ্যাত্মিক জীবনের অভিজ্ঞতা ও বিকাশ ব্যক্তিদের অন্তর্গূঢ়ভাবে সংযুক্ত করবে। ব্যক্তিদের অন্তিম উদ্দেশ্য, এই সার্ব্বজনীন জীবনের কারণ এক বিশেষ (আধ্যাত্মিক) চরিত্রযুক্ত হয়ে উঠবে।"[২] তাই ভাববাদের বিকশিত ব্যক্তিত্ব, অর্থাৎ যে ব্যক্তিত্ব নিজেকে পরিপূর্ণভাবে স্ফুটন করেছে, সে মানবজাতির মধ্যে বিভিন্নতার নয়, মিলনের মূলতত্ত্ব, কাজেই ভাববাদীর পূর্ণ আত্মোপলব্ধির আদর্শ সামাজিক হিতের আদর্শকে পূর্ণভাবে সমর্থন করছে। শিক্ষক তার ছাত্রদের একক আত্মবিকাশ করতে না শিখিয়ে এক পূর্ণ স্ফুরণের আদর্শের দিকে এগিয়ে দেয় যেখানে সে 'বিশ্বসাথে বিহার করে', বিশ্বের মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিজের ব্যক্তিরূপের বিকাশ করে। বিশ্বের সুসম্বদ্ধ নিয়মের রাজত্বে নৈতিক মূল্যগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করার ও মানুষের নিজের জীবনে সেই মূল্যগুলিকে বরণ করে নেবার আধ্যাত্মিক ক্ষমতায় ভাববাদীদের অকুণ্ঠ আস্থা থাকার দরুণ এঁরা মনঃস্তত্ত্ব দিয়ে মানুষের ব্যাখ্যাকে অসম্পূর্ণ মনে করেন এবং শিক্ষাতত্ত্বের ভিত্তি হিসাবেও মনঃস্তত্ত্বকে অনুপযুক্ত বলে গণ্য করেন। অন্যান্য প্রাকৃত বিজ্ঞানের মত মনঃস্তত্ত্ব বস্তুনিষ্ঠভাবে মানুষের আচরণে ও তার কারণের ব্যাখ্যা করতে উদ্যত হয়েছে। বিজ্ঞানের প্রগতির জন্য কার্য্যকারণের যে মূলতত্ত্বের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সার্থক হয়েছে, মনঃস্তত্ত্বও সেই ব্যাখ্যা ও 'পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট' বাদ (সমস্ত কার্যকারণই পূর্ব্ব হতে নির্দ্দিষ্ট) গ্রহণ করেছে। হার্ট মনঃস্তত্ত্বে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্টবাদের তত্ত্ব এ ভাবে ব্যাখ্যা করলেন "জড় জগতের সমস্ত ঘটনা কোন না কোন কারণ হতে উদ্ভূত। যদি আগেকার কারণ

১। ইউকেন। লাইফ্‌স্‌ বেসিস এ্যাণ্ড লাইফ্‌স্‌ আইডিয়াল পৃঃ ৯৭

২। " " " " " পৃঃ ২৪৪

উপস্থিত থাকে তবে পরের কার্য্য অবশ্যই ঘটবে। সুতরাং ফল (কার্য্য) দেখলেই আমরা জানবো যে কোন নিশ্চিত কারণের সমাহারেই সে কার্য্য ঘটেছে। পদার্থবিজ্ঞানেও যেমন আকস্মিক বলে কিছু নেই। মনঃস্তত্ত্বেও তাই। মনের মধ্যে যেসব চিন্তা এলোমেলোভাবে ভেঙ্গে যায় তাদের যতই তুচ্ছ ও কার্য্যকারণহীন মনে হ'কনা কেন তারাও নিশ্চিতভাবে পূর্ব্ববর্তী মানসিক প্রক্রিয়ার ফল। যদি এই মুহূর্তে কোন সংখ্যা মনে করতে বলা হয়, আপাতভাবে তা আমি খুব বেশী চিন্তা না করেই ভাববো কিন্তু বাস্তবিক সেই সংখ্যাটি আমার চিন্তনে আসবে আমার সেই মুহূর্তের মানসিক অবস্থার দ্বারা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট হয়ে। অর্থাৎ সে সময় একটিমাত্র সংখ্যা অবশ্যম্ভাবীভাবে আমার মনে উদয় হবে, অন্য কোন সংখ্যা আসাই সম্ভব নয়। এ সিদ্ধান্ত পাঠকের কাছে কিছুটা কষ্টকল্পিত মনে হতে পারে অথচ মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলে চিন্তা করতে হলে এমন কিছু স্বতঃসিদ্ধ স্বীকার্য্য (axioms) গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কাজেই আমাদের নিজস্ব দর্শন যাই হোকনা কেন মনঃস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবে চিন্তা করতে হলে আমরা কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার বিশ্বাসী হতে বাধ্য।"[১]

সমস্ত মনোবিজ্ঞানীরা হয়তো হার্টের মতো এত খোলাখুলিভাবে তাদের নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলবেন না কিন্তু কার্য্যতঃ সকলেই আজকাল বিশ্বাস করেন যে মানুষের আচরণ বৈজ্ঞানিক অর্থে ব্যাখ্যাযোগ্য এবং পূর্ব্ব থেকে অনুমান সম্ভব। যদিও তাঁরা এখনো সার্থকভাবে সেগুলো প্রমাণ করে দেখাতে পারেন নি। তাদের কাছে ভাল ও মন্দ সর্ব্বপ্রকার আচরণই সমান কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবহারের নৈতিক বিচার মনোবিজ্ঞানের দায়িত্ব নয় কেন-না মনোবিজ্ঞান প্রাকৃত বিদ্যা (positive science), মাননির্ণায়ক (normative) বিদ্যা নয়।

শিক্ষাবিদ্‌রা সাধারণতঃ মানের সম্বন্ধে অবহিত, এবং শিক্ষার আদর্শ মূল্য, মান ইত্যাদির সন্ধানে তাঁদের মনঃস্তত্ত্বের গণ্ডীকে অতিক্রম করে যেতে হবে। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের লেখকরা সাধারণত এইটুকু বলেই সন্তুষ্ট থাকেন এবং মূল্য ও আদর্শের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার ভার অন্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে শিক্ষার মনঃস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে অগ্রসর হন। এর ফল প্রায়শঃই দুঃখকর কেন না লেখকের নিজস্ব দর্শন যাই হোক্ না, পাঠকরা শিক্ষার ক্ষেত্র সম্বন্ধে একটা বিভ্রান্তিকর চিত্র পান। যেহেতু মূল্য, মান, আদর্শ ইত্যাদিকে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়। কখনো বা

১। হার্ট। দ্য সাইকোলজি অব ইনস্যানিটি। পৃঃ ৬০।

সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়। ছাত্ররা বর্তমান মনঃস্তত্ত্বের বীজাণু আক্রান্ত হয়ে শিক্ষাতত্ত্বে ও শিক্ষণকার্য্যে শ্রেয়ঃনীতিক বিচারকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। তা ভিন্ন মনোবিজ্ঞানের কার্য্যকারণের কঠিন নিয়মকে কিছুটা সংশোধন না করে নিলে শিক্ষাক্ষেত্রেও একটা অনমনীয় দৃষ্টিভঙ্গীর সৃষ্টি হয়। যেমন কিছু কিছু মনঃস্তাত্ত্বিক মানসিক অভীক্ষার ফলকে একেবারে অপরিবর্ত্তনীয় বলে ধরে নেন। বিশেষ করে বুদ্ধির অঙ্ক (IQ) সম্বন্ধে মনঃস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার সাক্ষ্য অমোঘ বলে ধরা হয়। তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে মানুষের পরিবেশের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হওয়ার ক্ষমতা নেই, তার জন্মসূত্রে সে যা পেয়েছে তা নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। প্রথম দিকের সহজাত প্রবৃত্তির মনঃস্তত্ত্ববাদও মানুষকে, তার জান্তব উত্তরাধিকার অনুসারে সম্পূর্ণ সহজাত প্রবৃত্তিতাড়িত বলে দেখানোতে, কিছু কিছু ব্যক্তির মনে মানুষের উচ্চতর আধ্যাত্মিক অভীপ্সাগুলো সম্বন্ধে নৈরাশ্যবাদের সৃষ্টি হয়। মানুষ যদি মানবেতর প্রাণীদের মত কেবলমাত্র সহজাত প্রবৃত্তি দিয়েই চালিত হয় তবে তার এই অমোঘ উত্তরাধিকার হতে উত্তরণের পথ কোথায় ?

শুধুমাত্র ভাববাদের সাহায্যেই এমন সুকঠোর কার্য্যকারণ তত্ত্বের সংশোধন সম্ভব। তাদের মতে মনঃস্তত্ত্ববাদীদের মানুষের সব আচরণই কার্য্যকারণশৃঙ্খলে বাঁধা এ নিতান্ত অতিরঞ্জন। মানুষ তার স্বাধীন নৈতিক বুদ্ধি (free will) দ্বারা চালিত আমাদের এ বিশ্বাস ভ্রান্ত কল্পনা না হয়ে যদি সত্যি বলে প্রমাণিত হয় তবে কেমন হবে ? ভাববাদীরা মনোবিজ্ঞানের কার্য্য ও কারণের শৃঙ্খলা তত্ত্ব দিয়ে মানুষের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানুষের বুদ্ধি, বুদ্ধির পরীক্ষা দিয়ে নিশ্চিতভাবে মাপা যায়। কিন্তু একথার উত্তর হল যে ঐ পরীক্ষাগুলো মানুষের আচরণের সব দিক্ মাপতে পারেনা। এমন কি তার আচরণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিও মাপতে পারে কিনা সন্দেহ। কাজেই ভাববাদীরা জোর দিয়ে বল্লেন যে, যে আধ্যাত্মিক মূল্য ও আদর্শগুলি প্রাকৃত মনোবিজ্ঞান বর্জ্জন করে সেগুলিকে সযত্নে লালন করতে হবে। শিক্ষার আদর্শ রূপায়ণের কাজ গ্রহণ করা উচিত। সেই কাজ সার্থকভাবে করে ওঠা সম্ভব।

শ্রেয়ঃনীতিবোধের প্রশ্নে মনঃসমীক্ষণবাদীদের মতটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক কারণ এঁরা বাস্তবিক করে 'ঈদ্ ও ইগোর' মূল দ্বন্দ্বনীতির প্রস্তাবনায় প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছেন যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও উচ্চতর আদর্শের মধ্যে সংঘর্ষ চলে।

"আদর্শের অস্তিত্ব মনোসমীক্ষণবাদী মেনে নিতে বাধ্য কেননা তা না হলে (মনের মধ্যে) কোন দ্বন্দ্বই থাকবে না। আর দ্বন্দ্বই মনঃসমীক্ষকদের প্রধান বিবেচনার বিষয়।...তাই মনঃসমীক্ষণবাদীরাও সত্তার বর্ণনায় ভাববাদী বিশ্বাসের অংশীদার হচ্ছেন।"[১] কাজেই এ দাবী করা যায় যে মনোসমীক্ষণবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন কোন শিক্ষার তত্ত্ব, তাদের মনঃস্তাত্ত্বিক ভিত্তি সত্ত্বেও, ভাববাদীদের হতে সম্পূর্ণ বিজাতীয় মত পোষণ করছেন না। শিশুকে তার অন্তরের সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তির দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে গিয়ে শিক্ষাবিদ্ তার আধ্যাত্মিক মূল্যগুলোকে জয়ী হতে দিচ্ছেন। এভাবে ব্যক্তির দ্বারা সামগ্রিক সত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব হচ্ছে।

যদিও মনঃস্তত্ত্ববিদ্‌রা কোন কোন ক্ষেত্রে আদর্শমূল্য ও আধ্যাত্মিক মূল্যগুলির অস্তিত্ব মেনে নিয়েছেন, এদের কোন রকম সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তাঁরা দিতে পারেন নি।

ভৌতবিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মনঃস্তত্ত্ব হয়তো ব্যাখ্যা করতে পারে কেন কয়েকজন ব্যক্তি উচ্চতম বুদ্ধির কাজ করতে সমর্থ এবং কেন বা কেউ তত বুদ্ধির কাজে অপারগ। কিন্তু কেন যে অতি সাধারণ লোক চূড়ান্ত বীরত্ব ও পর-হিতৈষণায় সক্ষম, কেন যে তাদের ব্যবহারে আদর্শবোধ রূপায়িত হয়ে উঠছে, সে সম্বন্ধে মনঃস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা নিতান্ত অযথেষ্ট। আদর্শ ও মূল্যবোধকে বর্জ্জন করার দরুণ মনঃস্তত্ত্ব শিক্ষার সম্পূর্ণ ভিত্তি রচনার দাবী করতে অপারগ। ভাববাদ মনে করে এই মূল্য ও আদর্শ সত্য, এবং পরম প্রয়োজনীয়। মানবস্বভাবের অসাধারণ গুণই হচ্ছে এই আদর্শ রূপায়ণের ক্ষমতা। ভাববাদের মতে ভৌত-বিজ্ঞানবলে অভিহিত মনঃস্তত্ত্ব, এই আদর্শগুলিকে অগ্রাহ্য করার দরুণ, কখনো মানুষের পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। রাস্ক বল্লেন, 'হয় মনঃস্তত্ত্ব ভৌত, বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান এই বলে নিজেকে অভিহিত করা বন্ধ করুক অথবা মানুষের মানস জীবনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম, এই দাবী করা ছেড়ে দিক।"[২] ভাববাদে বিশ্বাস রাখলে দেখতে পাই শিক্ষার কাজ হবে শিশুর অন্তরনিহিত আদর্শ রূপায়নের ক্ষমতাগুলোকে বিকশিত করা যাতে সে নিজের জীবনেই সত্যমূল্য ও আদর্শ-গুলোকে রূপদান করতে পারে। সেই বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সম্বন্ধে নীরব থাকার দরুণ শিক্ষায় মনঃস্তত্ত্ব মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। শিক্ষা ভিন্ন এই ক্ষমতা-

---

১। রাস্ক। দ্য ফিলসফিক্যাল বেসেস্ অব এডুকেশন। পৃঃ ১২১।
২। রাস্ক। দ্য ফিলসফিক্যাল বেসেস অব এডুকেশন। পৃঃ ২৮।

গুলো থাকবে নিষ্ক্রিয়। শিক্ষার অর্থ এই মূল্য ও আদর্শগুলো সম্বন্ধে ব্যক্তিকে সচেতন করে তোলা। শ্রেয়:নীতিক মূল্যবোধের জন্য শিক্ষার্থীর চিত্তকে জাগিয়ে তোলার কাজ করবে শিক্ষা।

কোন্ সব আধ্যাত্মিক আদর্শ শিক্ষার্থী অন্বেষণ করবে? শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য কোন মূল্যবান আদর্শ? এই মৌলিক প্রশ্নে কিছু পরিমাণে নিশ্চিত উত্তর দিতে পারলেই আমরা এমন একটা মানদণ্ড পাবো যার সাহায্যে আমাদের শিক্ষাচেষ্টার কোন সার্থকতা আছে কিনা অথবা তার ফল যথেষ্ট পূর্ণাঙ্গ কিনা সেকথা বুঝতে পারবো।

প্লেটো তার লেখায় কখনো পরম শুভকে কখনোবা পরম সুন্দরকে আমাদের আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রার অন্তিম আদর্শ বলে বর্ণনা করেছেন। এ ই. টেলরের[১] ব্যাখ্যা অনুসারে প্লেটো বিশ্বাস করতেন এই দুটিই এক ও অভিন্ন। কীট্স নিজেও সত্য ও সুন্দরের অভিন্নতা কল্পনা করে লিখেছেন

"Beauty is truth, truth beauty - that is all
Ye know on earth, and all ye need to know.'[২]

সাধারণ লোক পরম শুভর আরেকটু বিশদ বর্ণনা দাবী করে।[৩] আধ্যাত্মিক আদর্শগুলিকে সত্য, সুন্দর ও শুভ এই তিনরূপে বিশ্লেষণ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ধরে দেওয়া হয় মানুষের আধ্যাত্মিক কার্য্যাবলীও হচ্ছে ত্রিভঙ্গ—বৌদ্ধিক, নান্দনিক ও শ্রেয়:নীতিক। ক্লাটন ব্রকের প্রথম মহাযুদ্ধের করাল ছায়ায় বসে লেখা একটি পুস্তক হতে এই মতের সমর্থক একটি সুন্দর অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করি, "আত্মিক দর্শন বলে, জড়বস্তুর চেয়ে আত্মা মহত্তর। এই দর্শন মানুষের স্বভাব ও জগতের স্বভাব দুই সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য প্রকাশ করেছে, যে সত্য মানুষ নিজের পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা নিজেই প্রামাণ্য বলে বুঝতে পারে। আত্মিক দর্শনের মতে আত্মা তিন বস্তুর কামনা করে। এই তিন সামগ্রী নিজস্বমূল্যেই মূল্যবান, অন্য কিছুর লাভ করার উপায় হিসাবে মূল্যবান নয়। প্রথমতঃ আত্মা, যা সৎ তাই করতে চায়, সৎ বলেই সেই কর্ম করতে তার আগ্রহ। দ্বিতীয়তঃ অন্য কোন কিছু লাভের জন্য নয়, নিছক সত্য জ্ঞানের জন্যই তার আগ্রহ। তৃতীয় আগ্রহটিকে যদিও বর্ণনা করা সহজ নয় আমি তাকে সৌন্দর্য্য পিপাসা বলে আখ্যা দেব।

১। এ. ই. টেলর। প্লেটো, দ্য ম্যান অ্যাণ্ড হিজ ওয়র্ক। পৃঃ ২৮৭
২। কীট্স্। ওড্ অন এ গ্রীসীয়ান আর্ন।
৩। সত্য, শিব ও সুন্দরের ত্রিমূর্তীরূপ ভারতীয় উপনিষদে কল্পিত।

শুধুমাত্রই তিন আকাঙ্খাই আত্মার প্রিয়। এরা অন্য সব আকাঙ্খা হতে এই জন্য ভিন্ন যে এরা তাদের নিজস্ব মূল্যেই মূল্যবান ও নিজস্ব গুণেই তাদের পাওয়ায় চেষ্টা করা হয়। যদি অপর কোন উদ্দেশ্যে তাদের অনুসরণ করা হয় তবে তারা তাদের নিজস্ব চরিত্রই হারিয়ে ফেলবে।

৮ কাজেই আত্মার মাত্র তিনটিই মুখ্য আকাঙ্খা এবং তা থেকে তিনটি প্রধান ক্রিয়া আছে। তা হল—"নৈতিক বৌদ্ধিক ও নান্দনিক ক্রিয়া। মানুষ এই তিনটি ক্রিয়ার অনুসরণ করবে বলেই বাঁচে, তার জীবনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই।"[১]

এই আপোষহীন ভাববাদের মতে প্রতিটি আদর্শ অদ্বিতীয়। একটিকে অন্যর দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। মানুষ ভাল (সৎ) হবার জন্য সত্যকে জানতে চায় না অথবা সৌন্দর্য্যপিপাসু হয়না, শিল্পের কামনা করা হয় শিল্পের নিজস্ব মূল্যেই, নৈতিকতা বোধ হতে নয়। বাস্তবিক সৌন্দর্য্যের কোন শ্রেয়ঃনীতিক উদ্দেশ্য নেই। শুভ, সত্য ও সৌন্দর্য্যকে মানুষ 'পরম' (absolute) বলে মনে করে। এই আদর্শ তিনটি নিজেদের স্ব স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত এবং সম্পূর্ণ একক ভাবেই কাঙ্খনীয়। ক্লাটন ব্রক তাঁর বইতে এই তত্ত্বের সমর্থনে বিশদ যুক্তি দেন এবং পাঠকদের নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে এই তিনটি পরম আদর্শ (সত্য, শুভ ও সুন্দর)কে স্বকীয় মূল্যে প্রতিষ্ঠা করতে বলেন।

কেউ কেউ মনে করেন সত্য, শুভ এবং সুন্দর, মানুষের মনোময় সত্তার ত্রিপদী প্রকাশ। সত্য মানুষের মনন, সৌন্দর্য্য তার অনুভূতি ও নৈতিক মূল্যবোধ তার ইচ্ছার প্রকাশ। এই ধারণাটি মনঃস্তত্ত্ব থেকে মনের ত্রয়ী বিভাজনের ধারণা থেকে আহৃত। কিন্তু মনঃস্তত্ত্বের সাহায্যে আদর্শের এই ব্যাখ্যাতে আপত্তি উঠতে পারে। কেননা পূর্ব্বাহ্নেই মনঃস্তত্ত্ব প্রাকৃত বিজ্ঞান-বলে, আদর্শের ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ বলে দেখানো হয়েছে। এক রূপক অর্থে এমন ব্যাখ্যা হয় তো গৃহীত হতে পারে। তা ভিন্ন মনঃস্তত্ত্বের গভীরতর বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই মানুষের মনে মনন, অনুভব করণ ও ইচ্ছন, কখনো একে অপর হতে স্বতন্ত্র হয়ে এককভাবে থাকে না। এরা একে অপরের সঙ্গে বিজড়িত এবং একই অভিজ্ঞতার এরা ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া। আমাদের মনের এমন শুদ্ধ চিন্তনের (মননের) অবস্থা আসে না যখন অনুভূতি ও ইচ্ছা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। না জেনে বা আকাঙ্ক্ষা করে, অনুভূতি হচ্ছে এমন অবস্থা কখনই

১। ক্লাটন ব্রক। দ্য আলটিমেট বিলীফ পৃঃ ২০.২১

হয় না, তাছাড়া সত্যের বা সৌন্দর্য্যের অন্বেষা সার্থক হতে হলে আমাদের চিন্তন, অনুভূতি ও ইচ্ছনের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করা দরকার হয়। তাই মানুষের অভিজ্ঞতাকে এই তিনটি প্রক্রিয়া দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হলেও মানুষের আধ্যাত্মিক আদর্শগুলি এই ত্রিশক্তি (মনন, অনুভবন, ও ইচ্ছন) দিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। এদের অন্য কোন আদর্শ দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করার প্রয়োজন।

ধর্ম সেই আদর্শ। রাস্কের সঙ্গে এই আদর্শটি আমরা "মানুষের আত্মিক কার্য্যাবলীর তালিকায় সংযোজন করি।"[১] ধর্ম, জ্ঞানের পথে বিচরণ করতে পারে, ধর্মের মধ্যে সৌন্দর্য্যবোধ নিহিত। ধর্ম, শুভর সঙ্গে আত্মীয়তা বোধে যুক্ত, তবুও ধর্ম এই তিন 'পরম আদর্শকে' অতিক্রম করে আপন স্বকীয়তায় ভাস্বর।

বিশেষ করে ধর্মের ও নৈতিকতার মধ্যে সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। ধর্ম কি? ধর্মের একটি সাধারণ ধারণা, এ. এস. পীয়েকের সংজ্ঞা উদ্ধৃত করে দেওয়া যাক্, "ধর্ম হচ্ছে অদৃশ্য পরমের জন্য আত্মার আকুলতা।"[২] ধর্ম অর্থে আমরা বুঝি জীবাত্মার অথবা মানুষের, পরমাত্মা বা ঈশ্বরের দিকে উন্মুখ আগ্রহে হাত বাড়িয়ে দেওয়া। সসীম আত্মা, অসীমের সঙ্গে মিলনের জন্য উৎসুক তাই ধর্মের বিশিষ্ট ভঙ্গি পূজার, সশ্রদ্ধ বিনতির।

নৈতিকতার সঙ্গে সামাজিকতা যুক্ত। সামাজিক পরিবেশ ছাড়া মানুষ নীতিবোধের প্রকাশ করতে পারে না। প্রাচীন কালেও দেখি মানুষের নীতিবোধ তার দলের লোকের কল্যাণের চিন্তা ও আয়োজন হতে উদ্ভূত। দলের লোকের প্রতি আনুগত্য আরেকটু প্রসারিত করে সব মানুষের সম্বন্ধে আরোপ করলে কতগুলি সার্ব্বজনীন নীতিবোধের আদর্শ গড়ে তোলা যায়। কিন্তু সেখানেও সমাজের পরিবেশ ও অনুমোদন প্রয়োজন। সামাজিক দিক ব্যতীত নীতিবোধের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, শুভ, এই পরম আত্মিক আদর্শের অনুসরণ করা। এর দ্বারা ব্যক্তির পূর্ণতম ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন সম্ভব হবে।

তাই দেখা যায় ধর্ম ও নীতিবোধ দুটি এক নয়। এমন কি তাদের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক থাকারও প্রয়োজন নেই। নীতিবোধ ধর্মকে আশ্রয় না করেও জীবন্ত থাকতে পারে। শ্রেয়ঃনীতির জন্য ধার্মিক অনুমোদনের প্রয়োজন নেই।

১। রাস্ক। দ্য ফিলজফিক্যাল বেসেস অব এডুকেশন। পৃঃ ১০৩।

২। এ. এস. পীয়েক। ক্রীশ্চিয়ানিটি ইট্‌স্ নেচার অ্যাণ্ড ইট্‌স্ ট্রুথ। পৃঃ ২।

অনেক নীতিবোধসম্পন্ন লোক ধর্ম মানেন না বা ঈশ্বর নামে কোন উপস্থিতি স্বীকার করেন না। অথচ তাদের নীতিবোধ উচ্চকোটির হতে পারে।" (রস)

বৌদ্ধযুগের নিরীশ্বরবাদ অতি উচ্চশ্রেণীর নৈতিকবোধের চর্চা করতো। আবার ধর্মচর্চা শ্রেয়ঃনীতির সংসর্গহীন হতে পারে। তান্ত্রিক ধর্ম অনেক সময় দুর্নীতি ও ব্যভিচারকে প্রশ্রয় দিত।

একথাও তেমনি সত্যি যে ধর্ম নীতিবোধকে পুষ্ট নাও করতে পারে। বহু প্রাচীন ধর্ম তাদের আচরণে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়েছে। এখন কি আধুনিক যুগেও অনেক প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তিরা তাদের নাস্তিক, অধার্মিক প্রতিবেশীদের চেয়ে নৈতিক বোধে দরিদ্র। ওল্ড টেষ্টামেণ্টের জেকব ঈশ্বরের অনুগৃহীত, ঈশ্বরেব কাছাকাছি ভক্ত পুরুষ কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ প্রশংসনীয় নয়।

রাস্ক ধর্ম ও নৈতিকতার বিভিন্নতা বিশদ করলেন ধার্ম্মিক ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য দিয়ে।

ধার্মিক মনোভাবের তুলনায়, নৈতিক জীবন দ্বন্দ্বের জীবন, কেননা শ্রেয়ঃ-নীতির আদর্শের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যখনই আমরা কাঙ্খিত আদর্শের কাছাকাছি পাই, সেই আদর্শ দূরে অপগত হয়। ভালমন্দের এই সুরাসুরের দ্বন্দ্ব আমাদের জীবনের সায়াহ্ন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা অসম্পূর্ণতা ও অসন্তোষবোধে চিহ্নিত। সার্থকতায় উপনীত হলে আবার নতুন দ্বন্দ্ব সুরু হয়। ধর্মের জীবনে কিন্তু ব্যক্তির মনে এ ধরণের সদা অসন্তোষ জাগে না। কোন যুদ্ধ জয় না হলে ব্যক্তি অন্ততঃ এই ভেবে আশ্বাস পায় যে সে যাঁর পক্ষে আছে, তিনি অজেয়।[১]

শুভর অন্বেষণ তাই অতৃপ্তি ও প্রচেষ্টার দ্বারা চিহ্নিত যদিও সেখানে কোন অন্তিম প্রাপ্তি বা পূর্ণ সন্তোষ ঘটেনা। ধর্ম কিন্তু সেই তৃপ্তি ও 'সব কিছু ভাল আছে' এমন আশ্বাস দেয়। ঈশ্বর তো আবহকাল ব্যাপী, বিশ্রামহীন আর্ত হৃদয়, তাঁ'কে আশ্রয় করে বিরাম লাভ করে। নৈতিকতার জগতের প্রাণান্তর যুদ্ধের পর ধর্ম্মীয় বিশ্বাসে উত্তরণের অলৌকিক আনন্দ সেন্টপলের বাক্যাংশে বিধৃত।

"হায় অভাগা আমি, এই মৃত্যুতুল্য মরদেহ হতে কে আমায় ত্রাণ করবেন? আমি সেই ত্রাতা ঈশ্বর (যীশুখ্রীষ্ট)কে ধন্যবাদ দেই"[২]

১। রাস্ক। দ্য ফিলসফিক্যাল বেসেস্‌ অব এডুকেশন। পৃঃ ১০৮।
২। রোম্যান্স্‌। VII 24.25.

যদিও ধর্ম ও নৈতিকতা স্বভাবতঃ পৃথক, উচ্চতর রূপে তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক সম্পূর্ণতায় বিলীন হয়। এমন কি ওল্ড্ টেষ্টামেণ্টে আদিম অধিবাসীদের নৈতিকতায় ধর্মের অনুমোদন ও সমর্থন দেখি। ফিলিষ্টাইনদের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষে দুই দলে বাঁচামরার প্রশ্নে যুদ্ধের দেবতা ও হিংস্রতার দেবতাকে আবাহন করা হয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই এক ন্যায়বান ঈশ্বরকেও কল্পনা করা হয়েছে যার হাত রক্তমাখা না, যার অন্তর পবিত্র, যিনি ক্ষমায় ইচ্ছুক, বলিদানে আগ্রহী নন। "মানুষকে তিনি শুভর সন্ধান দেন, তাকে তিনি ন্যায় কাজ করতে, করুণা করতে এবং বিনম্র হতে শেখান।"[১]

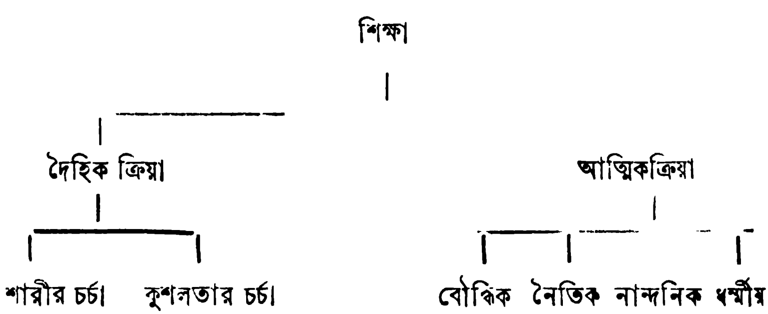
অবশেষে খ্রীষ্টধর্মে নৈতিকতা ও ধর্মকে পাশাপাশি জায়গা দেওয়া হয়েছে। যীশুখ্রীষ্ট খ্রীষ্টধর্মে ঈশ্বর-পুত্র বলে সম্মানিত। তাঁর নৈতিক মতবাদকে দৈবীমাহাত্ম্য দিয়ে বর্ণনা করা হয়। যীশুখ্রীষ্ট ধর্মীয় প্রচারক হলেও একথা অনস্বীকার্য্য যে তাঁর বাণী উচ্চতম শ্রেয়ঃনীতিবোধের প্রচার করে। কিন্তু দৈবীমহিমা না যুক্ত করলে তাঁর শিক্ষার লোকমানস প্রভাবিত করার শক্তি নিঃসন্দেহে হ্রাস পেতো। যীশুখ্রীষ্টের শ্রেয়ঃনীতি প্রচার করার আগের প্রমুখ আদেশ এই প্রকার—"তোমার ঈশ্বরকে তুমি সমস্ত আত্মা, মন, শক্তি দিয়ে ভালবাসবে এবং তোমার প্রতিবেশীদের তোমার নিজের মতোই ভালবাসবে।"[২]

কাজেই সর্বোত্তম ধর্ম ঈশ্বরে অর্পিত-প্রাণ হওয়া; সর্বমহৎ শ্রেয়ঃনীতির আদর্শ মানুষের প্রতি প্রেম। দুটিকে ভিন্নভাবে উল্লেখ করেও একই প্রেমের সূত্রে গেঁথে দেওয়া হল। প্রেম নামক এই মৌলিক সূত্রটি মনঃস্তত্ত্বেও স্বীকৃত। ভালবাসার প্রবৃত্তিকে কল্যাণের, সৌন্দর্য্যের, ও সত্যের দিকে সূচীমুখ করতে হবে। যদি এই তিনটিকে ভগবৎগুণ বলে স্বীকার করা হয় তবে এই গুণগুলিকে ভালবাসা অর্থ হবে ভগবানকে ভালবাসা। এটিই হল ধর্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সুতরাং ধর্ম একটি আলাদা আদর্শ হওয়ার পরিবর্তে সমস্ত আদর্শগুলিকে একত্র করে আরো মহত্তর আদর্শ হয়ে দাঁড়ালো।

ভাববাদের মতে তাই শিক্ষার পরিপূর্ণ আদর্শ হল ধর্ম, নীতিবুদ্ধি, কল্যাণ, সৌন্দর্য্য ও সত্য। ধর্মশিক্ষা, নৈতিকতার শিক্ষা, বুদ্ধির শিক্ষা, নান্দনিক শিক্ষা সমস্তর সম্মেলনেই পূর্ণ সুসম্বদ্ধ প্রস্ফুটিত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হবে। সুসমন্বিত ব্যক্তিত্বের বিকাশ লক্ষ্য হলে এর কোন দিকটিকেই অবহেলা করা চলবে না।

১। হোসীয়া VI 6.
২। লুক X ২৭।

শিক্ষার দৈহিক আদর্শকে বিস্মৃত হলে চলবে না। দুভাবে এই আদর্শটিকে দেখা দরকার। প্রথমতঃ শারীরিক স্বাস্থ্য ও যোগ্যতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দিতে হবে কেননা স্বাস্থ্য ও শারীরিক শক্তি বিনা আত্মিক চর্চার অন্বেষণে বিঘ্ন ঘটবে, দ্বিতীয়তঃ শারীরিক কুশলতার পরিশীলন না করলে মানুষ তার উদ্ভাবনী বুদ্ধি দিয়ে, তার নিজের প্রয়োজন ও বাঞ্ছা অনুযায়ী যন্ত্রকৌশল সমন্বিত ভৌত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারবে না। দৈহিক ও আত্মিক ক্রিয়াগুলি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়, তাদের কিছু পরিমাণ সামান্যতাও আছে। শ্রেয়ঃনীতিক আদর্শগুলি একদিকে আধ্যাত্মিক, অপরদিকে শারীরিক ক্রিয়াকর্মেই (physical activities) তাদের প্রকাশ। তেমনি বৌদ্ধিক ক্ষমতা ও আদর্শ, জড় পরিবেশের পরিবর্তন সাধনের কাজে মানুষের কুশলতায় অনুসৃত। মানুষ তার শিল্পকলার প্রয়োজনীয় উপকরণকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার সময় সৌন্দর্য্যের আদর্শকে আবিষ্কার করছে। রাস্ক আদর্শগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা চিন্তা করে একটি নক্সা প্রস্তুত করেছেন যাতে এই সমস্ত আদর্শমূলক ক্রিয়াগুলি থাকবে। খুব বাঁধাধরাভাবে এই নক্সা (এবং আদর্শের মধ্যে ভাগ) অনুসরণ না করলে, এই থেকে পূর্ণাঙ্গ উদাত্ত শিক্ষার একটা যোজনা পাওয়া যাবে।



এভাবে দেখলে সমস্ত বিশ্বসংসারের যাবতীয় কার্য্যাবলী শিক্ষার আওতায় আসে। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য ভাববাদী মতে এই মূল আদর্শগুলিকে অনুসরণ করে এই সমস্ত ক্রিয়াকর্মকে শিক্ষাক্ষেত্রে ঘটতে দেওয়া। তাহলেই মানুষ পূর্ণতম জীবনের অধিকারী হতে পারবে।

অতিরিক্ত পাঠসূচী

অ্যাডাম্‌স্‌।	এডুকেশনাল থিয়োরীস্‌। ইভল্যুশন অব এডুকেশনাল থিয়োরী। দশম অধ্যায়।
ক্লাটন ব্রক।	দ্য আলটিমেট বিলীফ।
হোম্‌স্‌।	হোয়াট ইজ অ্যাণ্ড হোয়াট মাইট বী।
লিভিং ষ্টোন।	দ্য ফিউচার ইন এডুকেশন। এডুকেশন ফর এ ওয়ার্লড্‌ এ্যাড্রিফ্‌ট্‌।
রাস্ক।	দ্য ফিলসফিক্যাল বেসেস অব এডুকেশন। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়।
টমাস অ্যাণ্ড ল্যাঙ্গ।	প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্‌ অব মডার্ণ এডুকেশন। তৃতীয় অধ্যায়।
ওয়েলটন।	হোয়াট ডু উই মীন বাই এডুকেশন। দ্বিতীয় অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

শিক্ষায় প্রয়োগবাদ

প্রয়োগবাদের স্বভাব এমনি যে আত্মখণ্ডন ছাড়া শিক্ষার কোন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য প্রথম হতে ধরে নিতে পারে না। প্রয়োগবাদীদের মূল ধারণাই হচ্ছে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট কোন লক্ষ্যের দিকে শিক্ষা প্রচেষ্টা করা হচ্ছে এ কথা স্বীকার না করা। প্রয়োগবাদীদের মতে শিক্ষা অর্থ চিরন্তন আধ্যাত্মিক আদর্শের নিস্পৃহ অনুসরণ নয়, ভাববাদীরা যদিও এই আদর্শের অনুগামী। পারমার্থিক সত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য সার্ব্বিক আদর্শ বা সারসত্তাকে আবিষ্কার করাও শিক্ষার কাজ নয়। কেননা আদর্শ বা মূল্যের কোন পূর্ব্ব অস্তিত্ব নেই। প্রয়োগবাদীর মতে আদর্শের সৃষ্টি হয় পরিবেশের সঙ্গে মানুষের মোকাবিলার দরুন। তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে সার্থক মূল্যবোধের সৃষ্টি করেন। অতএব শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্য নতুন মূল্যের বা আদর্শের সৃজন। শিক্ষকের মুখ্য কাজ শিক্ষার্থীদের এমন পরি-স্থিতিতে নিয়ে আসা যখন তারা নিজেরাই আদর্শ রচনা করতে পারবে।

যদিও প্রয়োগবাদীরা শিক্ষার কোন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আদর্শে বিশ্বাস করেন না তবু তাঁরা একথা স্বীকার করেন যে শিক্ষার বৌদ্ধিক, নান্দনিক নৈতিক ও ধর্ম্মীয় এবং শারীরিক দিক্ আছে। এই সমস্ত দিকের কার্য্যাবলী বিভিন্ন। এগুলির মধ্য দিয়েই শিক্ষার আদর্শ দৃষ্ট হবে। কাজগুলি (ভাববাদীদের বিশ্বাস অনুযায়ী) নিজস্ব মূল্যে মূল্যবান বলেই করতে হবে, এমন নয়। তাদের দ্বারা মানুষের প্রয়োজন সিদ্ধ হবে এইজন্য তাদের অনুসরণ করা। প্রয়োগবাদীর কাছে জ্ঞানের নিরাকাঙ্খ, লাভহীন অনুসরণ, অর্থহীন। শুধুমাত্র বৌদ্ধিক শিক্ষালাভ করার জন্যই শিক্ষা (for its own sake) হতে পারেনা। তেমনি সৌন্দর্য্যের নিষ্কাম উপাসনা বা নৈতিক কর্মের নিস্পৃহ অনুগমন প্রয়োগবাদী সমর্থন করেন না। নৈতিক কর্ম, মানুষের সন্তোষজনক ফললাভের জন্য। ভগবৎ ভক্তিও অহৈতুকী নয়। সন্তোষজনক ফললাভের আশায় মানুষ ঈশ্বর ভজনা করে। কারণ বিনা ঈশ্বরের অনুসন্ধান যুক্তিযুক্ত নয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস তখনই তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন তাঁর কাছ হতে ফল পাওয়া যায়।

শিক্ষা দর্শনের ফলিত রূপ বা সার্থক শিক্ষাতত্ত্ব কোন প্রকৃত দার্শনিক আদর্শ হতে উদ্গত হয়েছে প্রয়োগবাদীরা এ ধারণা ভ্রান্ত বলে মনে করেন। এঁদের মতে বরঞ্চ দর্শনই, শিক্ষা হতে উদ্ভূত, শিক্ষা দর্শন হতে নয়। যে দর্শন ও নিষ্ফলা জ্ঞান জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের কাজে লাগে না, উইলিয়াম জেমস্ বলেছেন তার কোন মূল্য নেই। সার্থক শিক্ষানীতির মূল ভাবনাগুলির সমাহারে দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষাব্যবস্থা সার্থকতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে আদর্শ ও মূল্য সৃষ্টি করে। প্রখ্যাত প্রয়োগবাদী ডিউই বলেন—শিক্ষাদর্শন অর্থ কতগুলি পূর্ব-নির্দিষ্ট ধারণা জোর করে সম্পূর্ণ ভিন্ন উদ্দেশ্যে ও ভিন্ন উৎস হতে উৎসারিত একটি প্রচলিত কর্মব্যবস্থার ওপর চাপিয়ে দেওয়া নয়। বর্তমান জীবনের বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য যাতে যোগ্য মানসিক ও নৈতিক অভ্যাসাবলী গড়ে তোলা যায় তাই শিক্ষাদর্শন। দর্শনের সবচেয়ে গভীর সংজ্ঞা খুব বিস্তৃত অর্থে হচ্ছে শিক্ষার তত্ত্ব।[১] (The most penetrating definition of philosophy which can be given is then, that it is the theory of education in its most general phases.)

প্রয়োগবাদীরা মনে করেন নিজের পরিবেশ হতে শিশু আদর্শ ও মূল্য রচনা করতে পারে, কাজেই শিক্ষার মুখ্য উপকরণ মানুষের জড় ও সামাজিক পরিবেশ। এই পরিবেশের সংযোগে তার অভিজ্ঞতার জগৎ সৃষ্টি হবে। স্বভাববাদীদের সঙ্গে এখানে প্রয়োগবাদীদের মিল আছে। দুজনেই শিশুর আদিম মূল স্বভাব হতেই আরম্ভ করেছেন কিন্তু স্বভাববাদীদের সঙ্গে প্রয়োগবাদীদের পার্থক্য এখানে যে তাঁরা অভিজ্ঞতার জগৎ দিয়ে তার আদিম স্বভাব পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন। সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে নিজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সে নিজেকে ও পরি-বেশকে উন্নততর করেছে। শিশুর মৌলিক স্বভাব হল কৌতূহলপরায়ণতা সে তার পরিবেশ পরীক্ষায় সদাই উৎসুক। প্রয়োগবাদীরা তাকে সহায়ক অভিজ্ঞতা, বিশেষ করে সামাজিক অভিজ্ঞতা দিতে চেষ্টা করেন যার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ আদান প্রদান হতে পারে। তার পরিবেশ সম্বন্ধে ঔৎসুক্যকে উৎসাহ দেওয়া এবং নতুন পরিস্থিতিতে নতুন রকমের সাড়া দিতে শেখানো প্রয়োগবাদী শিক্ষকের কাজ। তাঁরা লক্ষ্য রাখেন যেন শিশুর পরিবেশে এরকম নিরীক্ষার প্রচুর সুযোগ থাকে। তবে যেহেতু জীবনটা হচ্ছে পরীক্ষানিরীক্ষা-মূলক প্রয়োগবাদীরা শিশুর সামনে কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য রাখেন না যে দিকে শিশুকে

১। ডিউই। ডেমোক্রেসী অ্যাণ্ড এডুকেশন। পৃঃ ৩৮৬

অগ্রসর হতেই হবে। বরঞ্চ শিক্ষক কোন নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের নিশানা দিলে বা শিশুর উদ্দেশ্যকে কোনভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে, তা সত্যিকার শিক্ষাকে ব্যর্থ করা হবে বলে মনে করা হয়। জীবনের পরীক্ষণাগারে শিক্ষার্থীরই প্রধান ভূমিকা, কাজেই শিক্ষক শিক্ষার্থীর হয়ে সমস্যা সমাধান করতে পারেন না। শিক্ষার্থী নিজের জীবন ও অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষালাভ করবে। সেটাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

স্বভাববাদীদের মতই প্রয়োগবাদীরা কোন চিরন্তন অপরিবর্তনীয় আদর্শ ও মূল্যে বিশ্বাস করেননা, সুতরাং শাসন ও তাড়না দ্বারা অন্যের আদর্শ ও মূল্যকে শিক্ষার ওপর চাপিয়ে দিতে এঁরা গররাজী। শিক্ষার কাজ হবে শিশুর ইচ্ছা, আগ্রহ, রুচি, প্রবৃত্তি, ক্ষমতা ইত্যাদির বিকাশ। এই বিকাশ কিন্তু কোন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আদর্শ রূপায়নের জন্য নয়। পরিবেশের সঙ্গে সংঘাত ও সংযোগের ফলে শিশু যে সব প্রয়োজন নিজে অনুভব করে (felt needs) সেগুলি মেটানোর জন্য। সুতরাং শিক্ষকের কর্ত্তব্য হবে নিজের মতামত বা ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ পশ্চাৎপটে রেখে শিশুর নিজের আগ্রহ অনুযায়ী বেড়ে ওঠবার ও পরিবেশকে জয় করবার কাজে সাহায্য করা। এতে শিক্ষকের ইচ্ছা ও শিশুর আগ্রহের সংঘাত বাঁধবার কোন কারণ থাকলো না।

এমনিভাবে শিক্ষার এক নতুন সংজ্ঞা জন্ম নিল। শিক্ষার অর্থ হল শিক্ষার্থীর মনকে এমনভাবে কর্ষন করা যাতে মনটি হবে, গতিবান, বিভিন্ন অবস্থায় খাপ খাইয়ে নিতে প্রস্তুত, প্রত্যুৎপন্ন এবং সর্ব্বপরিস্থিতির মোকাবিলায় সক্ষম। এরকম মন, অজানা ভবিষ্যতের জন্য নব আদর্শ সৃজন করতে পারবে। শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিশুর মনকে এমনভাবে গঠন করা যাতে জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিকে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সে মোকাবিলা করতে পারে। আমেরিকান প্রয়োগবাদে শিক্ষার সামাজিক দিককে একটুও অবহেলা করা হয়নি। শিশুর এধরনের বোধবুদ্ধি, সৃজনীক্ষমতা ও খাপ খাইয়ে নেবার শক্তির ফলে নতুন উন্নততর সমাজ সৃষ্টি সম্ভব হবে, এখানে মানুষের সমস্ত অভাব পূর্ণভাবে মিটবে। কিন্তু ব্যক্তির নিজের প্রচেষ্টা ও শক্তির দ্বারাই তা সম্ভব হবে। এই দর্শনে তাই ব্যক্তির প্রতি গভীর আস্থার পরিচয় পাই। সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক রীতিতেও পরম বিশ্বাস ঘোষিত হয়। এঁরা অকুণ্ঠভাবে বিশ্বাস করেন মানুষের উন্নতি করার ও শিখবার ক্ষমতা প্রায় সীমাহীন। সামাজিক পরিস্থিতিতে নিজস্ব কীর্তি দিয়ে ব্যক্তির বিকাশ হবে। প্রয়োগবাদীদের মানুষের সম্বন্ধে এই অসাধারণ

বিশ্বাসের ফলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সাধারণ পার্থক্য আছে তা এঁরা ভুলতে বসলেন। সকলের ক্ষমতা সত্যই সমান নয়। কিন্তু আমেরিকান প্রয়োগবাদীদের দর্শন অনুযায়ী প্রতিটি আমেরিকান স্কুলের ছাত্রেরই রাষ্ট্রপ্রমুখ হওয়ার অন্ততঃ নীতিগত সম্ভাবনা আছে। বাস্তবিক তা তো নয়।

ভাববাদ ও প্রয়োগবাদের মধ্যে প্রধান তফাৎ হল ভাববাদ কতগুলি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মূল্যকে মেনে নেয় এবং তার রূপায়ণের জন্য প্রচেষ্টা করে, অপরপক্ষে প্রয়োগবাদ মূল্যগুলিকে মনুষ্যসৃষ্ট বলে মনে করে। প্রয়োগবাদীরা বলেন শিশুর উদ্যম এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যাতে জীবনের সঙ্গে সমন্বিত, জীবনের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম এমন আদর্শ গড়ে তুলতে পারে। এঁরা ভাববাদীদের মত মনে করেন না যে আদর্শগুলি পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট। তাঁদের মতে মানুষ সমাজের প্রয়োজনমত ও নিজের আগ্রহপূরণের জন্য আদর্শ সৃষ্টি করে নেয়।

তবে আগেও বলা হয়েছে, ভাববাদ ও প্রয়োগবাদে মিলও যথেষ্ট। প্রয়োগবাদকে বেগবান, গতিময় ভাববাদ (dynamic idealism) বলা চলে কেননা এখানেও শিশুর পূর্ণব্যক্তিত্বের উন্মোচনই লক্ষ্য। কিন্তু সেই উন্মেষ ঘটছে সমাজের সঙ্গে ঘাত প্রতিঘাতে। শিশু শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের মূল্য ও আদর্শকে রূপায়িত করবে। প্রয়োগবাদীরা ভাববাদীর সঙ্গে ভিন্নমত হলেন এই বলে যে জীবনের ও শিক্ষার ধ্রুব পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট আদর্শ নেই। রাস্ক কিন্তু মনে করেন প্রয়োগবাদ-এ নতুন গতিময় বাস্তব সত্যসম্মত ভাববাদের নব সংস্করণ। এখানে ব্যবহারিক (materialistic) এবং আধ্যাত্মিক (spiritualistic) মূল্য ও আদর্শের সমন্বয় সাধিত হবে।[১] ভাববাদীরা প্রয়োগবাদীদের মত মনে করেন যে মানুষের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব। কিন্তু প্রয়োগবাদীরা বলেন এই বিকাশ ঘটছে কোন অন্তিম আদর্শের দিকে গোটা জগতের অগ্রসর হওয়ার ফলে নয়—শুধুমাত্র মানুষের নিজস্ব প্রয়োজন মেটাতে। ভাববাদীরা মানুষের ব্যক্তিত্বের সমৃদ্ধিতে বিশ্বাসী (exaltation of personality), এটা ঘটছে পারমার্থিক সত্তার পরিকল্পনা মতো জীবাত্মার সঙ্গে মিলনের জন্য। প্রয়োগবাদীরা কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্য কোন অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাসী নন। এরা বিশেষভাবে মানববাদে বিশ্বাসী। মানুষের প্রয়োজন জগতের সব মূল্যের মাপকাঠি (man is the measure of all things)। প্রাচীনকালে সোফিষ্টদেরও ঐ একই বিশ্বাস ছিল। শিশুর বিকাশের

১। রাস্ক। দি ফিলসফিক্যাল বেসেস অব এডুকেশন পৃঃ ৩৩

কালে শিক্ষার সব পদ্ধতি, করণ ইত্যাদির লক্ষ্য হবে শিশুর পরিপূর্ণ আগ্রহের বিকাশ। প্রয়োগবাদীরা স্বভাববাদীদের মত শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষায় আগ্রহী।

প্রয়োগবাদের উৎপত্তি হচ্ছে সার্থক জীবনযাপনের ব্যবস্থা করার জন্য। সেই জন্য শিক্ষাতে লক্ষ্যের চেয়ে প্রয়োগ ও পদ্ধতির ক্ষেত্রেই তাদের অবদান সর্ব্বাধিক। শিক্ষার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে প্রয়োগবাদের অবদান সানন্দে গ্রহণযোগ্য। এই মতবাদ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার বহু অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর প্রথাকে দূর করতে পেরেছে। প্রচলিত সমস্ত নিয়মনীতিকে প্রয়োগবাদ কিছুটা সন্দেহের চোখে দেখে এবং আমাদের ঐ পথ প্রাচীন বলে অনুসরণ করতে নিষেধ করে। প্রাচীন যুগের অনেক চিন্তাধারা বর্তমান সময়োপযোগী নয়। প্রয়োগবাদের মতে চিন্তাকে মুক্ত রাখা দরকার কেন না বদ্ধজলাতে আবর্জ্জনার সৃষ্টি হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে অভিনব পরীক্ষা ও গবেষণায় প্রয়োগবাদের বিশেষ উৎসাহ। বিশেষতঃ শিক্ষার পদ্ধতির (method) ক্ষেত্রে তাঁরা পুরান গতানুগতিকতাকে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছেন। কৃতকার্য্যও হয়েছেন।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্বন্ধ কেমন হবে এ নিয়ে প্রয়োগবাদীদের দৃঢ় মতামত আছে। শিক্ষার্থী শিক্ষকের পায়ের কাছে বিনম্র বাধ্যতায় নিতান্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকবে প্রয়োগবাদীরা (ভাববাদী দর্শনের) এই ধারণার প্রবল প্রতিবাদ করেন। প্রয়োগবাদ শিশুকে নিছক অপরের চিন্তার ফল সংগ্রহ করতে দিতে প্রস্তুত নয়। শিশু নিজের আগ্রহে জীবন নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করে তার সাধ্যমত জ্ঞান ও কুশলতা আহরণ করে জীবনের সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত থাকবে। শিক্ষা অর্থ শিশুকে পাখীপড়া করে আমাদের নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী কিছু জ্ঞান দান নয় বরঞ্চ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ, সম্ভাবনাময় পরিবেশের আয়োজন করা যাতে নিজেই পরীক্ষানিরীক্ষামূলক সৃজনী চিন্তায় ও কর্মে নিরত হতে পারে। প্রকৃত জ্ঞান, কোন মৃত সংস্কৃতিকে পুরোন কীটদষ্ট বই পড়ে জানা নয়, জ্ঞানকে জীবনের প্রয়োজন মত কাজে লাগানোই শিক্ষা।

প্রয়োগবাদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য চিন্তার চেয়ে কাজে অধিক গুরুত্ব দান। তত্ত্ব ও তত্ত্বের ব্যবহারের মধ্যে কোন অন্তর থাকা উচিত নয়। এই মূলতত্ত্ব হতে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা মূল্যবান নির্দ্দেশ পাই, "কাজের দ্বারা শিক্ষালাভ" (Learning by doing)। প্রয়োগবাদ এটিকে বেদবাক্যের মত মনে করে। এদের মতে, শিশুরা মৌখিক বক্তৃতা শোনার চেয়ে নিজের হাতে কাজ করে অনেক বেশী ভাল শিখতে পারে। বইপত্রের প্রতি প্রয়োগবাদের গভীর অনাস্থা। এখানে স্বভাব-

বাদের সঙ্গে প্রয়োগবাদের মিল লক্ষ্যনীয়। কিন্তু স্বভাববাদের চেয়ে প্রয়োগবাদ আরো অগ্রসর হয়ে শিক্ষার নতুন পদ্ধতি রচনার চেষ্টা করেছে। শুধুমাত্র শিশুকে জীবনের প্রয়োজনের দিকে আকৃষ্ট করা, বা তাকে হাতে কলমে কাজ শেখানো, শিক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নয়। শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিশুকে সম্ভাবনাপূর্ণ পরিবেশে উপস্থাপিত করতে হবে। সেখানে সমস্যার সম্মুখীন হয়ে প্রশ্ন করে চিন্তা করে সে নিজের সমস্যার সমাধান করতে শিখবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি হতে বিদ্যালয়ের বিষয়বস্তুগুলির চুলচেরা ভাগাভাগি করা অর্থহীন। একটি বিষয়, অপর বিষয় হতে কঠিন সীমারেখা দিয়ে বিভক্ত নয়। মানুষের সমস্যা সমাধানে যে কার্য্যাবলী প্রয়োজন, তাই হচ্ছে বেশী দরকারী। বিদ্যালয়ের পাঠ্যবস্তু নিজস্বগুণে মূল্যবান নয় জীবনের সমস্যা পূরণে কাজে লাগার সম্ভাবনাতে তাদের দাম। শিক্ষার্থী যদি বিষয়বস্তুর পরিবর্তে তার নিজের আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী কিছু কার্য্যক্রম খুঁজে পায়, যেটাকে সে প্রয়োজনীয় মনে করে, তবে সেটা শিখেই সে লাভবান হবে। যে সব শিক্ষা সে নিতে চাইবে সেগুলি তার নিজের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনে। তাদের মূল্য নির্ধারিত হবে সেই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য তাদের উপযোগিতা দ্বারা।

স্কুল পাঠ্য বিষয়গুলিকে সম্বন্ধবদ্ধ (integrate) করার আন্দোলন কিন্তু সর্ব্বপ্রথম প্রয়োগবাদীরা আরম্ভ করেন নি। এঁদের আগে সমন্বয়বাদী আরেক দলের কথা অ্যাডামস্ তাঁর শিক্ষার ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন। এঁরা দার্শনিক দেকার্ড ও কঁতের মত অনুসরণ করে বলেছেন যে যেহেতু বুদ্ধি ও জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয়ের গুণ আছে অতএব সমস্ত প্রকৃত শিক্ষারই সমন্বিত হওয়া উচিত। প্রকৃতি যে বিষয়গুলিকে এক ও অখণ্ডভাবে উপস্থিত করেছেন শিক্ষকরা যেন সেগুলিকে টুকরো করে ভাঙ্গার চেষ্টা না করেন।[১] ঠাট্টা করে ল্যাভিস বল্লেন "শিক্ষা ব্যাপারটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাঙ্গা জিনিষের একটা সমাহার। এখানে শিক্ষকের এক ভগ্নাংশ ছাত্রের এক ভগ্নাংশকে উদ্দেশ্য করে (অ্যাডামস্ আবার যোগ করলেন) কোন বিষয়ের এক ভগ্নাংশের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন।"[২] অল্ডাস হাক্সলী বল্লেন, "ফলে এই হল যে বিশ্বসংসারের সমস্ত জ্ঞান ক্রমিক জ্ঞান না হয়ে টুকরো টুকরো পরস্পরবিচ্ছিন্ন সংবাদ হিসেবে পরিবেশিত হয়। সেই জ্ঞানের

১। ইভল্যুসন অব এডুকেশনাল থিয়োরী। অ্যাডামস্। পৃঃ ১৮৯।
২। ল্যাভিস। মডার্ণ ডেভেলপমেণ্টস্ ইন এডুকেশনাল প্র্যাকটিশ। পৃঃ ১৭।

ছোট্ট খণ্ডাংশগুলো বিরাট অজ্ঞানতা ও দুর্ব্বোধ্যতার কালো তমসায় ক্ষীণ দুর্ব্বল তারকার জ্যোতির মত কিছুই আলোকিত করতে পারে না।"[১]

এসব আলোচনার পর স্থির হয় যে জ্ঞানের বিষয়গুলি যেমন বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনে পরস্পরসম্বন্ধ, স্কুলের মধ্যেও সেগুলি পরস্পরসম্বন্ধিত থাকুক। একদা, প্রাচীন সাহিত্যের চর্চাকে সমন্বয়ের সূত্র বলে মনে করা হত। কিন্তু বর্তমান যুগে তেমন সমন্বয়ের সূত্র কোন বিষয়কে বলা যাবে? প্রথমেই বলে নেওয়া যাক যে বুদ্ধিমান শিক্ষার্থী গোড়া হতেই তার পাঠ্য বিষয়ে নিজস্ব কেন্দ্রবিন্দু (core) স্থির করে নেবে। তবুও শিক্ষক বিষয় নির্ব্বাচনের পুরো দায়িত্ব ছাত্রদের ওপর ছেড়ে দিতে পারেন না। তত্ত্বগতভাবে, নিঃসন্দেহে, সেই সমন্বয়ের সূত্র মানুষের জ্ঞানের মধ্যেই পাওয়া যায়। এই পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানভাণ্ডারে, বিজ্ঞান ও মানব সম্বন্ধিত সব বিষয়গুলোই উপস্থিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে (in practice) সমস্ত বিজ্ঞান ও কলাশাস্ত্রে সবার পূর্ণ জ্ঞান লাভ তো সম্ভব নয়। স্পেন্স রিপোর্টে বলা হয় যে পাঠক্রমের কেন্দ্র (core of curriculum) হিসেবে ইংরেজী সাহিত্য ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে ধরা যেতে পারে। যেমন ইংরেজীসাহিত্য রচনা, ইতিহাস, ভূগোল বাইবেল ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিকই কি এরা সমস্ত শিক্ষার মূল কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে? অলডাস হাক্সলীর মতে মানুষের জ্ঞানের সমন্বয়ের সূত্র হবে মানুষ নিজে, "কেন না মানুষের ক্ষমতার ও চরিত্রের যত পার্থক্যই থাকুক সমস্ত মানুষই জানতে আগ্রহী[২]।" বিদ্যার ও অভিজ্ঞতার যে সমন্বয় করা হবে তা হবে মানুষের শর্ত অনুযায়ী।

প্রয়োগবাদীরা শিক্ষার্থীর জীবন ও অভিজ্ঞতাকে সমন্বয়ের সূত্র বলে ধরলেন। তার বর্তমানের সব কার্য্যাবলীকে বিশেষ করে সমন্বয়ের সূত্র বলে ধরা যায়। একথা যেমন সত্যি যে মানুষের জ্ঞান ও কর্মকুশলতা বহুমুখী এ কথাও তেমন সত্যি যে একই মন বিদ্যা ও কুশলতা আহরণে প্রবৃত্ত।

সাধারণত কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ আরম্ভ করলে মানুষ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য নিজস্ব জ্ঞান ও কুশলতাকে সুসম্বদ্ধ করে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করবে। কাজেই উদ্দেশ্যমুখী কাজ, সমন্বয় সাধনের সবচেয়ে সার্থক উপায়। প্রয়োগবাদী শিক্ষার পদ্ধতি দিয়ে, প্রতিটি বিষয় যে পরস্পরের উপর নির্ভর, ছাত্রদের এটি ভাল করে বুঝতে সাহায্য করবে।

১। অলডাস হাক্সলী। এণ্ড্স্ অ্যাণ্ড মীন্স্।
২। " পৃঃ ২০

স্কুলের পাঠ্যবিষয়গুলি রাখা হয়েছে শুধুমাত্র বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করার জন্য নয়। এগুলি হচ্ছে জগৎকে ভালভাবে বোঝার চেষ্টায়, মানুষের ব্যবহৃত আয়ুধ। মনুষ্যজাতি তার অভিজ্ঞতা হতে এই জ্ঞানভাণ্ডার সঞ্চয় করেছে। এগুলিকে জীবন ধারণের কাজে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা উচিত। প্রয়োগবাদীরা বলেন যে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও বিষয়গুলির সমন্বয়ের চেষ্টা করা প্রয়োজন। শিক্ষার বহু অপ্রয়োজনীয় আবর্জনাকে নির্মমভাবে বর্জন করে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে শিক্ষার্থীর জীবনের প্রয়োজনের সঙ্গে অর্থপূর্ণভাবে যোগ করা উচিত। আমেরিকান প্রয়োগবাদী তার বিশ্বাস ও ব্যবহারে পার্থক্য রাখেনি। তার কাজের মধ্যে তার মত ও বিশ্বাস প্রতিফলিত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উদ্দেশ্যমুখী কর্মভিত্তিক ও সুসম্বন্ধিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত। এরপরে মাধ্যমিক স্কুলে সে ধরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। আমেরিকান প্রয়োগবাদীর থেকে আমাদের সকলেরই অনেক কিছু শেখার ও তা দিয়ে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

শিক্ষার পদ্ধতিকে (learning process) সুসম্বন্ধিত করার বিষয়ে প্রয়োগবাদ যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন আমরা অনায়াসেই তার সঙ্গে সহমত হতে পারি। বস্তুতঃ শিক্ষাপদ্ধতিতে প্রয়োগবাদী মতের অভিনবত্ব ও কার্য্যকারিতা বিশ্বজন স্বীকার করেছেন। কেবল দুয়েকটি বিষয় আলোচনা সাপেক্ষ। প্রয়োগবাদীরা শিক্ষার পদ্ধতি সম্বন্ধে মাথা ঘামিয়েছেন কিন্তু পরীক্ষার সম্বন্ধে কথা বলেননি। রেমণ্ট কিছুটা ধারালো উত্তর দিয়ে বলেছেন, "যদি বর্তমান পরীক্ষাব্যবস্থাকে কিছুতেই পরিবর্তন করা যাবেনা বলে মনে করি তবে শিক্ষা সম্বন্ধে কোন ভাবনা না করাই ভাল।"[১] মৃদুভাবে বল্লেও, প্রয়োগবাদীদের মত হবে যে বাইরের পরীক্ষা (external examination)র ফল দিয়ে শিক্ষার মান বিশেষ বোঝা যায় না। পরীক্ষা কোনভাবেই শিক্ষালাভে সাহায্য করেনা। কিন্তু পরীক্ষার ধরন আমাদের পছন্দ না হলে তার পরিবর্তন তো করা সম্ভব।

পাঠক্রমের সমন্বয়ের নীতি প্রথমে মার খায় 'বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের' হাতে। অঙ্কের বিশেষজ্ঞ শিক্ষক বা ঝানু ল্যাটিনের শিক্ষক বলবেন স্কুলে অঙ্ক বা ল্যাটিন ভিন্ন আর কিছু শিখবার নেই। প্রাচীন কালের একক-শিক্ষক-বিশিষ্ট স্কুলে অবশ্য সমন্বয়ের অসুবিধা নেই। বর্তমান কালের ধারণা, 'বিশেষজ্ঞ শিক্ষক' রাখার প্রথা মোটামুটিভাবে বাঞ্ছনীয় তবে কতগুলো সাবধানতা অবলম্বন করলে তবেই এর দ্বারা উপকার হবে। অ্যাসোসিয়েসন অব এডুকেশন কমিটি এবং ন্যাশনাল ইউনিয়ন

১। রেমণ্ট। মডার্ন এডুকেশন। ইট্‌স্ এইম্‌স্ এ্যাণ্ড মেথড্‌স্। পৃঃ ১৭৮

অব টিচারস্, বিশেষজ্ঞ শিক্ষক রাখা অনুমোদন করে বল্লেন "মাঝে মাঝে তাদের মিলিত হয়ে নিজেদের মধ্যে মতের আদান প্রদান করার সুবিধা দেওয়া দরকার যাতে স্কুলের সব বিষয়ক্রম ও কার্য্যক্রম সুসম্বন্ধ ও সমন্বিত হতে পারে। এই রকম পারস্পরিক আদান প্রদানে শিক্ষার্থীর কাজ ও স্বভাবের যথাযথ মূল্যায়ণ হতে পারবে।"[১]

বৃটেনের এ ধরনের সাবধানী মধ্যপন্থা আশ্রয়ী প্রস্তাবের সঙ্গে অতলান্তিকের অপর পারের দেশগুলির দুঃসাহসিক প্রস্তাবের প্রতিতুলনা করতে পারি। তবে একথা হয়তো বলা অনুচিত হবেনা যে বিশেষজ্ঞের বিষয় সম্বন্ধে গভীরতর জ্ঞান থাকার দরুণ পড়াশোনার মান বৃদ্ধি হবে। বিদ্যালয়ের পরিচালনার দিক দিয়েও আলাদা আলাদা বিষয়ের বিভাগ থাকাই সুবিধা। তবে মাঝে এদের মেলামেশার, আলোচনা চক্র ইত্যাদির আয়োজন করা প্রয়োজন।

প্রয়োগবাদীরা কিন্তু সমস্ত বিষয়ের সমন্বয় দাবী করেন না। যদি কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানে শুধুমাত্র আঙ্কিক সমাধানের প্রয়োজন হয় অথবা শুধুমাত্র বিজ্ঞানের জ্ঞানের দরকার হয়, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই বিশেষ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জিত না হবে ততদিন সেই সমস্যা সমাধান করা যাবে না। এইভাবে কোন বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ শাস্ত্রের বা বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করতে দিতে প্রয়োগবাদীদের কোন আপত্তি নেই। তা ছাড়া প্রয়োগবাদী স্কুলে, ছাত্রদের তাৎক্ষণিক সমাধানে তৎপর করে তোলার ব্যবস্থা করা ছাড়াও তাদের ভবিষ্যৎ জীবনসমস্যা সমাধানের জন্য কুশলী ও কর্মদক্ষ করে তোলা প্রয়োজন। তার কুশলতা, ভবিষ্যৎ সমস্যা সমাধানের কাজে লাগবে।

আমরা যেগুলিকে 'পাঠ্যবিষয়' বলি তারা বাস্তবিক সমস্ত মনুষ্যজাতির অভিজ্ঞতার সঞ্চিত ফল এবং প্রতিটি ছাত্রেরই সেই ভাণ্ডারে অবাধে প্রবেশাধিকার আছে। তাতে প্রয়োগবাদীর আপত্তি নেই, তার প্রধান লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে যে পাঠ্যবিষয়গুলি যেন অনভ্যাসে ও অব্যবহারে ভাণ্ডারজাত হয়ে প'ড়ে না থাকে। যেন তারা সর্ব্বদা প্রয়োগের দ্বারা অমলিন ও কার্য্যক্ষম থাকে; ঘুনধরার হাত হতে রক্ষা পায়। তাঁরা চান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা যেন তাদের জীবনসমস্যা সমাধানের উপযোগিতার উপর মূল্য আরোপ করেন। শুধুমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভের জন্য কেউ বিদ্যালাভে রত হয় না। তাই বর্ত্তমান ঘটনাবলীকে বোঝার জন্য

১। দ্য এডুকেশন ইয়ার। পৃঃ ১০৩, জয়েন্ট কমিটি রিপোর্ট অব দ্য অ্যাসোসিয়েশন কমিটিস্ এ্যাণ্ড দ্য ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব টিচারস্।

ইতিহাস শিখতে হবে। অঙ্ক শেখার উদ্দেশ্য হবে জড় পরিবেশকে ভাল করে বোঝা এবং সেই জ্ঞানের প্রয়োগ করে তার নিয়ন্ত্রণ করতে পারা। এভাবে জীবনের নানা গাণিতিক সমস্যার সমাধানই হবে অঙ্ক শেখার উদ্দেশ্য।

নৈতিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে স্বভাববাদীর চেয়ে প্রয়োগবাদীরা বেশী দায়িত্বপরায়ণ, প্রয়োগবাদীরা শিক্ষার্থীকে যে স্বাধীনতা দেবেন তা স্বেচ্ছাচারের জন্য ঢালাও অনুমতি (license) দেওয়া নয়। প্রথমতঃ সেরকম কোন নৈতিক সিদ্ধান্ত নেবার সময় শিক্ষক বন্ধু ও উপদেষ্টা হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। কিছু স্বনির্ব্বাচিত কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে শিখবে। ছাত্ররা এখানে নিজেদের স্বাধীন আনন্দময় উদ্দেশ্যমুখী কার্য্যাবলীর মধ্য দিয়ে আত্মনির্ভ-রতা, সৃজনীক্ষমতা বাড়াতে পারে বলে প্রযোগবাদীরা যে দাবী করেন তা বহুলাংশেই সমর্থনযোগ্য। তাদের কিছু প্রকৃত সৃজনশীল কাজ দিয়ে, কাজের মধ্যে নিজেদের পূর্ণভাবে আত্মমগ্ন করতে শিখিয়ে তাদের নৈতিক শৃঙ্খলা শেখানো যাবে। শিক্ষার্থীদের দিতে হবে সমাজসেবার নানাবিধ কাজ কেননা বিদ্যালয় আর সমাজ হচ্ছে অঙ্গাঙ্গী। এভাবে ছাত্ররা সুনাগরিকত্বের শিক্ষা লাভ করবে। বিদ্যালয়ের প্রধান দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য মানুষের নৈতিক ও সামাজিক সত্তার বিকাশে সাহায্য করা ও সমাজের সঙ্গে তাকে যুক্ত করা। যেহেতু স্কুল সমাজের ক্ষুদ্র সংস্করণ, তার উপর শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর প্রয়োজনে স্থাপিত, সুতরাং এখানে আরো সরল ও বিশুদ্ধ পরিবেশে শিক্ষার্থীদের চরিত্রগঠনের ব্যবস্থা হওয়া কাম্য ও সম্ভব।

অবশ্য প্রয়োগবাদকে সমর্থন করতে কিছুটা দ্বিধাবোধ করি যখন প্রয়োগবাদীরা আরো অনেকটা বেশী অগ্রসর হয়ে বলেন যে প্রত্যেক যুগের প্রজন্ম নতুন কাল অনুযায়ী নতুন নীতিবোধ সৃষ্টি করবে এবং পুরোনকালের লোকরা তাঁদের প্রাচীন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মুক্ত হয়ে নব প্রজন্মের সব কাজ ও ইচ্ছাকে দমন ও শাসন করার কাজ হতে বিরত থাকবেন। যদিও কর্ত্তৃত্বপরায়ণতার সঙ্গে শাসন দমনের নীতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আমরা প্রয়োগবাদের বিপদবাণী গ্রাহ্য করি, তবুও নানের সঙ্গে সহমত হয়ে একথাও বলি "শিক্ষার ক্ষেত্রে নির্দ্দেশের (suggestion) যথেষ্ট মূল্য আছে। শিক্ষক যেন তাঁর অভিজ্ঞতা ও পরিণত বিদ্যা তাঁর ক্ষুদ্র সংস্থা (ছাত্রসমষ্টি)-র সামনে রাখেন। তারা তা থেকে প্রয়োজন মত পথনির্দ্দেশ পাবে।"[১] নৈতিক শিক্ষাদান ব্যাপারে প্রয়োগবাদী ও ভাববাদীরা একমত নন। ভাববাদীরা মনে করেন কতগুলো শ্রেয়ঃনৈতিক আদর্শ চিরন্তন, স্থান কালের

১। নান। এডুকেশন ইট্‌স্ ডাটা অ্যাণ্ড ফার্ষ্ট প্রিন্সিপল্‌স্, পৃঃ ১৪৯

সীমাতীত। এগুলি সর্ব্বকালের মানুষকে পথনির্দ্দেশ করবে। সুতরাং ধীরে ধীরে এই আদর্শগুলি নতুনদের কাছে পৌছে দেওয়া শিক্ষকের কর্তব্য। প্রয়োগবাদীরা এ কথায় বিশ্বাস করেন না।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগবাদের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান 'প্রজেক্ট' রীতি। এই পদ্ধতির মূল প্রতিজ্ঞা হচ্ছে, শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় সর্ব্বাগ্রে একটি ব্যবহারিক সমস্যা উপস্থাপিত করতে হবে। সেই সমস্যার সমাধানই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন তবে সমাধান কালে কিছু কিছু জ্ঞানবিদ্যা কুশলতা অর্জ্জিত হতে পারে। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সেই বিষয়গুলি শেখার প্রয়োজনীয়তা (felt need) অনুভব করবে। এর জন্য সুসম্বদ্ধ জ্ঞান লাভ হল কিনা তা প্রয়োজনীয় বা বাঞ্ছনীয় হলেও নিতান্ত দূরের লক্ষ্য। প্রধান ও প্রথম প্রয়োজন এই মুহূর্তেয় তাৎক্ষণিক সমস্যার মোকাবিলা করা।

স্টিভেনসন প্রজেক্টের নিম্নলিখিত সংজ্ঞা দিয়েছেন "প্রজেক্ট হল একটি সমস্যাকে স্বাভাবিক পরিবেশে রেখে সমাধানের প্রক্রিয়া।"[১] "স্বাভাবিক পরিবেশ" কথাটাতে শিক্ষকদের একটু ধাঁধা লাগে। আরেকটি গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা হল, "স্বনির্ব্বাচিত একটি সমস্যা যার সমাধানে গঠনমূলক প্রয়াস ও চিন্তা দরকার।"[২] দুটি ব্যাখ্যাতেই একটি জিনিষ স্পষ্ট যে বিদ্যালয়ের কাজগুলি জীবনের সমস্যার মত জীবন্ত ও উদ্দেশ্যপূর্ণ করা দরকার। এগুলির সমাধানে ছাত্ররা নিজেরাই আগ্রহী হবে যাতে করে বাঞ্ছনীয় ও ঈপ্সিত ফললাভ করতে পায়ে।

প্রজেক্ট, ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত প্রচেষ্টার দ্বারা সমাধান করা সম্ভব। প্রয়োগবাদীরা দ্বিতীয় ধরনের প্রজেক্টের সমর্থক কেননা সমষ্টিগত সমাধানে কতগুলি সামাজিক মূল্যবান শিক্ষা লাভ হবে যথা—সামাজিক সমষ্টিগত কাজে পরস্পরের সহযোগিতা ও সামাজিক সম্বন্ধের দ্বারা, পরিশ্রমের ভাগ বাঁটোয়ারা এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য সানন্দ দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যাদি। (প্রজেক্টের মাধ্যমে) তারা এধরনের যৌথ প্রচেষ্টায় পারস্পরিক সহযোগিতার মূল্য বুঝতে শেখে, এদের মাধ্যমে ভবিষ্যতের জটিল সমাজে কার্য্যকরী ভূমিকা নেওয়ার মূল্যবান শিক্ষা পায়।

১। ......"a problematic act carried to completion in its natural setting"—Stevension. The project method of teaching p. 43.

২। "a voluntary undertaking which involves constructive effort or thought and eventualism to objective results."—Thomas and Lang. Principles of modern education—p 262.

ছোটদের জন্য (প্রাথমিক স্কুলে) খেলার ঢংয়ে নানারকম প্রজেক্টের পরিকল্পনা করা হয়। প্রাক্‌প্রাথমিক স্কুলে 'পরিবার', 'ডাকঘর', 'দোকান' ইত্যাদি খেলার মতন করে প্রজেক্ট চিন্তা করা যায়। কিন্তু এই খেলার মধ্যে যা কাজ থাকবে সে যেন সত্যিকার কাজের অনুরূপ হয়। অবশ্য খুব ছোটদের জন্য প্রজেক্ট নেওয়ার কতগুলি বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে, ছোটরা পড়তে জানে না আর দলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতেও খুব পটু নয়। এরা অঙ্কও ভাল কষতে জানে না। এ সব বাধাগুলি দূর করার জন্য প্রথম হতেই ছোট শিশুদের পড়ালেখা শেখানো ও সাধারণ জ্ঞানের ব্যবস্থা করা হয়। কারণ প্রজেক্ট সফল করতে হলে এসব প্রাথমিক জ্ঞান শিশুদের থাকা দরকার। শিশুরা যখন এই 'দরকার' বুঝতে পারে তখন তারা নিজেরাই শিখতে আগ্রহী হয়ে পড়ে।

প্রয়োগবাদীরা অবশ্য স্বীকার করেন যে উচ্চতর শ্রেণীতে প্রজেক্টের পরিকল্পনা করা বেশ কঠিন। কারণ সেই শ্রেণীর উপযুক্ত প্রজেক্টগুলির বেশ খানিকটা বিস্তার ও গভীরতা থাকা দরকার। অবশ্য কোন নাটক বা সমবেত বাজনা (অর্কেষ্ট্রা)র প্রজেক্ট নেওয়া হলে কথা, সঙ্গীত, সাহিত্য, শিল্পকাজ, সূচীশিল্প ও অঙ্কন কাজে লাগানো যায়। এমন কি খরচপত্রের হিসেব রাখার জন্য অঙ্ককেও কাজে লাগানো যাবে। এর সঙ্গে মঞ্চে আলোক সম্পাতকেও কাজে লাগানো যাবে।

অবশ্য বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের বা শ্রেণীকক্ষের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্টের পরিকল্পনা দেওয়া শিক্ষকের পক্ষে মুস্কিল। কেননা প্রজেক্টের ধারণা আসা উচিত শিক্ষার্থীর নিজের গরজ (felt need) হতে। বাইরের কারো কাছ হতে প্রজেক্টের পরিকল্পনা এলে প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। প্রজেক্টগুলি শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজন হতে উদ্গত হবে। রস একটি প্রজেক্টের উদাহরণ দিলেন। একটি শহরের ফুলের বাগান জলের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছিল। সে সময়ে শহরে তীব্র জলকষ্ট চলতে থাকায় কর্পোরেশনের জলের ব্যবস্থা করতে উর্দ্ধতন কর্মাধ্যক্ষরা রাজী হলেন না। কিন্তু স্কুলের নাছোড়বান্দা এক বিজ্ঞানের শিক্ষক এতে ভরসা না হারিয়ে লক্ষ্য করলেন যে বাগানের সামান্য অংশ ভেজা। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে বাগানের মধ্যে কোথাও জলের উৎস আছে। সুতরাং জলের জন্য আর সরকারী কর্মচারী-দের বিব্রত না করলেও চলবে। তিনি ঠিক করলেন বাগানে কূপ খনন করার একটা প্রজেক্ট নেওয়া যাবে। এই পরিকল্পনায় ছাত্ররা পরম উদ্দীপনার সঙ্গে সাড়া দিল। এই প্রজেক্টটি কার্য্যকরী করতে হলে ছেলেদের প্রথমেই বেশ খানিকটা

ব্যবহারিক বিজ্ঞান পড়ে নিতে হল। তাছাড়া এজাতীয় দুরূহ কাজ যথাসময়ে শেষ করার দায়িত্ব নেওয়াও অমূল্য নৈতিক শিক্ষা। যার মূল্য অগ্রাহ্য করার নয়। মাষ্টার মশাই তখন বুদ্ধি করে দেখালেন যে জলের মধ্যে পাথর ফেললে তার ওজন জলের মধ্যে কম হয়। ছাত্ররা সবাই এই অদ্ভুত ঘটনার ব্যাখ্যা জানতে চাইল। এর পরে আর্কিমিডিসের সূত্র শেখানো কিছুই কঠিন হল না। ভার বইবার জন্য পুলীর (pulley) সন্ধানে কর্মকারের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন হল না। একটি ছেলে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দিয়ে জলের গভীরতার মাপ করতে শিখলো। "অন্য সবার মত হল যে লম্বা মাপক দিয়ে না মেপে মণ্ডলাকৃতি কোন মাপক দিয়ে জলের গভীরতা মাপ করতে পারলে ভাল হয়। তার জন্য কিভাবে সোজা রেখাকে বৃত্তরূপে পরিণত করা যায় তা শেখাতে হল।" এ জাতীয় প্রজেক্টে একই সঙ্গে অনেক কর্ম ও বিদ্যার সহাবস্থান সম্ভব। মাষ্টারমশাইয়ের সৌভাগ্য যে এমন একটি প্রজেক্টের সন্ধান পেয়েছিলেন। এই বিচক্ষণ শিক্ষকটি সেই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনার উল্লেখ করি। লোড্ হাম্ গ্র্যাঞ্জ, বোর্ষ্টাল ইনষ্টিট্যুট নামে একটি কিশোর ও যুবকদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য একটি কলেজ-বাড়ী স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। এই প্রজেক্টে সেখানকার সমস্ত কিশোর অপরাধী শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হয়ে বাড়ী তৈরীতে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেছিল যা আদর্শ চরিত্রের ছেলেদেরও ঈর্ষা উদ্রেক করবে। তারা উৎসাহিত হয়ে অধ্যক্ষ্যের নির্দেশে বাড়ী তৈরীর কৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে। পরে সেই সংস্থা ছাড়বার পর তাদের অর্থকরী একটা বিদ্যাও শেখা হয়ে গেল। তাছাড়া এই যৌথ কাজের মধ্য দিয়ে সহযোগিতা ও সমাজ সেবার মূল্যবান নৈতিক শিক্ষা লাভও হল।

প্রয়োগবাদীদের প্রজেক্ট সম্বন্ধে একটি সত্য অভিযোগ হচ্ছে যে এসব প্রজেক্ট-গুলি যত ভাল করে তৈরি করাই হ'ক, ছাত্রদের জ্ঞানের মধ্যে অনেক বড় বড় ফাঁক রেখে যায়, কেননা বিদ্যা বা জ্ঞান লাভ প্রজেক্টের মূল উদ্দেশ্য নয়। যদি সমস্যা সমাধানে কিছু জ্ঞান লাভ হয়ে গেল সেটা খানিকটা বাড়তি প্রাপ্তি। সুতরাং প্রজেক্টলব্ধ জ্ঞানের মধ্যে ধারাবাহিকতা থাকে না। গডক্রে টম্সনের মত সব শিক্ষাবিদ্রাই বলবেন "এ ধরনের অতিরিক্ত শিক্ষা দরকারী হতে পারে কিন্তু জীবনের পক্ষে যথেষ্ট নয়।"[১] সমস্ত প্রয়োগবাদীরাই স্বীকার করেন যে প্রজেক্টের

১। এ মডার্ণ ফিলসফি অব এডুকেশন—টমসন p. 95

দ্বারা যে জ্ঞান দেওয়া হবে তাকে সুসম্বদ্ধ ও ক্রমান্বিত করা দরকার। কেননা জ্ঞান সুসম্বদ্ধিত হলে বর্তমান ছাড়া ভবিষ্যতেও কাজে লাগে। টমসনের সতর্ক সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমরা একমত হয়ে বলি যে "যে শিক্ষায় রুটিন বাঁধা শিক্ষার সঙ্গে অতিরিক্ত শিক্ষার বিচক্ষণ মিশ্রণ হবে, সেই শিক্ষাকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা বলা যাবে।"[১]

প্রয়োগবাদীরা জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে মেলাতে চেয়েছেন কেননা বাস্তবিক-পক্ষে জীবনযাপনের শিক্ষাই তাৎপর্য্যপূর্ণ শিক্ষা। রেমণ্টের ভাষায় "শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ, আন্তরিক সহযোগিতা (wholehearted co-operation) প্রয়োগবাদী শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু।"[২] আমেরিকান প্রয়োগবাদী শিক্ষক এ দাবা করেন না যে তাঁরাই সর্বপ্রথম শিক্ষার এই মূলতত্ত্বটি (শিক্ষার্থীর আন্তরিক ও পূর্ণ সহযোগ) আবিষ্কার করেছেন তবে তাঁরা নিঃসন্দেহে এই তত্ত্বের ব্যবহারে অন্যদের চেয়ে বেশী-দূর অগ্রসর হয়েছেন। বহুদিন আগেই অ্যাডামস্ দেখিয়েছেন যে জার্মান শিক্ষকরা শিক্ষার পূর্ব্বে শিক্ষার বিষয়টি ছাত্রদের খুব সংক্ষেপে বলে নেন। পুরোন ধরনের শিক্ষাতেও বক্তৃতা দেওয়ার আগেই ছাত্রদের বলা হয় তারা কি বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে যাচ্ছে। তাহলে পড়ানোর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের অস্পষ্টতা থাকে না, তাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়। উদাহরণ দেওয়া যাক্। ধরা যাক্, গণিতের ক্লাশে একটি সমস্যা আরম্ভ করা হল, তার সমাধানের জন্য নতুন গাণিতিক জ্ঞান বা কুশলতা শিক্ষার দরকার। নতুন জ্ঞান শেখানো হল সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে। কিন্তু সমস্যাটি সর্ব্বদা প্রাত্যহিক জীবন হতে সংগৃহীত সমস্যা নাও হতে পারে। মানুষ নিজের মাথা হতে, বা বুদ্ধি দিয়ে কোন সমস্যা ভেবে নিতে পারে। কারণ সে সমস্যার সমাধানে যা যা স্তর পেরোতে হবে এবং যে সব কাজ শিখতে হবে সবই হবে উদ্দেশ্যমুখী। তবে কোন ব্যবহারিক সমস্যা বা বৌদ্ধিক সমস্যা, গণিত শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু হবে, তা নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও উৎসাহের ওপর। এমন সমস্যা নির্ব্বাচন করা দরকার যা প্রকৃতই উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং সেখানে শিক্ষার্থীরা পরিপূর্ণ আগ্রহে নিজেরা সমস্যা সমাধানে ব্রতী হবে। এই প্রক্রিয়াতে প্রজেক্টের প্রধান উদ্দেশ্য (শিক্ষার্থীদের উৎসাহপূর্ণ শেখা) সফল হবে। এবং প্রজেক্ট সম্বন্ধে যে সাধারণ সমালোচনা, যে এটি অত্যন্ত বেশী 'কেজো', শুধু ব্যবহারিক সমস্যা নিয়েই প্রজেক্ট তৈরী হয়, এইটি খানিকটা এড়াতে পারা যাবে।

১। টমসন। এ মডার্ণ ফিলসফি অব এডুকেশন। পৃ: ৯৫
২। রেমণ্ট। মডার্ণ এডুকেশন: ইট্স্ এইম্স্ অ্যাণ্ড মেথড্স্ পৃ. ৩৩৭

প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এধরনের জীবন্ত আগ্রহউদ্দীপক নানা সমস্যার কথা চিন্তা করা যায়। ভূগোল শেখানোর জন্য শিক্ষার্থীদের বাইরে নিয়ে যাওয়া যায়। বিজ্ঞান শেখানোর জন্য 'কেমন করে এটা কাজ করে' ধরনের প্রজেক্টও যথেষ্ট উৎসাহসঞ্চারক। বৈদ্যুতিক ঘণ্টার ক্রিয়াতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রথমেই না শিখিয়ে প্রথমে তাদের সত্যিকার ঘণ্টা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে দেওয়া যায়। তাহলে এরা নিজেরাই এর ক্রিয়াতত্ত্ব বুঝতে শিখবে। তেমনি মোটর সাইকেলের নীরস বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রথমে না শিখিয়ে তাদের হাতেকলমে যন্ত্রটি খুলে দেখানো যেতে পারে। এ সমস্ত প্রজেক্টের উদাহরণ হতে দেখা যায় বিজ্ঞানকে বুদ্ধিসম্মত-ভাবে শেখানো যায় এবং তার ব্যবহারিক প্রয়োজনও জানা হয়ে যায়।

রাস্ক বলেন, "প্রয়োগবাদের পদ্ধতি না গ্রহণ করলে আমাদের বিকল্প থাকে শুধু অন্ধভাবে শিক্ষা দেওয়া, একথা কিন্তু সত্য নয়। ব্যবহারিক সমস্যা না নিয়েও বুদ্ধির দ্বারা যন্ত্রপাতির তথ্য বোঝা সম্ভব।"[১]

সুতরাং বাঁধাধরা ভাবে প্রজেক্ট পদ্ধতি ব্যবহার না করেও প্রয়োগবাদের মত অনুযায়ী শিক্ষার প্রক্রিয়া রচনা করতে পারা যায়।

রেমণ্টের মতে "প্রজেক্ট পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অবদান এই যে এই মতবাদ শিক্ষার্থীর বাস্তব জীবন্ত আগ্রহকে স্কুলের সমস্ত বিষয়ে অনুপ্রবেশ করতে প্রোৎসাহিত করেছে। কিন্তু এর সবচেয়ে বড় দোষ যে এটি স্কুলের পাঠক্রম, কার্য্যাবলী বা পাঠক্রম অতিরিক্ত কার্য্যাবলী, বাইরের সামাজিক কার্য্যাবলীর আদলে করাই, সব রোগের মহৌষধ এমন একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে।"[২]

প্রয়োগবাদ বহু বিষয়ে অভিনব হলেও নিখুঁৎ আদর্শ শিক্ষাতত্ত্ব একথা বলা যায় না। প্রয়োগবাদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ যে এই মতবাদ শিক্ষার যথেষ্ট বিশদ ও অর্থপূর্ণ উদ্দেশ্য দিতে পারেনি। সমস্ত শিক্ষা, শিক্ষার্থীর আগ্রহ হতে উদ্গত হতে পারেনা। শিক্ষাকে সুসম্বদ্ধ ও ক্রমান্বিত হতে হলে খানিকটা শিক্ষক পরিকল্পিত শিক্ষা, খানিকটা অভ্যাস (drill)-এর আবশ্যকতা আছে। তবে প্রয়োগবাদ শিক্ষা বিষয়ে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। জীবনের সঙ্গে শিক্ষাকে যুক্ত করেছে। গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী এই দর্শন মনে করে যে শিক্ষা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে গণতান্ত্রিক সমাজে। প্রয়োগবাদে সকল মানুষের শিক্ষা ও

১। রাস্ক। দ্য ফিলসফিক্যাল বেসেস অব এডুকেশন পৃঃ ৮৪

২। রেমণ্ট। মডার্ন এডুকেশন ইট্‌স্‌ এইম্‌স্‌ অ্যাণ্ড মেথড্‌স্‌ পৃঃ ৩৩৭

বিকাশের সুযোগের সাম্যের (equal educational opportunity) কথা বারে বারে উচ্চারিত।

অতিরিক্ত পাঠসূচী

১। অ্যাডাম্‌স্। মডার্ণ ডেভেলপমেণ্টস্ ইন এডুকেশনাল প্র্যাকটিশ। দশম অধ্যায়।

২। ডিউই। ডেমোক্রেসী অ্যাণ্ড এডুকেশন। দি স্কুল অ্যাণ্ড সোসাইটি। স্কুলস্ অব টুমরো।

৩। ক্যাণ্ডেল। আমেরিকান ফিলসফি অব এডুকেশন। ইয়ার বুক অব এডুকেশনে প্রবন্ধ ১৯৩৬।

৪। কিলপ্যাট্রিক। দ্য প্রজেক্ট মেথড।

৫। রেমণ্ট। মডার্ন এডুকেশন। ইট্‌স্ এইম্‌স্ এ্যাণ্ড মেথড্‌স্। সপ্তম অধ্যায়।

৬। রাস্ক। দি ফিলসফিকাল বেসেস অব এডুকেশন। চতুর্থ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়

স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা

বিভিন্ন দর্শন হতে বিবিধ শিক্ষাব্যবস্থার উৎপত্তি। উল্টোদিক হতে বলা যায় যে শিক্ষা বিষয়ে নানা মতভেদ, (এবং বিভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা) প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টির মধ্যে মতভেদের ফল। শিক্ষাক্ষেত্রে কয়েকটি বিতর্ক-মূলক বিষয় রয়েছে। সেগুলিকে বিভিন্ন দার্শনিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখানো যাচ্ছে এই আশায় যে আমরা একমত হয়ে বলতে পারবো যে এই বিতর্ক বাস্তবিক নানা বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী হতে উপজাত। কোন্ দার্শনিক আদর্শে শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ দেওয়া হবে সেটা ঠিক না জানলে, কেন যে কোন কোন বিষয়ে বিতর্ক হচ্ছে তা বোঝা যাবে না। শিক্ষার উদ্দেশ্য, করণ, উপাদান সমস্ত কিছুই, বিশেষ দর্শন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়।

এই ধরনের একটি বিতর্কমূলক বিষয় হচ্ছে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা। একে বৃহত্তর সামাজিক বা রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করাও ফলপ্রদ, তবে আপাতত বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে যে শাসনশৃঙ্খলা দেখি সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার মধ্যে ঘড়ির দোলকের মত একটি চিরন্তন অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। কখনো বা এটি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে চলে যায় কখনো বা এট সম্পূর্ণ শৃঙ্খলার প্রতি অনুকূল। প্রাচীনকালে শিক্ষা বলতে সম্পূর্ণ বশ্যতা ও বাধ্যতা বোঝা যেত। শিক্ষার এই ধারণা বহুদিনব্যাপী। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সবাই মনে করতেন বিদ্যালয়ের কাজ হচ্ছে ছাত্রদের শাসন ও শৃঙ্খলার সাহায্যে তাদের মৌলিক প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করে বাঞ্ছনীয় প্রকৃতিতে পরিণত করা। সেটাই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। মধ্যযুগে ও উনবিংশ শতাব্দীতে লোকের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। ওয়েষ্ট মিনিষ্টার কলেজের প্রবেশদ্বারের মাথায় এই বাণীটি লেখা আছে 'যেভাবে শিশুর চলা উচিত, তাকে সেভাবে শিক্ষা দেওয়া হ'ক, বড় হয়েও সে সেইপথ থেকে বিচ্যুত না হয়। (Train up a child in the way he should go : and when he is old, he will not depart from it)'

প্রথম মহাযুদ্ধের পর কিন্তু শাসনশৃঙ্খলার ধারণা অন্যদিকে আন্দোলিত হয়।

'স্বাধীনতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের' বহু জোরালো সমর্থক পাওয়া যায়। শিক্ষকরা বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হন যেন তাঁরা শিশুকে কোনরকমভাবে 'গড়ে তোলা' (train)-র থেকে বিরত হন, এবং শিশুকে নিজে বিকশিত হবার পূর্ণ স্বাধীনতা দেন। অবশ্য শিক্ষকরা তখনও তাদের কর্মপন্থা সম্বন্ধে ঠিক মনস্থির করতে পারেননি। অলডাস্ হাক্সলী শিক্ষকসমাজের এই দ্বিধান্বিত ভাবকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। তাঁর মতে "একেবারে ক্ষুদ্র শিশুদের আমরা স্বাধীনতা, বুদ্ধির প্রয়োগ, দায়িত্বশীলতা ও ইচ্ছাকৃত সহযোগিতার শিক্ষা দিই। অথচ আরো বয়স্ক শিশুদের আমরা প্রাচীন সংস্কারকে নিষ্ক্রিয়ভাবে মেনে নেবার এবং হয় কর্তৃত্ব করবার অথবা বাধ্য হবার শিক্ষা দিয়ে থাকি! পশ্চিমী গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনিশ্চয়তার যে সাধারণ ঝোঁক আছে, (শিক্ষককুলের) এই দ্বিধা সেই রোগেরই লক্ষণ। প্রাক্তন পিতৃপ্রধান ও পিতৃশাসিত সমাজের শাসনের সঙ্গে, সম্পূর্ণ অভিনব স্বাধীনতার জন্য আকুলতা ও গণতন্ত্রের পিপাসা আমাদের মনের মধ্যে জট পাকিয়ে গিয়েছে। নতুন স্বাধীনতার সঙ্কল্পে বলীয়ান হয়ে আমরা আমাদের সন্তানদের মুক্ত আত্মনিয়ন্ত্রণে কুশলী করে গড়ে তুলি। কিন্তু এইটুকু করার পরে আমরা হঠাৎ ভীত হয়ে পড়ি ও ভাবতে বসি যে আমাদের সমাজ বাস্তবিক স্তরবিভক্ত (hierarchical), এখনো বহুল পরিমানে কর্তৃশাসিত, কাজেই আমরা একদিকে ছেলেদের নেতা গড়ে তুলবার শিক্ষায় আমাদের সমস্ত উদ্যম ব্যয় করি এবং অন্যদিকে তাদের বশ্য, বাধ্য করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।"[১]

শিক্ষার এই দুটি ভিন্ন ধারণা বাস্তবিকই কতটা আলাদা তা জানার জন্য শৃঙ্খলা কথাটির বিশ্লেষণ করা দরকার। সুনিয়ন্ত্রণ (order) ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা (discipline) এই দুটি কথাকে অনেক সময় গুলিয়ে ফেলা হয়। রস্ একজন ড্রিল সার্জেন্টের উদাহরণ দিলেন যিনি প্রথম হতেই ছাত্রদের বলতেন যে তিনি শুধু 'ড্রিল' নয় 'শৃঙ্খলা' শেখাবেন এবং তাঁর শরীর চর্চার ক্লাস ঘরের সেই মূল্যবান শিক্ষা অন্যান্য শ্রেণীকক্ষেও বিশেষ প্রয়োজন হবে। অথচ তিনি যেমন ভাবে শিক্ষা দিতেন তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় তিনি শৃঙ্খলার বদলে কঠিন নিয়ন্ত্রণের (order) কথা ভেবেছিলেন। তবে একথা খুব সত্যি যে সাধারণভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার মূল্য আছে। এতে সময়ের ও প্রয়াসের সাশ্রয় হয়। বৃথা অপচয় ঘটে না। কিন্তু এও সত্যি যে খুব কঠিন নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় শৃঙ্খলার অত্যন্ত অভাবও

১। অলডাস্ হাক্সলী। এণ্ডস্ এ্যাণ্ড মীন্স্, পৃঃ ১৭৮

হতে পারে তবে সাধারণভাবে সত্যিকার ভাল শৃঙ্খলাতে, সুনিয়ন্ত্রণও নিশ্চিত থাকে।*

রাস্ক বলেন হার্ব্বার্ট বহুপূর্ব্বেই এই দুইটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য পরিস্কার করে দেখিয়েছেন। জার্মান শব্দ Zucht অর্থ শৃঙ্খলা অথবা শিক্ষা কিন্তু Regirung হচ্ছে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ। দ্বিতীয়টির দ্বারা স্কুলের ছাত্রদের আচরণের প্রতি ইঙ্গিত আছে। শৃঙ্খলা কিন্তু আরো ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ চরিত্রগঠন। বিদ্যালয়ের পূর্ণ প্রভাবদ্বারা এর প্রতিষ্ঠা সম্ভব। শাসন ও নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র বর্ত্তমান কাজকর্মের জন্য কিন্তু শৃঙ্খলা ভবিষ্যৎজীবনের জন্যও বটে। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকের সমস্ত আদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেওয়া, ঘরে নৈঃশব্দ্য বজায় রাখা ইত্যাদি শাসনের কাজ। কিন্তু অল্পবয়সীদের সংস্কৃতিবান করে চরিত্রগঠন করা হচ্ছে শৃঙ্খলার কাজ। হার্ব্বার্ট বিশ্বাস করেন শিক্ষকের এক-মাত্র উদ্দেশ্য শ্রেয়ঃনীতিক বুদ্ধিকে জাগ্রত করা। "মানুষের ইচ্ছার মূল্য আছে তার চিন্তনের গণ্ডীতে" (the will takes its root in the circle of thought)। কাজেই শিক্ষা দানকে সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর প্রধান উপায় বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু শিক্ষাদান শাসন ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সম্ভব নয়। ছাত্রদের কিছু শেখাতে হলে, প্রথমে শ্রেণীকক্ষে বশ্যতা, নৈঃশব্দ্য ইত্যাদির যথোচিত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। বাস্তবিক শাসন ও শৃঙ্খলা পরস্পরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রথমটির দ্বারা দ্বিতীয়টি লাভ করা যায়। শৃঙ্খলার সংজ্ঞা শাসন বা নিয়ন্ত্রণের থেকে ব্যাপকতর সংজ্ঞা। শিক্ষার্থীর শুধু বর্ত্তমান নয়, ভবিষ্যৎ ব্যবহারের আদর্শ হল শৃঙ্খলা। এটি শুধু শিক্ষার্থীর বাইরের ব্যবহার আদব কায়দা মাত্র নয়। শৃঙ্খলা বলতে তার ইচ্ছা আগ্রহ ইত্যাদির আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বোঝা যাবে। এই প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের বোর্ড অব এডুকেশন নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছেন।

"শৃঙ্খলা দ্বারা শিক্ষার্থী তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে। তার চরিত্রের সব সদ্‌গুণগুলি এর দ্বারা বিকশিত হয়। শৃঙ্খলা বোধ গভীর কিনা জানবার উপায় হল সমাজের বাঞ্ছনীয় ব্যবহার ও আচরণ শিক্ষার্থীরা নিজেরাই

* পাদটীকা: লিউইন লিপিট ও হোয়াইট তিনরকম শ্রেণীকক্ষের ব্যবহার নিয়ে বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক একটি নিরীক্ষা করেন। দেখা যায় যে ক্লাসে শিক্ষক অতি কঠিন নিয়ন্ত্রণ চালু রেখেছিলেন, সেখানে শিক্ষক পিছন ফেরা মাত্র শৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙ্গে যায়, কিন্তু যেখানে একে-বারে নিয়ন্ত্রণ নেই এমন শ্রেণীকক্ষে পূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করছে। তৃতীয় শ্রেণীকক্ষে শিশুরা গণতান্ত্রিকপদ্ধতিতে স্বাধীনভাবে কাজ করছে, শ্রেণীটি দেখতে সুনিয়ন্ত্রিত নয়। যদিও শৃঙ্খলার অভাব নেই, বস্তুতঃ শেষোক্ত শ্রেণীতেই সবচেয়ে ভাল কাজ কর্ম হয়।

সঠিক মনে করে করতে আরম্ভ করেছে কিনা এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা। শিক্ষার্থীর নিজের চরিত্রে শৃঙ্খলা না থাকলে তার বাহ্য ব্যবহার কখনো ভদ্র, সুনিয়ন্ত্রিত হবে না।"[১]

নরম্যান ম্যাক্‌মান তাঁর দ্য চাইল্ডস্‌ পাথ টু ফ্রীডম বইতে বলেন যে বিদ্যালয়ের শাসনশৃঙ্খলা হচ্ছে তিন ধরনের, দমনের দ্বারা শৃঙ্খলা (repression), প্রভাবের দ্বারা শৃঙ্খলা (impression) এবং মুক্তির দ্বারা শৃঙ্খলা (emancipation)। তিনি শব্দগুলিকে কিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ও কি পদ্ধতিতে প্রত্যেকটিকে পালন করা হয় তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শিক্ষার্থীর চরিত্রের উপর এই তিন ধরনের শৃঙ্খলার প্রভাব কি ?

দমনবাদীরা সর্বক্ষণ শ্রেণীকক্ষে নিশ্চুপ নৈঃশব্দ্য ও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার চান। এমন গল্প প্রচলিত আছে যে স্কুলে ভাল শৃঙ্খলা চালু আছে কিনা এবং সরকারী ভাতা দেওয়া উচিত হবে কিনা সেটা পরীক্ষা করার জন্য স্কুল পরিদর্শকরা সত্যি সত্যিই বিদ্যালয়ের কক্ষে একটি আলপিন ফেলে তার শব্দ শুনতেন। যদি সেই ক্ষীণ ধ্বনি শোনা যেত তবে প্রমাণিত হত যে বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা নিখুঁত। বহুদিন পর্য্যন্ত প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে পীড়ন ও দৈহিক শাস্তি, শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রধান উপায় ছিল। কিন্তু মহৎ শিক্ষাবিদ্‌রা সকলেই এই ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করেছেন। শিক্ষার ইতিহাসের বই খুলে মধ্যযুগের woodcut ছবিতে দেখা যায় বেত হাতে পীড়ন করতে উদ্যত শিক্ষকের ছবি। এককালে বেত ছিল মাষ্টার মশাইদের সনাক্ত করার চিহ্ন।

কাবারলি তাঁর শিক্ষার ইতিহাসে লিখেছেন, হ্বার্‌লি নামে এক স্কুলশিক্ষক, খুঁটিনাটির প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি থাকার দরুণ, তাঁর ছাত্রদের তিনি একান্নবছর সাতমাস চাকরীর জীবনে কি কি শাস্তি দিয়েছেন তার একটি বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি হিসেব রেখেছেন যে তিনি ৯১১৫২৭ বেত্রাঘাত, ১২৪০১০ লাঠ্যাঘাত, ২০৯৮৯ রুলার স্কেল দ্বারা আঘাত, ১৩৬৭১৫ চপেটাঘাত, ১০২৩৫ মুখের ওপর ঘুষি, ৭৯০৫ কানমলা, ১১১৫৮০০ গাঁট্টা, ২২৭৬০ এক লাইন বহুবার করে লিখতে দেওয়া, ৭৭৭ বার ছেলেদের হাঁটু গেড়ে দাঁড় করিয়ে রাখা, ৬১৩ বার একটুকরো কাঠের ওপর তাদের হাঁটু গেড়ে দাঁড় করিয়ে রাখা, ৩০০১ বার গাধার টুপি পরানো, ১৭০৭ বার বেত উঁচিয়ে ভয় দেখানো ছাড়াও নানাবিধ অভিনব উপায়ে ছেলেদের শাস্তি দিয়েছেন। ল্যাটিন শব্দ শেখার জন্য বেত্রাঘাত

১। হ্যাণ্ডবুক অব সাজেশনস্‌। বোর্ড অব এডুকেশন।

করেছেন ৮০০০০০ বার। বাইবেলের কথা বা গান শেখার জন্য, বেত্রাঘাত ৭৬০০০ বার। তা ভিন্ন ৩০০০০ রকম ভাবে বকুনী দিয়েছেন। এর মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ তাঁর নিজের মাতৃভাষা জার্মানে। বাকি সময় তাঁর নিজের উদ্ভাবিত শব্দ দ্বারা। সেই 'স্বর্ণযুগে' শাসনপীড়ন যে কতদূর যেতো তার এটি জ্বলন্ত নিদর্শন। এটি পড়ে হাস্যোদ্রেক হতে পারে কিন্তু এর দ্বারা সমাজের শাস্তির যে ছবি ফুটে ওঠে তা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি অমানুষিক। নিশ্চিতভাবে শিশুদের কাল কাটতো শাস্তি পেয়ে বা শাস্তির ভয়ে, আর শিক্ষকের সময় অতিবাহিত হত শাস্তি দিয়ে আর শাস্তির কথা বইয়ে লিপিবদ্ধ করতে।

পীড়নের এই নিষ্ঠুর চেহারা হয়তো আজ অতীত ইতিহাস কিন্তু বয়োবৃদ্ধরা এখনো স্মরণ করতে পারেন যে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা প্রধানত শাসন ও পীড়ন দিয়ে বজায় রাখা হত এবং তাঁদের মনে নিজেদের আমলের বেদনাকর পীড়নের স্মৃতি আজও জাগরূক। এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও স্কটল্যাণ্ডে শিক্ষকতা 'ব্যবসায়ে'র প্রধান উপকরণ ছিল চামড়ার একটি বন্ধনী (বেতের বিকল্প), আর শিক্ষক কতখানি সুপটু তা বোঝা যেত তাঁর একদল বিশৃঙ্খল ছেলেদের চুপ করিয়ে রাখবার ক্ষমতা দিয়ে। শিশুদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করা, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে এই ধারণা প্রচলিত ছিল।

এই ধরনের পীড়ন খ্রীষ্টধর্মের 'আদি পাপের' বৃত্তান্ত হতে সমর্থন লাভ করেছে। জেরেমায়ার মতে "সব মানুষের হৃদয় মূলতঃ মন্দ ও প্রতারণায় নিপুণ।"[১] অতএব শিশুর নিজের 'ভাল'র জন্যই তাকে ক্রমাগত শাস্তি দেওয়া দরকার। তাড়না ও পীড়নকে তাই (আপাতত কঠোর হলেও) "উপকারী ওষুধের মত হিতকর মনে করা হ'ত"[২]। মনঃস্তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে বলা যায় শাসন তাড়ন শিশুর সহজাত ভীতির প্রবৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পীড়নের 'ভয়' দেখিয়ে তাদের দিয়ে কিছু কাজ করানো হত অথবা কাজ থেকে নিবৃত্ত করা হত (যেমন কথা বলা, চঞ্চলতা .।

প্রভাব (impression) পীড়নের পদ্ধতি হতে সম্পূর্ণ পৃথক্। এর মূল কথা হচ্ছে শিক্ষকের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্ব শিক্ষার্থীর মনে গভীর ছাপ ফেলবে এবং তার দ্বারাই ছাত্রকে সুশৃঙ্খল রাখা যাবে। শাসনপীড়নের দরকার হবে না। শিক্ষকের নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে ও তাঁর পরিকল্পনা মত বিদ্যালয়ের কাজকর্ম দিয়ে শিশুকে

১। জেরেমায়া XVII. 9

২। প্রবাদবাক্য XVIII

বাঞ্ছনীয় ভদ্র আচরণ করানো যাবে। অতএব শিক্ষকের ব্যক্তিগত আচরণের উদাহরণ, সোজাসুজি নীতি শিক্ষাদান ও পরোক্ষ প্রভাব দিয়ে শিক্ষার্থীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিদ্যালয়ে তখন ভীতির বদলে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার রাজ্য স্থাপিত হবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের কয়েকটি পাবলিক স্কুল কয়েকজন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বশালী প্রধান শিক্ষক তাঁদের শিক্ষার্থীদের নিজেদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে প্রভাবিত করেছেন। রাগবি স্কুলের আর্ণল্ড এবং আপিংহামের থ্রিং এর নাম উল্লেখ করা যায়। এঁরা নিজেদের ব্যক্তিগত প্রভাব দিয়ে শুধু যে শত শত শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করেছিলেন তাই নয়, সমস্ত ইংল্যাণ্ডের শিক্ষা জগতেই তাঁদের প্রভাব অনুভূত হয়েছে। এ জাতীয় আদর্শ শিক্ষকের সামান্য মুখের কথাতেই তরুণ শিক্ষার্থীরা অসাধ্য সাধন করতে প্রস্তুত হয়ে পড়ে। উৎপীড়ক, কঠিন হৃদয় শিক্ষকদের চেয়ে এই ধরনের প্রসন্নবদন দৃঢ়চিত্ত শিক্ষক নিজেদের ব্যক্তিত্বের জাদুতে অনায়াসে শৃঙ্খলা স্থাপন করতে পারেন। এঁরাই আদৃত হন। আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের জীবন হতে এই ধরনের শিক্ষকদের স্মরণ করতে পারি। একথা মনে রাখা আবশ্যক যে 'প্রভাব' যারা বিস্তার করেছেন সেই শিক্ষকরাও শিক্ষার্থীদের নিজেদের মত অনুযায়ী চালনা করেছেন। কিন্তু তিনি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মানবিক উপায়ের সাহায্য নিয়েছেন, পারতপক্ষে দৈহিক শাসন ও উৎপীড়নের ব্যবহার করেন নি। তাঁর ভদ্র আচরণের কতগুলি নির্দিষ্ট আদর্শ আছে ও তিনি যেমনভাবেই হ'ক (কখনো বজ্রাদপি কঠোর হয়ে কখনো বা কুসুমাদপি কোমল হয়ে) সেগুলি প্রতিষ্ঠা করেন। মনঃস্তত্ত্বের ভাষায় তাঁর আবেদন কখনো শিশুর ভয়ের প্রবৃত্তির কাছে নয়, কিন্তু শিশুর বশ্যতার প্রবৃত্তিকে তিনি ব্যবহার করেন ও তাদের বাধ্য হতে শেখান।

স্বাধীনতাপন্থীরা (emancipationists) প্রভাব অথবা পীড়ন কোনটিই ব্যবহারের পক্ষপাতী নন। তাঁরা শিক্ষার্থীদের জন্য পূর্ণ, সীমাহীন, বাধ্যবাধকতাহীন স্বাধীনতা দাবী করেন। শিশুর মন যা চায় তাই সে করবে। কোন রকম উদাহরণ বা উপদেশ দিয়ে তার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করা হবে না। শিক্ষক যে শুধুমাত্র শিশুর ইচ্ছাকে কিছুমাত্র বাধা দেবেন না তা নয়, তাকে কোন প্রকার নির্দেশও দান করবেন না। নিজেকে তিনি সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন রেখে পশ্চাৎপটে থাকবেন। তাঁর ভূমিকা হবে নিতান্তই দর্শকের। এই হচ্ছে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার নীতি। শিক্ষক শিশুদের কোন ভাবেই

কিছু শেখাবেন না। তারা যা চায় তাই করবে, ভুল করলেও কিছু বলবেন না, গণ্ডগোল করলেও কোন শাসন নেই। মন্তেসরী এই নীতিতে বিশ্বাসী। নর্ম্যান ম্যাকমান (যিনি দ্য চাইল্ডস পাথ টু ফ্রীডম লিখেছেন) এবং এ.এস.নীল এই মতের সমর্থক। স্বাধীনতাপন্থীরা আদি পাপের নীতিতে একেবারে বিশ্বাস করেন না। মনুষ্য চরিত্র সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা বলেন শিশুর আন্তরপ্রকৃতি দেবপ্রতিম। ওয়র্ডস্‌ওয়ার্থের ভাষায় 'স্বর্গ হতে জ্যোতির্ময় পথে' তাদের আগমন। স্বাধীনতাপন্থীরা শিশুর ভয়বশ্যতা ইত্যাদি কোন প্রকার আদিম সংস্কারের সাহায্য না নিয়ে শিশুর আত্মবিকাশকে চরম মর্য্যাদা দান করে থাকেন।

বিদ্যালয় কক্ষে শৃঙ্খলাস্থাপনের এই তিনটি মত আছে। কোন্ মতটী সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে দেখতে হবে শৃঙ্খলাস্থাপনের কোন পদ্ধতি সবচেয়ে কার্য্যকরী। শৃঙ্খলা বলতে শুধু শ্রেণীকক্ষে সুনিয়ন্ত্রণ বোঝানো হচ্ছে না; আরো ব্যাপকতর ভাবে, ভদ্র, সুশৃঙ্খল ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের রচনায় কোন পদ্ধতি কাজে লাগে সে কথা হচ্ছে।

অতি উগ্র স্বাধীনতাপন্থীরা ছাড়া সকলেই মনে করেন যে শিশুদের শৃঙ্খলা স্থাপনে কখনো কখনো কিছু মৃদু ধরনের দমনের প্রয়োজন আছে কিন্তু সাধারণ-ভাবে, শাসন ও দমনের পথ শৃঙ্খলাস্থাপনের রাজপথ নয় একথাও সকলেই জানেন। অবিরত ভীতি প্রদর্শন ও শাসন নিতান্ত কুপ্রথা এবং ভবিষ্যৎ ব্যবহারের ওপর এর প্রভাবও খুব গর্হিত। শাসন দিয়ে শ্রেণীকক্ষের তাৎক্ষণিক শৃঙ্খলা রক্ষা সম্ভব। কিন্তু যে মুহূর্তে তারা শ্রেণীকক্ষ হতে মুক্তি পাবে, তৎক্ষণাৎ তাদের অদমিত অসভ্য আচরণই প্রমাণ করে দেবে যে তাড়না দিয়ে শৃঙ্খলা শেখানো যায়না। পীড়নের কুফলের প্রামান্য নিদর্শন মেলে যারা বিরক্ত হয়ে স্কুল একেবারে ছেড়ে দেয় তাদের দেখলে। এই ধরণের রুদ্ধ বদ্ধ শ্রেণীকক্ষেই ভবিষ্যৎ অপরাধীদের সৃষ্টি হয়। ইংল্যাণ্ডের বোর্ড অব এডুকেশন, হ্যাণ্ডবুক অব সাজেশনে এই জন্য লিখলেন, "শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ তখনই কার্য্যকরী যখন শাসক শিক্ষক সশরীরে শাস্তি দেবার জন্য ঘরে উপস্থিত।"[১]

তাছাড়া, শাসন ও নিয়ন্ত্রণ গণতান্ত্রিক আদর্শবিরোধী। চরম সমাজতান্ত্রিক (totalitarian regime) হয়তো এর ব্যবহার চলে কিন্তু গণতান্ত্রিক রাজ্যে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শিক্ষাদানে এ একেবারেই অচল পদ্ধতি। অলডাস্ হাক্সলীর

১। হ্যাণ্ডবুক অব সাজেশন্‌স। বোর্ড অব এডুকেশন পৃঃ ২৪

তীব্র মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, "তোমার মূল লক্ষ্য যদি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা হয় তবে লোকদের স্বাধীন ও স্বনির্ভর হওয়ার শিল্প শিক্ষা দিও। যদি তুমি, নিজের আচরণ দিয়ে তাদের শাসন পীড়ন ও ভীরু বশ্যতা শেখাও তবে তোমার লক্ষ্যে কখনো পৌছুতে পারবে না। মন্দ উপায় দিয়ে উত্তম লক্ষ্যে পৌছানো যায় না·· জার্মানীর মন্তেসরী সোসাইটিকে রাজনৈতিক পুলিশ যে এসে ভেঙ্গে দেয় এই ঘটনা খুব অর্থবহ। ১৯৩৫-১৯৩৬ সালে মুসোলিনীর শিক্ষামন্ত্রী সমস্ত মন্তেসরী স্কুল বন্ধ করে দেন।"[১] কাজেই ফ্যাসিস্ট ইটালী স্বাধীনতাপন্থীদের শৃঙ্খলার ধারণা সম্পূর্ণ ব্যাহত করে দিল। যদি কাউকে উদ্দেশ্যমুখী আত্মসংযত দায়িত্ব-শীলতার জন্য প্রস্তুত করতে হয় তবে তার ভীতির সংস্কারকে উজ্জীবিত করা, (যার ফলে সমস্ত চেষ্টা অবদমিত হয়)—খুব ভ্রান্ত উপায়। তা দিয়ে তার সমস্ত কাজের উদ্দীপনাও বন্ধ হয়ে যাবে কেননা 'ভয়' সমস্ত কাজের শ্বাসরোধ করে।

শৃঙ্খলা রক্ষায় দৈহিক শাস্তির স্থান কতটুকু এই অতিতর্কিত প্রশ্নের উত্তরে 'কখনো নয়' এই কথা বলা বোধ করি খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয় কেননা কখনো কখনো দৈহিক শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। কখনো কদাচিৎ, দৈহিক শাস্তি দিয়ে খুব আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু দৈহিক শাস্তির প্রয়োগ তখনই মাত্র চলে যখন অন্য সমস্ত শ্রেষ্ঠতর উপায় ব্যর্থ হয়েছে। দৈহিক পীড়ন ও শাস্তি সম্বন্ধে আমরা ইতস্ততঃ বোধ করলেই আমাদের খুব 'সুকুমার হৃদয়ের' লোক বলা ঠিক হবে না। কেননা, রোমান শিক্ষক কুইন্টিলিয়ন, যে আমলে 'সুকুমার হৃদয়ে'র বিশেষ প্রচলন বা আদর ছিল না সেই শতকেও দৈহিক শাস্তিকে নিন্দা করেন।

"যদিও প্রথা অনুযায়ী ছেলেদের দৈহিক শাস্তি কখনো কখনো দেওয়া হয়, আমি নিজে তার পক্ষপাতী নই কেননা এ একটি নিতান্ত বর্বর প্রথা। দাসদের শাস্তি দেবার জন্য ব্যবহৃত। বাস্তবিক যদি একটু দূরদৃষ্টিতে দেখা যায় তবে বলা যায় যে এ একটি অসম্মানকর নিয়ম। দ্বিতীয়তঃ যদি কোন শিক্ষার্থী অন্য কোন ভাবেই সংশোধিত না হয় তবে বেত্রাঘাত খেয়ে সে নিম্নশ্রেণীর দাসদের (slaves) মত পাকা অপরাধী হয়ে যাবে। যদি কেউ নিয়মিতভাবে কর্ত্তব্যকর্ম করে যায় তবে তাকে মারধর করার কোন প্রয়োজন নেই। ছেলেরা যদি তাদের কর্ত্তব্য না করে, বুঝতে হবে শিক্ষকের নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলার দরুণ তা হয়েছে। তাই জন্য ছাত্রকে প্রহার করা নিতান্ত গর্হিত কাজ। আরেকটি

১। অলডাস, হাক্সলী। এণ্ডস, অ্যাণ্ড মীন্‌স,। পৃঃ ১৮৪-১৮৫

কথা আজ না হয় বালকটিকে বেত মেরে জোর করে শাসনে রাখা হল কিন্তু সে যখন কিশোর বা যুবক হবে তখন তাকে কি ভাবে শিক্ষাদান করা যাবে? তখন তো আর তাকে বেত মারা চলবে না। তাছাড়া এখন পড়াশোনার বিষয়বস্তু আরো কঠিন হবে। আগের বেত্রাঘাত কি তার এই পড়াশোনায় সাহায্য করবে? তার উপর এই কথাও বিবেচনা করা উচিত বেতমারার সময় প্রায়ই ব্যথা ও ভয় হতে ছেলেদের কতগুলি (শারীরিক) ঘটনা ঘটে যেগুলি অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও ভবিষ্যতে যার স্মৃতি, লজ্জার কারণ হবে। সেই লজ্জা তাদের মনকে বিষন্ন করে রাখবে, মানুষের সান্নিধ্যে তারা অস্বস্তি বোধ করবে ও তাদের এড়াতে চাইবে।"[১] সর্ব্বদা শাস্তি দিলে শিক্ষার্থীর আত্মমর্য্যাদা যেমন ক্ষুন্ন হয় তেমনি শিক্ষকেরও নৈতিক অধোগতি ঘটে। বস্তুতঃ ক্ষমতার আসনে আসীন, বলিষ্ঠ, বয়স্ক শিক্ষক যখন ভয় দিয়ে ছোট ছোট দুর্ব্বল কোমলকায় শিশুদের বশ্যতা আদায়ের চেষ্টা করেন তিনি কখনো শ্রদ্ধেয় থাকতে পারেন না। এমন উৎ-পীড়নের জন্য 'শিক্ষকতা' কাজটিই সমাজে নিন্দিত ও ঘৃণ্য ছিল। সেই দুর্ণাম মাত্র এই সবে বর্তমান কালে ক্ষালনের চেষ্টা হচ্ছে। কুইন্টিলিয়ান সেই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করেছিলেন, সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বর্ত্তমান ফ্রয়েডীয় মনঃ সমীক্ষণের সাহায্যে তাকে ব্যাখ্যা করা যায়। দৈহিক শাস্তি দেওয়ার মধ্যে অবদমিত পীড়নের কামনা ও পীড়িত হওয়ার বিকৃত বাসনাকে ব্যাখ্যা করা যায়। এই কামনাগুলি বাস্তবিক অবদমিত কাম-ইচ্ছা। স্যাডিজ্‌ম্ (ধর্ষনেচ্ছা) সম্বন্ধে শিক্ষকের সাবধান হওয়া দরকার যেন তার দেওয়া শাস্তির যোগ্য কারণ থাকে। যেন কোন মতেই তিনি নিজের মনের বিকৃত কাম, শিশুদের পীড়ন করে পূরণ করবার চেষ্টা না করেন। মাসোকিজম্ হচ্ছে (মর্ষনেচ্ছা) বা ধর্ষিত অথবা পীড়িত হওয়ার ইচ্ছা। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের কথা, কোন কোন শিক্ষক দৈহিক প্রহারের যুক্তি হিসাবে সেই বিকৃত মনোভাবের উল্লেখ করে বলেন, শিক্ষার্থীরা নিজেরাই শাস্তি পেতে ভালবাসে। এটি নিতান্ত কুযুক্তি। কাজেই দেখা যায় দৈহিক শাস্তিদানের বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি আছে বিশেষ করে কিশোরদের দৈহিক শাস্তি দিলে তার থেকে এত প্রকার বিপদ হতে পারে যে দৈহিক নির্য্যাতনের সাহায্য কোন সময়েই নেওয়া উচিত নয়।

পরিপূর্ণ স্বাধীনতাবাদ, পীড়নবাদের মত আরেকটি চরম মত। এই মতও

১। ইনষ্টিটুট অব ওরেটরি। প্রথম খণ্ড। তৃতীয় অধ্যায়। মনরো দ্বারা সোর্স বুক অব দি হিষ্ট্রি অব এডুকেশনএ উদ্ধৃত।

সমর্থনযোগ্য নয় কেননা এর দ্বারা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা যায় না। এঁরা মনে করেন শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ অদরকারী এবং অবাঞ্ছিত। এঁরা দাবী করেন যে পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যক্তির স্বাস্থ্যকর চরিত্র বিকাশের জন্য অত্যন্ত দরকারী। এই স্বাধীনতার দরুণ চিন্তায় ও কর্মে নির্ভীক এমন ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়, যা সাহসের সঙ্গে সমস্ত অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে। এই সুফল শুধুমাত্র অনিয়ন্ত্রিত আত্ম-বিকাশের দ্বারাই পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু মূল্যবোধের প্রশ্ন ওঠে। এখানে একটি ন্যায্য জিজ্ঞাসা হল, যে ব্যক্তি এমনভাবে বেড়ে উঠেছে, তার ব্যক্তিত্ব কি সত্যি প্রকাশযোগ্য? তা যদি না হয় তবে আর সেই ব্যক্তির কাছে 'আত্মবিকাশের' মূল্য কি? অপরের কাছেও তার মূল্য বিশেষ নেই। বরঞ্চ আমাদের উদ্দেশ্য কি এমন ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা নয়, যার ব্যক্তিগত ও সামাজিক মূল্য আছে? তা যদি হয় তবে পূর্ণ স্বাধীনতার পথই কি সেই উদ্দেশ্য সফল করার উপায়? একথাও বিস্মৃত হওয়া চলবে না যে সামাজিক জীবনে এমন কি অত্যন্ত স্বাধীন সমাজেও প্রত্যেক ব্যক্তির পূর্ণ অবাধ স্বাধীনতা থাকতে পারে না। পরিপূর্ণ স্বাধীন আত্মপ্রকাশ ততটুকুই হতে পারে যতক্ষণ অন্যের অধিকারের সঙ্গে সংঘর্ষ না বাধে। যখনই একজনের সুবিধা, অধিকার বা আরাম আরেকজনের পূর্ণ আত্মপ্রকাশে বিঘ্নিত, তখনই ব্যক্তির স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করার প্রশ্ন ওঠে। কাজেই বিদ্যালয়ে এধরনের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়।

কোন কোন স্বাধীনতাপন্থী, ফ্রয়েডের মনোবিকলনের তত্ত্ব হতে সমর্থন খুঁজে বলেছিলেন সে সর্ব্বপ্রকার অবদমন অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ফ্রয়েড একথা বলেন নি যে ব্যক্তি তার সমস্ত আদিম ও আসামাজিক ইচ্ছাকে পুরোপুরি প্রকাশ করবে। তাহলে তো সমাজই ধ্বংস হয়ে যাবে। তিনি বলেছেন যখন ব্যক্তি নিজের অচেতনে না বুঝে, কতগুলি শক্তিশালী আবেগ ইচ্ছা ইত্যাদিকে অচেতনের মধ্যে অবদমিত করে তখন তার ফল হবে বিপজ্জনক। কিন্তু কেউ সচেতনে, জেনে বুঝে, সজ্ঞানে অসামাজিক আবেগের দমন করলে ক্ষতির কোন সম্ভাবনা নেই। অবশ্য স্বাধীনতাপন্থীরা যদি বিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণকে সন্দেহ ও উপহাসের চোখে দেখে তবে তা সহ্য করা উচিত হবে না। শিশুরা নিজেরা সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে পছন্দ করে এবং কিছু পরিমাণে নির্দেশ ও নিয়মবাঁধা কাজ তারা নিজেরাই দাবী করে। বোর্ড অব এডুকেশন বহু অভিজ্ঞতার ফলে শিক্ষকদের উপদেশ দিয়েছেন, "ছাত্রদের মধ্যে ভদ্র ও সুশৃঙ্খল ব্যবহার শিখবার

স্বাভাবিক আগ্রহ আছে এই নিশ্চিত তথ্যটি শিক্ষকদের মনে রাখা একান্ত দরকারী।"[১]

যখন ব্যক্তিত্ববান শিক্ষক ছাত্রদের প্রভাবিত করেন তখন নিয়ন্ত্রণ ও সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের আচরণ ক্লাসঘরে নিয়ন্ত্রিত হওয়া ছাড়াও, তাদের ওপরে যে দূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে সেটা সারাজীবন স্থায়ী হয়। ছাত্ররা বাস্তবিক পক্ষে সমস্ত জীবনভরেই সত্যিকার সুশৃঙ্খলা ও আত্মসংযম শেখে। নীতিবোধ, বাঞ্ছনীয় মানসিকতা উৎসাহ ইত্যাদি, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সংস্পর্শে অন্যদের মনেও সংক্রামিত হয়। শৃঙ্খলার পদ্ধতি হিসেবে 'প্রভাব'নীতি সেই শ্রেণীর শিক্ষকদের কাছে প্রিয় যারা বিশ্বাস করেন যে তাঁদের ছাত্রদের চরিত্রগঠন তাঁরাই করছেন। প্রভাববাদীদের আর্ণল্ড আর ফ্রিং-এর উদাহরণ থাকায় স্বাধীনতাবাদীদের কিছু বিপদ হয়েছে। দমনবাদীদের নীতির ভ্রান্ততা সম্বন্ধে সাধারণ জনমত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছে কিন্তু প্রভাববাদীদের নীতির বিরুদ্ধে তেমন কোন জনমত গড়ে উঠতে পারেনি। তাঁরা (স্বাধীনতাপন্থীরা) এই যুক্তি দেখান যে প্রভাবের নীতি মূলতঃ ভ্রান্ত। কেননা শিক্ষকের গভীর প্রভাব দিয়ে ছাত্রদের আচ্ছন্ন করে রাখলে, তাদের মৌলিকতা ও ব্যক্তিত্ব ক্ষুন্ন হবে, তারা হয়ে দাঁড়াবে তাদের শিক্ষকের প্রতিবিম্ব মাত্র। প্রভাবের নীতি হতে এরা ভিন্নমত কারণ শিশুর ব্যক্তিত্বনিয়ন্ত্রণ, কার্য্যকরী ভাবে, প্রভাব দ্বারা হবেনা বলে নয়—বরঞ্চ অত্যধিক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে যাবে এই আশঙ্কায়।

অন্যেরা বলেন প্রভাবনীতি বাঞ্ছনীয় হোক্ বা না হোক্ কার্য্যতঃ ব্যবহার-যোগ্য নয় কেননা বেশীর ভাগ শিক্ষক, প্রভাবিত করার মত অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নন। তবে রস্ মনে করেন এই আপত্তিটা খুব জোরালো নয় কেননা শিক্ষক যতই তরুণ ও অনভিজ্ঞ হ'ক না কেন অন্ততঃ বিদ্যায় বুদ্ধিতে, জীবনের অভিজ্ঞতায় ও বয়সে ছাত্রদের থেকে অবশ্যই বড়। তাছাড়া তাঁদের জীবিকা এমন যে তাঁরা সহজেই ছাত্রদের শ্রদ্ধার আসনে বসেন এবং ছাত্রদের প্রভাবিত করতে পারেন। স্যার জন অ্যাডাম্স্ বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে বাস্তবিক সব ছাত্ররাই তাদের শিক্ষকদের মান্য করে। তিনি বলেন যে ছাত্ররা শিক্ষকদের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে কেননা বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বাইরে বৃহত্তর সমাজের প্রতিনিধি এবং এঁদের পশ্চাতে রয়েছে সম্পূর্ণ সংঘবদ্ধ সমাজের ক্ষমতা ও সমর্থনের জোর।

১। হ্যাণ্ডবুক অব সাজেসনস্। বোর্ড অব এডুকেশন। পৃঃ ২৬

অতএব সিদ্ধান্তে আসা গেল যে শাসন তাড়না দিয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। তবে প্রভাব অথবা স্বাধীনতা, কোন পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য? অথবা দুটিই যদি গ্রহণীয় তবে কোনটি কতমাত্রায়?

স্বাধীনতার সমর্থকরা বলবেন স্বাধীনতা ততক্ষণই দেওয়া চলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তা যথেচ্ছাচারে না পরিণত হয়। শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার সীমারেখা তার আগেই টানতে হবে। আগেই বলা হয়েছে শিশুরা অরাজকতার চেয়ে সুশৃঙ্খল নিয়মের অবস্থাকে বেশী পছন্দ করে। অলডাস্ হাক্সলী বলেন শিশুকে অতিরিক্ত স্বাধীনতা দেওয়া মূর্খতা, অপরাধ।

"নতুন বিদ্যালয়গুলির খুব বেশীরকম 'অভিনব' হওয়ার আশঙ্কা থাকে। একটা বিপদ হল শিশুদের এতবেশী স্বাধীনতা দেওয়া হতে পারে যাকে তারা লাভজনক ভাবে তা ব্যবহার করতে পারে না, কিংবা এমন দায়িত্ব চাপানো হতে পারে যা তারা চায় না বা কি করে বহন করবে বুঝতে পারেনা। যা সে পারেনা তার অতিরিক্ত স্বাধীনতা ও দায়িত্ব চাপালে শিশু সেই বোঝা টানতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সাধ্যাতীত স্বাধীনতা পেলে শিশুরা ভয় পায়। খুব অস্বাভাবিক শিশু ব্যতীত সমস্ত শিশুই বাইরের শৃঙ্খলার অবস্থায় নিরাপদ বোধ করে। তারা দৃঢ় নীতিবোধ ও শাসনের আশ্রয় খোঁজে। সুশৃঙ্খল আচরণের নিয়মকানুন প্রসন্ন মনেই মেনে নেয়। যেখানে সুনিয়ন্ত্রণ, সুশৃঙ্খলা বিরাজিত সেখানে স্বাধীনভাবে স্বায়ত্তশাসন ও সহযোগিতার শিক্ষা দেওযা যায়।"[১]

মন্তেসরীকে কেউ সামাজিক কর্ত্তব্য ও ভদ্র আচরণ শিক্ষা দিতে উদাসীন, বলে অভিযোগ করতে পারবেন না। তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের কাজ হবে শ্রেণীকক্ষে যাতে সুশৃঙ্খলা বিরাজ করে তার দিকে লক্ষ্য রাখা। যদি কোন শিশুর অসামাজিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তবে দুষ্কৃতিকারীকে কিছুদিনের জন্য খেলা ও অন্যান্য আনন্দময় কার্য্যাবলী হতে বাদ দিতে হবে। কাজেই এখানেও শিক্ষক শৃঙ্খলা স্থাপনে নিজের দায়িত্ব পুরোপুরি ত্যাগ করেননি। এবং সমস্ত বিদ্যালয়ের পরিবেশে তাঁর প্রভাব ব্যক্ত, যদিও সেই প্রভাবকে যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক রাখার চেষ্টা করা হয়।

রস্ বিশ্বাস করেন, স্বাধীনতাপন্থীরা না স্বীকার করলেন, প্রভাবপদ্ধতি একটি জরুরী ও বাঞ্ছনীয় পদ্ধতি। এই কথাটি পরিস্কার করে বুঝতে হলে শৃঙ্খলা বা ডিসিপ্লিন কথাটার অর্থ একটু তলিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যাক্।

১। অলডাস্ হাক্সলী। এণ্ডস্ এ্যাণ্ড মীন্স্ পৃঃ ১৭৮-১৭৯

ডিসিপ্লিন অর্থ, বাধ্য শিষ্যত্ব; শ্রদ্ধার সঙ্গে যে গুরুর পায়ের কাছে বসে জীবন সম্বন্ধে পাঠ নেয়। ইনি শৃঙ্খলাকে নিজের চরিত্রে রূপায়িত করেছেন। তাঁর ভঙ্গি গ্রহীতার কেন না গুরু তাঁর শ্রেষ্ঠতর জ্ঞানের অংশ বিনম্র শিষ্যকে দিতে প্রস্তুত। ছাত্র স্বেচ্ছায় ও সানন্দে শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের শাসন স্বীকার করে নেয় কারণ সে জানে শ্রদ্ধা বিনয় ও বশ্যতা সমস্ত শিক্ষার মূল কথা। অতএব বিনীত ও বাধ্য হয়ে যে ব্যক্তি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন, তাকে অধিকতর অভিজ্ঞ শিক্ষক নিজের জ্ঞানবুদ্ধি, চিন্তার ভঙ্গি, আদর্শ দিয়ে প্রভাবিত করবেনই। এই সংক্রমণ জীবনে প্রয়োজনেই সুনিশ্চিত। শিক্ষক যদি নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার না করেন তবে কোন শিক্ষাই ঘটবে না। কোন শৃঙ্খলা স্থাপিত হবে না।

শিক্ষার্থীর স্বভাবের নিয়ন্ত্রিত বিকাশ শিক্ষকের কাম্য ও দায়িত্ব হলেও তিনি কখনো নিজের ব্যক্তিত্বের অসুন্দর প্রতিবিম্ব হিসাবে শিক্ষার্থীকে রচনা করবেন না। বস্তুত: প্রভাববাদীদের বিপক্ষে স্বাধীনতাপন্থীদের এটাই সবচেয়ে বড় যুক্তি যে তাঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্বের ছাঁচে শিক্ষার্থীদের ঢালাই করেন যদিও কোন শিক্ষকেরই তা করা উচিত নয় এবং প্রত্যেক শিক্ষকেরই এই বিপজ্জনক সম্ভাবনা সম্বন্ধে অবহিত ও সাবধান থাকা উচিত। এই বিপদ এড়ানোর উপায়, সর্ব্বদা দেশের ও পৃথিবীর চিন্তানায়ক ও আদর্শবাদী মহাপুরুষের মহৎ আদর্শ ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের চরিত্রেও সেই শ্লাঘনীয় আদর্শগুলি তিনি রূপায়িত করার চেষ্টা করবেন। তিনি যদি আলোকিত দীপাধার না হন তবে কার কাছ হতে শিক্ষার্থী তার দীপ জ্বালিয়ে নেবে? কারণ যদিও ছাত্র তাঁর কাছে ছাত্রের উচিত বশ্যতায় নম্র হয়ে আসবে। কিন্তু একটা সময় এমন হবে (বা হওয়া উচিত) যখন দুজনেই মানুষের অভিজ্ঞতা হতে উদ্ভূত শ্রেষ্ঠ আদর্শের ব্রতী হবেন। যখন সেই চিরন্তন আদর্শ ও মূল্যগুলি সচেতনে বা অচেতনে গৃহীত, তখন নিজের অন্তরের শুভবুদ্ধি ও মর্য্যাদাবোধ হতেই স্বভাবের শৃঙ্খলা আসবে। অপরের প্রভাব রূপান্তরিত হবে আত্মনিয়ন্ত্রণে, এটি হবে নিজের শ্রেষ্ঠ স্বভাবের কাছে নিজের বশ্যতা স্বীকার।

এই পথ সম্ভবতঃ অবাধ স্বাধীনতাপন্থার চেয়ে অপেক্ষাকৃত গ্রহণযোগ্য সুবুদ্ধির পথ। স্বাধীনতার সুস্থ সংজ্ঞা স্ববশ্যতা বা স্বনিয়ন্ত্রণ। যদি শিক্ষকের অত্যধিক প্রভাবকে নিন্দা করতে হয় তবে "বিদ্যালয়ে এমন শৃঙ্খলার পরিবেশ ও বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হবে যাতে ছাত্ররা নিজেরাই সেই পরিবেশের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে পারবে। এও বুঝতে পারবে যে তাদের নিজেদের বিশৃঙ্খল ব্যবহারের চেয়ে শিক্ষক বা

বিদ্যালয় রচিত পরিবেশ অনেক বেশী ভাল। তখন সহজে তাদের পূর্ণ সহযোগিতা ও সাগ্রহ অনুমোদন মিলবে।"[১] প্রভাবকে বিলুপ্ত করা চলবে না। শিক্ষার্থীরা অবশ্যই স্বাধীনতা পাবে কিন্তু স্কুলের আদর্শ, সুব্যবহারের মূল্য ইত্যাদিকে অগ্রাহ্য করতে পারবে না। যদি সেগুলিকে তারা স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে মেনে নেয় তবে তার স্বাধীনতাও থাকবে, স্বভাবের শৃঙ্খলাও অটুট থাকবে। সংক্ষেপে বলা যায় "ছেলেদের আত্ম-আবিষ্কার যদি (শিক্ষার) উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাদের স্বাধীনতা দিতে হবে। যদি সেই পটুত্ব তারা যথার্থই আয়ত্ত করতে চায় তবে তাকে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে।"[২]

বাধ্যতা বাস্তবিক সত্যকে জানার শৃঙ্খলা। জ্ঞানের ক্ষেত্রে সত্যের প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। সৃজনের ক্ষেত্রে সুন্দরের আদর্শকে মানতে হবে।

স্বাধীনতার ইচ্ছাকে, অনেকসময়ে ভ্রান্তভাবে আমাদের মনের সমস্ত আবেগ, ইচ্ছা প্রকাশের বাসনার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। সে রকম স্বাধীনতা নিতান্ত উচ্ছৃংখলতা (license)। সকলের চেয়ে বড় স্বাধীনতা আত্মকর্তৃত্ব। যখন সব আদর্শ অন্তরে গৃহীত হয়েছে, চরিত্র সুগঠিত হয়েছে, মনের বিপরীতমুখী বৃত্তিগু'ল সুসংগঠিত হয়েছে, যখন ব্যক্তি নিজের যে কোন ইচ্ছা বা আবেগের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য নয়, তখনই সে স্বাধীন। নিজের আত্মসংযমের সাহায্যে সে নিজের ওপর আত্মকর্তৃত্ব লাভ করে। নিজের অন্তরে অনির্ব্বান শিখাকে জ্বালিয়ে রাখতে পারে। স্বাধীনতা অর্থ স্ব+অধীনতা, নিজের ইচ্ছাকে স্ববশে রাখা। "সে ব্যক্তিই স্বাধীন যে নিজের ইচ্ছা ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন; সে জানে, যে নিয়ম সে মানছে, সে নিয়ম তার নিজেরই সৃষ্টি।"[৩]

স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলার মধ্যে এই বিতর্ক অনেকটা স্বভাববাদ ও ভাববাদের মধ্যে সংঘর্ষের মত। স্বভাববাদীরা যখন স্বাধীনতার ধ্বনি তোলেন তখন ভাববাদীরা শৃঙ্খলার পতাকা উত্তোলিত করেন। অথচ একথা স্পষ্ট যে শিক্ষার্থী যদি নিজের আত্মিক সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চায় তবে তাকে শৃঙ্খলার বশ্যতা মানতে হবে। তবেই সে ভাববাদ-প্রচারিত জীবনের মহৎ আদর্শগুলিকে পেতে পারবে। কাজেই শৃঙ্খলার প্রয়োজন তর্কাতীত। এই

১। হ্যাণ্ডবুক অব সাজেসন্স্। পৃঃ ৬৭।
২। হ্যাণ্ডবুক অব সাজেসন্স্—
৩। টি. এইচ. গ্রীন। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স এর ভাষণ হতে গৃহীত।

বিষয়ে প্রয়োগবাদীর মত অনুসরণ করে দেখি। তাঁরা 'প্রকৃতির শাস্তি দ্বারা শৃঙ্খলা' (discipline by natural consequences) কথাটিকে মানেন। এঁরা বলেন প্রকৃতির মধ্যে একটা কার্য্যকারণ শৃঙ্খল রয়েছে। কার্য্য থাকলেই কারণ থাকবে আবার কারণ ঘটলেই তার পরিণতি হবেই। সংকর্মের সৎপরিণতি এবং মন্দ কর্মের মন্দ পরিণতি ঘটা প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্গত স্বভাববাদীরা এই সত্যকেই গৃহে বা বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপনের কাজেও অনুসরণ করতে চান। কোন কাজের মূল্য ও তার সত্যতা নির্ভর করে তার সন্তোষজনক ফলের ওপর। সুতরাং কোন আচরণ ভাল বা মন্দ তা শিশু নিজের কাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতেই বুঝতে শিখবে। রুশো বলেন, 'নেতিবাচক শিক্ষার সময় শুধুমাত্র শাস্তি হিসেবে শাস্তি দেওয়া উচিত নয়। সেটা তাদের ভ্রান্তির স্বাভাবিক ফল (natural consequence) হিসেবে ভোগ করতে দিতে হবে।"[১] আমাদের দেখা দরকার যে শিশুর অবাধ ইচ্ছা যেন প্রাকৃতিক বাধা দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়। শিশু নিজের যেসব কাজ হতে নিজেই (প্রকৃতি দত্ত) শাস্তি পায় সে কাজ সে আর কখনো করে না। পরবর্ত্তীকালে হার্ব্বার্ট স্পেন্সারও 'প্রকৃতি দ্বারা শৃঙ্খলা শিক্ষা নীতি'কে সমর্থন করেন। তিনি বলেন "এই প্রক্রিয়া নৈতিক শিক্ষার প্রধান উপায়। শিশু এর দ্বারা তার কর্মের অলংঘনীয় সুনিশ্চিত ফল ভোগ করবে এবং তার কাজের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া কি হবে তা বুঝতে পেরে ভবিষ্যতে সাবধান হবে। এই ফল তার নিজস্ব শারীরিক হিতসাধনে সাহায্য করবে। কারণ যা শারীরিক সুখ ব্যাহত করে সেই কর্ম হতে সে বিরত থাকবে।"[২] "অতি অল্পদিনেই এই কঠোর কিন্তু হিতকর শৃঙ্খলাকে চিনে নিয়ে সে প্রকৃতিকে লংঘন না করার বিষয়ে সতর্ক হবে।"[৩] সুতরাং বাপমার দায়িত্ব হবে "শিশু যাতে মাঝে মাঝে প্রকৃতির কাছ হতে নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে তার ব্যবস্থা করা, তাদের প্রকৃতিদত্ত শাস্তি হতে রক্ষা করার বা সেই শাস্তি আরো জোরালো করার বা তাদের জায়গায় কৃত্রিম শাস্তির ব্যবস্থা করার প্রয়োজন নেই।"[৪]

প্রকৃতিদত্ত শাস্তির বিপক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হল যে শিশুর অপরাধের চেয়ে শাস্তির মাত্রা অনেক গুরুতর হয়ে যেতে পারে। যে অবোধ শিশু না বুঝে আগুনে হাত দিয়েছে তাকে প্রকৃতিদত্ত শাস্তি অথবা পুড়তে দেওয়া নিতান্ত নিষ্ঠুর ও

১। রুশো। এমিল পৃঃ ৬৫
২। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার। এসেজ অন এডুকেশন। পঃ ৯১
৩। ,, ,, ,, ,, ,, ,, ৯২
৪। ,, ,, ,, ,, ,, ,, ৯৩

অবাস্তব পরিকল্পনা। স্পেন্সার সেকথা চিন্তা করে নিজেই বলেন, "শিশুর হাত পা ভাঙ্গবার বা গভীর কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে প্রকৃতিদত্ত শাস্তিকে বন্ধ করতে হবে।" তাঁর সমসাময়িক খ্যাতনামা টমাস হেনরী হাক্সলী 'প্রকৃতিদত্ত শাস্তি'র কাঠিন্য সম্বন্ধে বিশেষ বিরূপ মন্তব্য করেন। তাঁর মতে এটি একটি অস্বাভাবিক শাস্তিদান প্রক্রিয়া।

"সবরকম আবশ্যিক আইনের মত প্রকৃতি নিষ্ঠুর ও শাস্তিদানে বেহিসেবী। প্রকৃতির কাছে অজ্ঞানতা ও ইচ্ছাকৃত নিয়মভঙ্গ অর্থাৎ অক্ষমতা ও অপরাধ এ দুয়ের কোন পার্থক্য নেই। এই দুটি কার্য্যকেই সে সমান কাঠিন্যের সঙ্গে শাস্তি দিয়ে থাকে। প্রকৃতির শৃঙ্খলায় তিরস্কার ও প্রহার নেই, রয়েছে শুধু নির্মম, নির্বাক প্রহার।"১

আরেকটা অসুবিধা হল প্রকৃতি মৌন। কেন শাস্তি, সে ব্যাখ্যা শিশু প্রকৃতিতে খুঁজে পায় না। হাক্সলী বলেন, "তুমি কানমলা খেলে কেন, তার কারণ খুঁজে বের করার ভার তোমার ওপর।" যুক্তিবাদী বয়স্কদের পক্ষে কারন খুঁজে পাওয়া যত সহজ, ক্ষুদ্র অপরিণত শিশুর পক্ষে কার্য্য ও কারণের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন তেমন সহজ নয়। কিন্তু সে যদি বুঝতেই না পারে যে তার নিজের কর্মের ফলেই সে শাস্তি পেয়েছে তবে তার কোন নৈতিক শিক্ষা হবে না। যদি বুঝবার ক্ষমতা তার থাকে তাহলেও তার বিচার হবে নিতান্ত আত্মকেন্দ্রিক, যেখানে অন্যদের অধিকার ও সুখকে অগ্রাহ্য করা হবে। নৈতিক শিক্ষার একটি সামাজিক পটভূমিকা থাকে। কিন্তু প্রকৃতিদত্ত শাস্তির ফলে প্রকৃত নৈতিকতা না জন্মিয়ে স্বার্থপর বিবেচনার দৃষ্টিভঙ্গী জন্ম নেবে। যেখানে নিজেকে বাঁচিয়ে চলাটাই হবে মুখ্য।

কাজেই নৈতিক শিক্ষার উপায় হিসেবে প্রকৃতিদত্ত শাস্তির দ্বারা শৃঙ্খলা অযথেষ্ট। ঠিক তেমনই প্রয়োগবাদ শিক্ষাদর্শন হিসাবে অসম্পূর্ণ। এর মধ্যে কোন অমোঘ চিরন্তন নীতিবোধ নেই। ভাববাদীরা এই উপায়কে শৈশবে সীমিত ভাবে ব্যবহারের পক্ষপাতী। এমন কি রুশোও বলেন 'শৈশবে শিশুকে কোন প্রকার নৈতিক শিক্ষা দেওয়া চলবে না।' কিন্তু বড়দের জন্য তিনি চিরন্তন নৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁর বক্তব্য, "কোন সৎকার্য্য তখনই শ্রেয়:নীতিগত ভাবে 'ভাল' যখন কাজটি অন্য কিছুর উদ্দেশ্য হিসেবে না করে,

১। স্পেন্সার। কলেক্টেড এসেজ। ভল্যুম III পৃঃ ৮৫

নিছক্ কাজটি করার জন্যই করা হয়েছে।"[১] (a good action is morally good only when it is done as such, not because of others) স্পেন্সার এ ধরণের মহৎ নীতির সংজ্ঞা দেন নি, বরঞ্চ বলেছেন, "যে কোন প্রতিজ্ঞা থেকেই আরম্ভ করা হ'ক, নৈতিকতার সমস্ত তত্ত্বই বলে, যেই আচরণের পূর্ণ ফল (অর্থাৎ তাৎক্ষণিক ও দূরাগত) সন্তোষজনক তাই ভাল আচরণ। আবার যে আচরণের পূর্ণ ফল (তাৎক্ষণিক ও দূরাগত) ক্ষতিকর, তাই মন্দ।"[২] কাজেই কোন শারীরিক আচরণ ভাল কি মন্দ তা, তার দ্বারা সন্তোষজনক কিংবা মন্দ ফল হল তা দিয়ে ছাড়া বিচার করবার ভিন্ন পথ নেই।

ভাববাদীরা এই মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করবেন না। সুশৃঙ্খল আচরণের অন্তর্নিহিত মূল্য আছে এবং তা প্রয়োগের দ্বারা আয়ত্ব হতে পারে, আমরা এই কথায় বিশ্বাস করি।

অতিরিক্ত পাঠসূচী

অ্যাডাম্স্।	মডার্ণ ডেভেলপমেণ্টস্ ইন্ এডুকেশনাল প্র্যাকটিশ। দ্বাদশ অধ্যায়।
বোর্ড অব এডুকেশন।	হ্যাণ্ডবুক অব সাজেসন্স্। পঞ্চম অধ্যায়। স্পেন্স রিপোর্ট।
অলডাস হাক্সলী।	এণ্ড্স্ এ্যাণ্ড মীন্স্। দ্বাদশ অধ্যায়।
কিটিং।	স্টাডিজ্ ইন এডুকেশন। সপ্তম অধ্যায়।
ম্যাকমান।	দ্য চাইল্ড্স্ পাথ্ টু ফ্রীডম।
নান।	এডুকেশন ইট্স্ ডাটা অ্যাণ্ড ফার্স্ট প্রিন্সিপ্ল্স্। পঞ্চদশ অধ্যায়।
রেমণ্ট।	মডার্ণ এডুকেশন। ইট্স্ এইম্স্ অ্যাণ্ড মেথড্স্। দশম অধ্যায়।
রুশো।	এমিল।
সিম্পসন।	অ্যান অ্যাডভেঞ্চার ইন এডুকেশন।
স্পেন্সার।	এসে অব মরাল এডুকেশন।
ওয়েলটন।	হোয়াট ডু উই মীন বাইএডুকেশন। তৃতীয় অধ্যায়।

১। রুশো। এমিল পৃঃ ৬৮.
২। স্পেন্সার। এসেজ অন এডুকেশন পৃঃ ৯১

অষ্টম অধ্যায়

জ্ঞানের শৃঙ্খলা
(Intellectual discipline)

বিভিন্ন দর্শন অনুধাবন করে শিক্ষার তিনটি লক্ষ্যে উপনীত হই। স্বভাববাদীরা বলেন শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধন। প্রয়োগবাদীরা লক্ষ্য হিসাবে প্রগতি (growth) ও মানুষের সৃষ্ট আদর্শের উল্লেখ করেন। ভাববাদীরা বলেন শিক্ষার লক্ষ্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ও সর্ব্বজনীন আদর্শের সঙ্গে তার অন্তরের সুরসঙ্গতি স্থাপন। কোন দর্শনই বলে না যে জ্ঞানই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। অথচ পরিস্কার দেখা যায় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যসাধন করতে হলে পরিবেশের জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। প্রগতি বা মানুষ সৃষ্ট আদর্শ রূপায়িত করার পরিকল্পনা, মানুষ ও বস্তুর পূর্ণ জ্ঞান ছাড়া অসম্ভব। পূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও সর্ব্বজনীন আদর্শের অনুসরণ করার জন্য আধ্যাত্মিক ও জগৎসংক্রান্ত জ্ঞান অত্যাবশ্যক। কাজেই যে পথেই যাওয়া যায়, জ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য না হলেও অনস্বীকার্য্য উপায় বটে। দর্শনের সব শাখাতেই চিন্তাবিদ্রা জ্ঞানকে তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে প্রয়োগ করতে বাধ্য হন। অ্যাডাম্‌সের ভাষায় জ্ঞান শিক্ষার মুখ্য পথ, উপায়।

ভাববাদী শিক্ষাবিদ্রা একবাক্যে বলেছেন যে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে চরিত্র সংগঠন - ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ইত্যাদি। অথচ জ্ঞানকে লক্ষ্য না বলেও, বিপক্ষ শিবিরের শিক্ষাবিদ্দের মত একই ভাবে জ্ঞানকে প্রধান সিদ্ধিলাভের উপায় বলে এঁরাও সর্ব্বাগ্রে স্থান দেন।

হার্ব্বার্ট প্রথমেই বলেছেন শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সদ্‌গুণ বা শ্রেয়ঃনীতিবোধের বিকাশ (virtue or morality)। তাঁর মতে ইচ্ছাশক্তি, চিন্তার বৃত্তকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু তিনি এ কথাও বল্লেন শিক্ষাবিদ্দের প্রধান উদ্দেশ্য হবে জ্ঞান ও ভাবের চর্চা (implant of ideas)। অতএব জ্ঞানই সদ্‌গুণ ও শ্রেয়ঃনীতিবোধকে বিকশিত করতে পারে। এই কথার পরে হার্ব্বার্ট বলেন, শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য হবে জ্ঞানদান (instruction)। তাঁর মনঃস্তাত্ত্বিক মতবাদের পটভূমিকায় শিক্ষাদানের এক অমূল্য পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করলেন যার নাম হল

'পাঠের খসড়া' (lesson plan), গোঁড়া নীতিবাদী সক্রেটিস পর্য্যন্ত বলেন যে প্রকৃত জ্ঞানী কখনো শ্রেয়ঃনীতিবোধহীন হতে পারেনা। "কোন মানুষ যে জানে অথবা বিশ্বাস করে যে সে যা করছে তার চেয়ে আরো ভাল কাজ আছে এবং সেটা তার পক্ষে সাধ্য, সে কখনো মহত্তর কাজ ছেড়ে হীনতর কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হবে না।"[১] ("No man who either knows or believes that other things are better than that which he is doing, if they are such things as he can do, proceeds to do the less good when he might do the better.") এর অর্থ হল জ্ঞানই সদ্‌গুণও শ্রেয়ঃনীতিবোধের মূল। অবশ্য সক্রেটিসের কথা সকলেই হয়তো সমর্থন করবেন না। নিরক্ষর সাধুসন্ত ও শিক্ষিত মন্দ লোকের দৃষ্টান্ত প্রচুর আছে। বরঞ্চ সেণ্টপল মানবিক দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে যা বলেছেন তা বাস্তবের নিকটতর, "যে সৎকার্য্য আমার করা উচিত তা আমি করিনা, যে দুষ্কার্য্য আমার করা উচিত নয় আমি তাতেই ব্যাপৃত হই।"[২]

বর্তমান যুগে আমরা মনে করি সৎ হওয়ার জন্য জ্ঞানের চেয়ে শুভ ইচ্ছার প্রভাব বেশী। তবে সক্রেটিস জ্ঞান কি অর্থে ব্যবহার করেছেন তা বোঝা দরকার। প্রকৃত জ্ঞান সার্ব্বজনীন। তা পৃথিবীর সর্বত্রগ্রাহ্য (universal validity)। যাঁরা এমন জ্ঞানের অধিকারী তাঁরা দার্শনিক এবং তাঁদের বিশেষ চারিত্রিক গুণের (জ্ঞানের) দরুন তাঁরা রাজা হবার যোগ্য। রাজা ও রাজকুমারদের দার্শনিক জ্ঞান থাকা উচিত। যে জ্ঞান সৎজীবন যাপন করতে শেখায় তাই প্রকৃত জ্ঞান।

দার্শনিকরা সবরকম 'সত্যের' অনুরাগী, এঁরা শুধুমাত্র সর্ব্বজনগ্রাহ্য ভাব, (Idea) ও জ্ঞানের অধিকারী নন, তাঁরা সেই ভাবের অনুসরণ করে থাকেন। মনঃস্তত্ত্বের ভাষায় তাঁদের আবেগও সেই সর্ব্বজনগ্রাহ্য ভাবগুলির সঙ্গে জড়িত। কাজেই সত্য, জ্ঞান বা ভাবসত্তার প্রতি তাঁরা অনুরক্ত ও আসক্ত। তাঁরা জ্ঞান যেমন অর্জ্জন করেন সেই জ্ঞানের প্রয়োগে নিজেদের ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করেন। প্রকৃত জ্ঞান অর্থ শুধু মাত্র ভাবের সঞ্চয়ন নয়, আদর্শের অনুসরণ, মূল্য-বোধের রূপায়ণ। (True knowledge is the possession of ideals

১। প্রোটাগোরাস—পৃঃ ৩৫৮
২। এপিসল্‌স্‌ টু দ্য রোম্যান্‌স্‌ VII পৃঃ ১৯

rather 'han ideas)। জ্ঞানকে, এভাবে দেখলে, আমরা সক্রেটিসের সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারি জ্ঞান ও সদ্‌গুণ এক।

অ্যারিষ্টট্‌ল্‌ আমাদের সতর্ক করেছেন মুষ্টিমেয় জ্ঞানীদের মতের সঙ্গে বহুজনের মত মিলবার প্রত্যাশা না করতে। জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অধিকাংশের মত কি? জ্ঞানীরা জ্ঞানের সপক্ষেই বলেন কেননা তাঁদের নিজেদের জ্ঞান থাকার দরুণ তাঁরা জ্ঞান আহরণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজ বলে মনে করতে পারেন। হয়তো তাঁরা এও বলেন যে মানুষের সম্পূর্ণতালাভের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। সভ্যতার প্রগতি নির্ভর করে জ্ঞানের পরিমাণ বৃদ্ধির ওপব। মানুষের মহত্ব যাচাই করা হয় তার চিন্তনের ক্ষমতা আছে কিনা তা দেখে। শিক্ষকরা মনে করেন যে অজ্ঞানের তমসা দূরীকরণ তাদের চরম দায়িত্ব। তাঁরা সাধারণভাবে জ্ঞানের উপযোগিতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন না। তবে তাঁদের মধ্যে যাঁরা চিন্তাশীল তাঁরা কেউ কেউ হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের প্রতিধ্বনি করে প্রশ্ন তোলেন "কোন জ্ঞান সবচেয়ে প্রয়োজনীয়?" জ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষকদের অচলা ভক্তির কারণ হল তাঁরা নিজেরাও এই কথাই নিজেদের ছাত্রজীবনে শিখেছেন যে জ্ঞান লাভই চরম মোক্ষ। তাঁদের মতের সঙ্গে বর্ত্তমানের শিক্ষার্থীদের মাবাবার মতের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এঁরাও মনে করেন জ্ঞানলাভই বিদ্যালয়ে যাওয়ার পরমতম উদ্দেশ্য। তাই শিক্ষার্থীকে প্রত্যেকদিন বাড়ীতে জবাবদিহি করতে হয়, 'আজ স্কুলে কি শিখলে?' আর যদি দুর্ভাগ্যবশতঃ কেউ পাশ করতে না পারে তবে পরিবারসুদ্ধ সবাই গভীর বিষাদে নিমজ্জিত হন।

শিক্ষায় জ্ঞানের স্থান কতটুকু তা নির্ধারণ করতে হলে অ্যাডাম্‌স্‌প্রদত্ত নিম্নলিখিত দ্বিমুখী বিশ্লেষণটি লক্ষ্য করা যাক্‌। শিক্ষাপ্রক্রিয়ায় জ্ঞানের ভূমিকা সম্বন্ধে দুটি মত স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ জ্ঞান মনের পুষ্টির জন্য দ্বিতীয়তঃ জ্ঞান মনের শৃঙ্খলার জন্য। 'পুষ্টি'বাদ (nurture view of knowledge) বলে জ্ঞান যেন মনের খাদ্য। সাধারণ লোকেরও ধারণা শরীরের পুষ্টির জন্য যেমন খাদ্যের দরকার তেমনি মনের পুষ্টির জন্য মনের খাদ্য জ্ঞানের জোগান দেওয়া দরকার। স্বভাববাদ ও প্রয়োগবাদ জ্ঞানকে সাধারণত এই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। স্বভাববাদীরা বলেন পরিবেশের সঙ্গে সুসঙ্গতি স্থাপন করতে হলে পরিবেশ সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়া দরকার। এই জ্ঞানকে বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তব প্রয়োজনসম্মত হওয়া দরকার।

প্রয়োগবাদীরাও জ্ঞানের এই সংজ্ঞাকে সমর্থন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এও

বলেন যে আমরা যে শুধুমাত্র পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিই তাই নয় পরিবেশকে আমরা নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্ত্তনও করে নিই। কখনো বা কতগুলো ভাল ব্যবহার সৃষ্টি করে নিই অথবা নতুন মূল্য এতে যোগ করি। সুতরাং পরিবেশের প্রাকৃতিক দিক্ ছাড়াও এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকও অনুধাবনযোগ্য। কাজেই পরিবেশ সম্বন্ধে সমস্ত রকম জ্ঞানলাভ করা অতি আবশ্যক। প্রয়োগবাদীরা জ্ঞানকে শিক্ষার বাহন করবার অতি বাস্তবসম্মত কারণ দেখালেন।

পুষ্টিতত্ত্বের (nurture theory) মতে যে জ্ঞান আমরা লাভ করি তা 'প্রয়োজনীয়' হওয়া দরকার। কেউ কেউ এই মতের শেষতম প্রান্তে গিয়ে বল্লেন যার প্রত্যক্ষ প্রয়োজন নেই তেমন জ্ঞান আয়ত্ত করা অর্থহীন। আমাদের ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবন থেকেই জানতে পারি কোন বিদ্যা দরকারী বা অদরকারী। অর্থাৎ আমাদের যতটুকু কাজে লাগে ঠিক ততটুকু গণিত, ভূগোল ও বিজ্ঞান শেখা দরকার এবং অদরকারী অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত। অবশ্য শুনতে সহজ হলে কার্য্যত ব্যাপারটি সহজ নয়। শিক্ষকরা ঠিকই বলেন আগের থেকে কোন্ জ্ঞান কাজে লাগবে, আর কোন্ জ্ঞান লাগবে না তা বলা শুধু দুরূহ নয়, প্রায় অসম্ভব। এধরণের শূন্যগর্ভ 'উপযোগিতার' মাপক অনুসরণ করলে মনকে পুষ্টি দেবার বদলে তাকে মানসিক বুভুক্ষার অবস্থায়ই রাখা হবে।

শিক্ষকরা অনেক সময় এই মতের সম্পূর্ণ বিপরীত মত অবলম্বন করে জ্ঞান যে উপায় মাত্র তা ভুলে গিয়ে তাকেই চরম উদ্দেশ্য বলে ধরে নেন। তাঁদের মধ্যে তথ্য সংগ্রহের একটা ভ্রান্ত উৎসাহ দেখা দেয়। এখন, জ্ঞানের সঙ্গে তথ্যকে, স্কুলের ভেতরে বা বাইরে গুলিয়ে ফেলা একেবারেই উচিত নয়। এর দরুণ কিছু কিছু এমন 'এঁচড়ে পক্ক' বিদ্যালয়ের ছাত্র তৈয়ারী হয় যাদের 'তথ্যের ভাণ্ডার' বললেও চলে। শিক্ষকরাও তাদের সঙ্গে পেরে ওঠেন না কেননা তারা তথ্য সংগ্রহে অতিশয় পটু এবং শিক্ষকদের ভুল তারা সহজেই ধরিয়ে দেয়। 'তথ্য সংগ্রহ' নামক প্রকাণ্ড ভূতটি জনতার কাঁধে এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে চেপেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে শুধুমাত্র মেধার ওপর প্রচণ্ড জোর দেওয়া হত। শিক্ষকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অধিক ও অধিকতর তথ্য আহরণ। উৎসাহী যুবকেরা নানা সহজপাঠ্য বিজ্ঞানের বই পড়ে নিজেরাই স্বয়ংশিক্ষিত হতে লাগলো। বিদ্যালয়গুলো হয়ে দাঁড়ালো তথ্যবিপণী এবং শিক্ষকরা হলেন তথ্যপসারী। শিশুরা অন্তরীপ, উপসাগর, নদী, তাদের শাখানদী, রাজাদের

সিংহাসনে আরোহণের তারিখ, বায়ুর উপাদান, স্পঞ্জ রবারের গুণাবলী ইত্যাদি অর্থহীনভাবে আবৃত্তি করে চল্লো। বস্তুত নানারকম ভাবে লোক তথ্য সংগ্রহে উঠে পড়ে লাগলো কিন্তু তারা তথ্য সংগ্রহের বাইরে, তথ্যের ব্যবহারেব দিকে কোন গুরুত্ব দিলেন না। এই বৃথা তথ্যানুসন্ধান ও মুখস্তের উপর অনর্থক ঝোঁকের কারণ সম্ভবতঃ স্কুলের মাস্টার মহাশয়দের নিজেদের স্কুল কলেজের শিক্ষা। তাঁরা নিজেরাও তথ্যানুসন্ধান ও মুখস্ত করেই শিক্ষকতায় নেমেছেন। কাজেই ছেলেমেয়েদেরও তথ্যসন্ধান ও জ্ঞানভাণ্ডার বাড়ানোতে যেন কোন ফাঁক না থাকে সে বিষয়ে কড়াকড়ি করতে লাগলেন। 'তথ্যসংগ্রহ' নামে ভ্রান্তিটি এক সুবুদ্ধিজনিত ধারণা(জ্ঞানলাভ)-র বিকৃত রূপ। জ্ঞান মনকে পুষ্ট করে, এ ধারণা ভুল নয়। কিন্তু বৃথা শুষ্ক তথ্য আহরণ করে লাভ নেই — সেই তত্ত্বের কার্য্যকরী ব্যবহার থাকা চাই। তথ্যের অন্তঃস্থ ক্ষমতা হচ্ছে ব্যবহারে লাগবার শক্তি। তথ্যের অধিকারীদের জানা দরকার কেমন করে কিভাবে এবং কেন সেই তত্ত্বের ব্যবহার হবে। তথ্যকে শুধু মনের ঘর সাজানোর আসবাব বলে ধরে নেওয়া ভুল। তথ্যকে মনের অন্তরঙ্গ সামগ্রী বলে ধরে নেওয়া যায়। মনের মধ্যে তথ্যগুলিকে যেমন তেমন করে গিলিয়ে দেওয়া হলে বদ্‌হজম হয়ে যেতে পারে। ভাবগুলোকে মনের শক্তি বলে বুঝে নিতে হবে, কেননা সেগুলির সাহায্যেই মন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কাজ করতে পারে। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার বলেন, "জ্ঞান যখন চিন্তার সহায়ক হিসাবে কাজ করে তখন তাকে শক্তি বলা যায়।"[১] হার্ব্বার্টের 'অ্যাপারসেপসন ম্যাস' (apperception mass) বলতে এই জিনিষ বোঝায়।

মনের পুষ্টির এই মতবাদ যুক্তিসংগত। এর অর্থ মনকে এমন তথ্য দিয়ে পরিপুষ্ট করতে হবে যার সাহায্যে এরা বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে। শুধু তথ্য আহরণ দিয়ে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। সমস্ত তথ্যকে মানসিক ক্ষমতায় পরিণত করা যায় না। কিন্তু যে জ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত উপায় তাকে এমন মানসিক ক্ষমতায় পরিণত করা দরকার যা দিয়ে জগতের ব্যাখ্যা করা চলে এবং যখন যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার সঙ্গে মোকাবিলা করা চলে অথবা অন্ততঃ মোকাবিলা করবার আশা থাকে। জগৎ অর্থ শুধু মাত্র প্রাকৃতিক জগৎ নয় নিত্যকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মের জগৎ। সত্যিকার জ্ঞান হল সেই

১। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার, এসেজ অন এডুকেশন পৃঃ ৮১

উপাদান যা দিয়ে একটি বিচক্ষণ মন গড়ে ওঠে। তাই মানসিক পুষ্টির তত্ত্ব যথেষ্ট প্রসারিত হলে তা শিক্ষাবিদ্‌দের কাছে গ্রাহ্য।

পুষ্টিতত্ত্বে জ্ঞানের বিষয় বস্তু, যা মনের পুষ্টি যোগাবে, সেটাকে দেখা বিশেষ দরকার। এইখানে মনের শৃঙ্খলাবাদীদের সঙ্গে আমাদের ভিন্নমত হতে হয়। তাঁরা বলেন জ্ঞানের তথ্যসামগ্রীর, মনের পুষ্টি জোগানো ছাড়া, আরেকটা মূল্যবান কাজ হচ্ছে, মনের শৃঙ্খলা দান (training of mind)। জ্ঞানকে মনের শৃঙ্খলা স্থাপনের কাজে লাগানো যায়। যাঁরা এই তত্ত্বে বিশ্বাসী তাঁরা বলেন জ্ঞান ব্যবহারিক প্রয়োজনে লাগবে বলে মূল্যবান নয়। এর মূল্য এই যে, মনকে এরা ঘর্ষণ মার্জ্জন করে উজ্জ্বল করে তোলে। অর্থাৎ জ্ঞান লাভ মনের ব্যায়ামের কাজ করে। শরীর চর্চাতে ব্যায়ামের যে স্থান, মনের শক্তি বাড়াবার জন্য জ্ঞান অর্জ্জনের সেই ভূমিকা, ব্যায়ামের নিজস্ব কোন মূল্য নেই। শরীরকে পুষ্ট করে বলেই তার মূল্য, তেমনি মানসিক অনুশীলনে মনের বুদ্ধিশক্তি প্রখর হবে। তার নিজস্ব কিছু মূল্য নেই। মানসিক ব্যায়ামতত্ত্বের সমর্থকরা বলেন জ্ঞানের বিষয়গুলি যেন বুদ্ধিতে শান দেবার পাথর। ১৫৫৭ সালে 'বুদ্ধিশান দেবার পাথর' বলে অ্যালজেব্রার একটি বই বের হয়। তাতে বোঝা যায় অ্যালজেব্রাকে নিজগুনে দামী না বলে মনের উৎকর্ষসাধনে ও মানসিক ক্ষমতাগুলিকে ক্ষুরধার করে তুলতে উপযোগী বলে বীজগণিতকে অভিহিত করা হচ্ছে। সক্রেটিস অনেক দিন আগেই বলেছেন, "জ্যামিতি যে পড়েছে তার ধারণাশক্তি জ্যামিতি যে পড়েনি তার চেয়ে অনেকখানি বেশী।"[১] প্লেটোর মতে যারা জ্যামিতি পড়েনি তাদের দর্শন শাস্ত্রের পাঠ হতে বঞ্চিত করতে হবে। প্লেটোর মতে দার্শনিকরাই হবেন রাষ্ট্রের কর্ণধার অতএব তাদের মানসিক প্রখরতা বিশেষ দরকার। তেমনি ল্যাটিন পড়ানো হবে ল্যাটিন সাহিত্য উপভোগ করার জন্য নয়, এই দুরূহ ভাষাকে আয়ত্ত করতে মনের যে কসরৎ করতে হবে তার দ্বারা মনের শক্তি ক্ষুরধার হবে বলে। জ্ঞানকে এই ভাবে মানসিক অনুশীলনের সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার থেকে এলো শিক্ষাক্ষেত্রে 'যথোচিত শিক্ষা' (formal training)-র ধারণা।

মনের শৃঙ্খলাবদ্ধতার অনুশীলনকে এ সময় অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হতে লাগলো। মন যেন কতগুলি ক্ষমতার আধার। ক্ষমতাগুলিকে বিশ্লেষণ করে বলা যায়, তা হচ্ছে স্মৃতি, যুক্তি, বিচারবোধ, কল্পনাশক্তি, পর্য্যবেক্ষণশক্তি

১। প্লেটো। রিপাবলিক। VII পঃ ৫২৭

ইত্যাদি। এই ক্ষমতাগুলিকে সর্ব্বদা ঘষামাজা করে শাণিত রাখা দরকার যাতে যে কোন অবস্থায় তারা ভাল কাজ করে। সেইটি দেখার দায়িত্ব শিক্ষার। এই মতবাদের গোঁড়া বিশ্বাসীরা মনে করেন, কি শেখানো হচ্ছে তাতে কিছু আসে যায় না। ক্ষমতাগুলির চর্চা বিশেষ জরুরী। এই তত্ত্বের ফলে পাঠক্রমের মধ্যে কতগুলি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এরা প্রত্যেকেই কোন না কোন মানসিক ক্ষমতাকে শাণিত করবে। গণিত সূক্ষ্ম বিচারশক্তিকে পাকা করবে, মানসাঙ্ক মনের ক্ষিপ্রতা বাড়াবে, প্রাচীন সাহিত্য দ্বারা ভাষার ওপর দক্ষতা ও মানসিক রুচির সমৃদ্ধি হবে। যে কোন বস্তু মুখস্থ করলেই স্মৃতিশক্তি সর্ব্বতোভাবে প্রখর হবে। যেমন শাণ দেবার পাথর শক্ত হলে বেশী কাজ দেয় তেমনি স্কুলের পাঠ্য বিষয়গুলি যত কঠিন হবে ততই বুদ্ধিতে ধার দিতে বেশী সহায়ক হবে। তেতো ওষুধ যেমন শরীরের পক্ষে ভাল বলে গ্রহণীয় তেমনি সেই পাঠ্য বিষয়গুলি যত বেশী কঠিন অরুচিকর ও ক্লান্তিকর ততই মনের শক্তিবৃদ্ধিতে উপযোগী। এই সঙ্গে, চিত্তাকর্ষক ও মনোহর বিষয়গুলির মনকে শাণিত করা ক্ষমতা নেই বলে তাদের সন্দেহের চোখে দেখে অবহেলা করা হতে থাকলো। যদি কোন ছেলের কারু শিল্পে আকর্ষণ ও অঙ্কে অরুচি থাকে, তবে সেই কারণেই তাকে অঙ্ক বেশী করে পড়ানো হতে হবে। এই মতবাদকে উপহাস করে টি. এইচ. হাক্সলী বল্লেন, "আমি অস্থিবিদ্যার এমন নীরস আর কঠিন গালভরা শব্দ ভর্ত্তি, কিশোরদের সম্পূর্ণ অরুচিকর বই লিখতে পারি যা মনে ধার দেবার জন্য শিক্ষার শৃঙ্খলাবাদীরা কাড়াকাড়ি করে কিনবেন।"[১]

যাদেরই কিছুটা সাধারণবোধ আছে তারা বুঝতে পারবেন শিক্ষার এই শৃঙ্খলাবাদের মধ্যে সত্যের চেয়ে বাড়াবাড়ি অনেকখানি বেশী। প্রথমত, মনের ক্ষমতাগুলিকে আলাদা করা যায় না। যদি বা যায়, তাহলেও আলাদা আলাদা পাঠ্যবিষয়ের সাহায্যে সেগুলিকে প্রখর করার চেষ্টা করা যায় না, জ্ঞানের স্বকীয় মূল্য (intrinsic value) ভিন্ন অন্য কোন উপকরণ মূল্য (instrumental value)র জন্য জ্ঞানের চর্চার কথা প্রাচীন শিক্ষাবিদের মাথায় আসেনি। জ্ঞান দিয়ে মনে শাণ দেবার পরিকল্পনা পরবর্তী কালের উচ্চকোটির ভাবনা। অ্যাডাম্‌স্‌ ঠাট্টা করে বলেন, "যখন শিক্ষা ব্যাপারটি বেশ পাকাপোক্ত ভাবে অধিষ্ঠিত, এই ধারণাটি তখনকার কালের উদ্ভাবন।"[২] প্রাচীনপন্থী

১। অলডাস্‌ হাক্সলী। কলেক্‌টেড এসেজ। ভল্যুম III। পৃঃ ৯৯
২। অ্যাডাম্‌স্‌। ইভল্যুসন অব এডুকেশনাল থিয়োরী পৃঃ ২২৩।

শিক্ষকরা এমন সব পাঠক্রম পড়াচ্ছিলেন যার সঙ্গে জীবনের কোন সংযোগ নেই, অথচ কোন একসময় পাঠক্রমে তারা স্থান পেয়েছিল বলে তারা ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে চলে আসছিল। এই প্রথার কারণ দেখাবার প্রয়োজন হলে শিক্ষকরা নিজেদের অবচেতন মানসিক আলস্যের কথা ঢাকবার জন্য 'মানসিক অনুশীলনে"র (formal training) অজুহাত দিতেন। এমনি করে, যে ল্যাটিন ভাষা মধ্যযুগে সমস্ত বিষয়ের দরজা খোলবার চাবিস্বরূপ ছিল, পরবর্তী নবজাগরণের (রেনেসাঁর) কালে প্রাচীন রোমক সাহিত্য ও জীবনকে বোঝবার জন্য অব্যর্থ ছিল, এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও যা ধর্ম্ম, আইন বিজ্ঞান ও কূটনীতি বোঝার জন্য দরকারী ভাষা ছিল, পরবর্তী যুগে যখন এর কোন প্রকার আপাতমূল্য নেই তখনও সেই ল্যাটিনকে মনকে ধার দেবার অজুহাতে শেখানো হতে লাগলো।

অবশ্য বর্ত্তমানের এই প্রথার নিস্ফলতা সকলের কাছেই স্পষ্ট। কিন্তু তা হলেও শিক্ষা এর লৌহনিগড় হতে এখনো সম্পূর্ণ মুক্ত হয়নি। এখনো ইয়োরোপের স্কুলে ল্যাটিনপাঠ গৌরবের বস্তু। বিশেষ মার্জিত রুচির লোকদের জন্য ল্যাটিন অবশ্য পাঠ্য। তবে শিক্ষাতত্ত্ব হিসাবে এই 'মানসিক অনুশীলন' (formal training) তত্ত্বটি যে অচল একথা আজ স্বীকৃত হয়েছে। কবে প্রথম এই সত্য প্রতিভাত হয় ?

গত শতাব্দীর শেষভাগে অ্যাডাম্‌স্ এই বিচিত্র গোঁড়ামীকে সাধারণ বুদ্ধির অস্ত্রে ঘায়েল করেন। 'দি হারবারশিয়ান সাইকোলজি অ্যাপ্লায়েড টু এডুকেশন' গ্রন্থে 'ফর্মাল ট্রেনিং' অধ্যায়ে দেখালেন যে নিজস্ব মূল্য না থাকলে, কোন বিষয়কে শুধুমাত্র মনের বৃত্তিতে ধার দেবার জন্য মূল্যবান গণ্য করা নিতান্ত হাস্যকর। এঁরা বলেন গণিত বুদ্ধিকে প্রখর করে। অ্যাডাম্‌স্ বলেন "তবে চুরিবিদ্যা শেখানো যাবে না কেন ? গাছের ফলপাকুড় চুরি করতেও নানা রকম তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দরকার হয়, গণিত বা ল্যাটিন দিয়ে যদি মনের বুদ্ধি বাড়ানোর কসরৎ করা যায় তবে চুরি ইত্যাদি করিয়ে, বৈজ্ঞানিক ভাবে অপরাধ বিজ্ঞান শিক্ষা করা যায়...গাছের ফল ইত্যাদি চুরি বিদ্যার চর্চা ল্যাটিন ও অঙ্কের বদলে করলেও মনের প্রখরতা বাড়বার সাহায্য হবে।"[১] ফ্যাগিনের (অলিভার টুইষ্ট উপন্যাসের চরিত্র) চুরি বিদ্যার স্কুল কল্পনা করে অ্যাডাম্‌স্ রহস্য করে বল্লেন যদিও মন শাণানোর কাজে এই বিদ্যা আর স্কুলের বিদ্যাচর্চার বিশেষ

১। অ্যাডাম্‌স্। হারবারশিয়ান সাইকোলজি। পৃঃ ১১১

পার্থক্য নেই তবে এটা সত্যি, পন্থা হিসেবে ফ্যাগিনের স্কুলের রীতিনীতি না শেখাই ভাল। কেননা এতে মনের চর্চা হয় বটে কিন্তু বুদ্ধির গতি যায় ভুল দিকে। ফ্যাগিন খারাপ মাস্টার মশাই নয় কিন্তু সে যা পড়ায় সেটা খারাপ। অতএব কি পড়ানো হচ্ছে তাও চিন্তা করা দরকার। তা শুধু মাত্র শক্ত হলেই চলবে না। তাই দেখা যায় আমরা ঘুরে ফিরে 'মানসিক পুষ্টি'তত্ত্বের সমর্থনে চলে আসছি।

মানসিক অনুশীলন বাদে আরেক আঘাত আসে 'শক্তিতত্ত্বের' (faculty psychology) দিক হতে। মন এক এবং অখণ্ড। তাকে কতগুলো শক্তির আধার বলে ভাবা সম্ভব নয়। 'শক্তি-তত্ত্বে'র কল্পনা নিতান্ত ধারণা মাত্র। সেখানে এক একটি স্বতন্ত্র শক্তির বিশ্লেষণ করে মনকে খণ্ড খণ্ড করে ভাবা হয়েছে। সমগ্র মনের ধারণাই তাতে বিকৃত হয়েছে। 'শক্তিতত্ত্বের' ধারণার বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সেই তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠীত 'মানসিক অনুশীলন' তত্ত্বটিও ভূমিসাৎ হয়। তা ছাড়া পরীক্ষাভিত্তিক মনঃস্তত্ত্বের (experimental psychology) বিশেষজ্ঞরা কতগুলি পরীক্ষার ফল সংগৃহীত করেন। শিক্ষার সংক্রমণ (transfer of training) নিয়ে, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। যদি সংক্রমণ সত্য হয় তবে একটি মানসিক শক্তির উৎকর্ষ সাধন করলে অন্য মানসিক শক্তিরও উন্নতি হওয়া উচিত। যেমন কবিতা মুখস্থ করে যদি স্মৃতিশক্তি বাড়ে তবে শুধুমাত্র কবিতা শেখার ব্যাপারেই স্মৃতিশক্তির বৃদ্ধি হবে না—অন্য সব কিছু শেখাতেই স্মৃতিশক্তি সাহায্য করবে। যেমন অঙ্কের নামতা, ইতিহাসের তারিখ ইত্যাদি মনে রাখা কবিতা মুখস্থের দরুণ সহজ হবে। এক্সপেরিমেণ্টাল সাইকোলজিতে এই সমস্যাটি বিশেষ গুরু সমস্যা বলে গৃহীত হয়। উইলিয়ম জেম্‌স্ নিজের ওপর নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা চালান। প্রতিদিন তিনি মিলটনের প্যারাডাইস লষ্টের কিছুটা অংশ মুখস্থ করতে থাকেন। তারপর মুখস্থ শক্তি বাড়ল কিনা দেখাব জন্য ভিক্টর হুগোর "Satyr" মুখস্থ করতে থাকেন। তিনি দেখলেন যে তার "মুখস্থ শিক্ষার" আগে ও পরে মুখস্থ ক্ষমতায় বিশেষ কোন তফাৎ দেখা গেল না। এরপরে তিনি আরো সতর্কতার সঙ্গে বিস্তারিত করে কতগুলি ক্রমিক পরীক্ষা করেন। এই পরীক্ষার পদ্ধতি জটিল নয়। প্রথমে কোন একটা বিষয়ের উপর মনের একটি শক্তির (এ ক্ষেত্রে মুখস্থ বা স্মৃতিশক্তির) পরীক্ষা নেওয়া হবে। তার পরে অন্য কোন বিষয়ের সাহায্যে সেই শক্তিকে শিক্ষা দেওয়া হবে। শেষকালে আবার প্রথম বিষয়টি নিয়ে

সেই শক্তিকে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করা হবে। যদি দ্বিতীয় বিষয়ের শিক্ষা দিয়ে প্রথম বিষয়টি শেখায় সাহায্য হয় তবে বলা যাবে শিক্ষা সংক্রামিত হয়েছে। শিক্ষায় সংক্রমণের উপর বেশ কিছু পরীক্ষা হয়েছে। কিছু ছেলেমেয়েকে খুব ভালভাবে ব্যাকরণ শেখালে কিছুকাল পরে দেখা হল তারা খেলাধূলাতেও ভাল করতে পারে কিনা অথবা অঙ্ক ভালভাবে শিখলে হাতের লেখার উৎকর্ষ হয় কিনা। এই সমস্ত সমীক্ষায় কখনো কখনো দেখা গেল ফল নেতিবাচক হচ্ছে, অর্থাৎ যে ছেলেদের মানসিক পড়াশোনার কাজে উৎকর্ষ দেখা যাচ্ছে তাদের দৈহিক কুশলতার কাজে পশ্চাৎগতি হয়েছে। কখনো বা ভাল কি মন্দ কোন ফল লক্ষ্য করা যায়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য সামান্য উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যেমন যে ছেলে ভাল ব্যাকরণ শিখেছে তার রচনা লেখাও কিছুটা উন্নত হয়েছে। এ থেকে স্যাণ্ডিফোর্ড তিনটি সিদ্ধান্তে আসেন। (এক) সংক্রমণের প্রভাব নেতিবাচক, শূণ্য অথবা ইতিবাচক হতে পারে। সাধারণত পরীক্ষার ইতিবাচক ফল দেখা যায় কিন্তু তখনও উন্নতির পরিমান অত্যন্ত নগন্য, প্রায় শূণ্যের কাছাকাছি হতে পারে। (দুই) যদি কোথাও যথেষ্ট সংক্রমণ লক্ষিত হয়, সেখানে নির্ঘাৎ দেখা যায় দুই বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেক পরিমাণে সামান্যতা আছে। (তিন) পরীক্ষাগুলো থেকে এ কথা প্রমাণ হয়নি যে কোন একটা বিশেষ বিষয়ের শিক্ষণের ফলে সম্পূর্ণভাবে মনের অনুশীলন সম্ভব হয়েছে।"[১]

ল্যাংডন ও ইয়েট্স্ খুব যত্ন করে বৈজ্ঞানিক সতর্কতা সহযোগে, সমস্ত পরীক্ষার সময়কালে একভাবে আগ্রহের পরিমাণ নিশ্চিন্ত রেখে প্রথম এবং শেষ অভীক্ষার ব্যবস্থা করেন। তা ছাড়া কতটা পরিমাণে 'উন্নতি' হল লক্ষ্য করার জন্য সমান্তরাল (এবং সমান) আরেকটি দলকে রাখলেন, পরীক্ষিত দলের পাশাপাশি। প্রথম দলটিকে কোনরকম অনুশীলন দেওয়া হল না। তা ছাড়া যাতে গাণিতিক নিয়মানুসারে তাঁদের পরীক্ষার ফল গ্রহণযোগ্য হয়, বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র নিয়ে তিনি এই পরীক্ষা করেন কিন্তু এত সতর্ক বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার পরেও নেতিবাচক ফল পাওয়া গেল।

কক্স আরেকটি পরীক্ষায় আরেকরকম অনুশীলন দেন। এখানে শুধুমাত্র মুখস্থ না করে একটি দলকে 'বুদ্ধির সঙ্গে' শেখানোর (insight learning) চেষ্টা করা হয়। দেখা যায় যান্ত্রিক ট্রেনিংয়ে শিক্ষায় সংক্রমন সামান্য। কিন্তু যখন

১। স্যাণ্ডিফোর্ড। এ্যান এক্সপেরিমেণ্টাল ইনভেষ্টিগেশন ইন্টু ট্রান্সফার অব ট্রেনিং ইন স্কিল্ড্ পারফরমেন্সেস.। বৃটিশ জর্নাল অব সাইকোলজি XVIII 1928.

কোন সাধারণ সূত্র (principle) শেখানো হয় তখন সংক্রমণের পরিমাণ যথেষ্ট হয়। এসব থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে সামান্যতা (common elements) না থাকলে সংক্রমণ হয় না। কিন্তু যদি দুটি বিষয়ের একজাতীয় উপাদান থাকে এবং শেখবার সময় শিক্ষার্থীকে সেই সমজাতীয় উপাদানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয় তবে শিক্ষায় সংক্রমণ ঘটে । রুয়েডিগারের (Ruediger) পরীক্ষাতেও দেখা যায় স্কুলপাঠ্য কোন বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা (neatness) অভ্যাস হলে, সেটা অন্যান্য পাঠবিষয়ের কাজের ব্যাপারেও সংক্রামিত হয়। "তবে যখন পরিচ্ছন্নতা শেখানো হচ্ছে তখন শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষিত করা দরকার এবং এটা যে বাঞ্ছনীয় গুণ তাও বিশেষ করে বলা দরকার।"[১]

কাজেই সাধারণত যদি কেউ সচেতন ভাবে শেখে তবে শিক্ষার মূল সূত্রগুলি সংক্রামিত হয়। ব্যাগলী বলেন গণিত শিক্ষণে যে স্তরবিন্যাসে চিন্তনের ব্যবহার হয় সেই যুক্তিযুক্ত চিন্তন অন্যান্য ক্ষেত্রেও কাজে লাগানো যায়, "যেমন রাজনৈতিক অর্থনীতিতে (political economics) অঙ্কের শিক্ষার সংক্রমণ হওয়া সম্ভব। সুতরাং কোন লেখার বিষয়ে ছাত্রদের যদি সাধারণ ভাবে সুষ্ঠু ও স্বল্পসময়ে কাজ করার অভ্যাস রপ্ত করতে দেওয়া হয় তবে অন্যান্য বিষয় শিখতেও তারা সেই সুঅভ্যাস ব্যবহার করতে পারে।"[২]

মোট কথা, ছাত্রদের বিষয়শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের আবেগকে (emotion) জাগ্রত করতে হবে তাহলে কিছু সংক্রমণ সম্ভব হবে। জীবনের সাধারণ সমস্যার প্রতি আমাদের যে বিশিষ্ট মানসিকতা (altitude) থাকে তা আবেগ হতে উপজাত। সেই আবেগ আমাদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টাকে প্রভাবিত করে। তবে এও সত্যি যে মনোভাব বা আবেগের উৎকর্ষ নির্ভর করবে শুধু মাত্র বিষয় শেখার উপর নয়—ছাত্র ও শিক্ষকের সম্বন্ধেরও ওপর।

'শক্তিতত্ত্বে' মানুষের অবিশ্বাস দেখা যায় এ কারণে যে মনের মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ শক্তির অস্তিত্ব মেনে নেওয়া কিছুটা অসম্ভব। সাধারণ অভিজ্ঞতাতে দেখি স্মৃতিশক্তি সমস্ত বিষয়শিক্ষায় সমান ভাবে কাজ করে না। কেউ কোন বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্পূর্ণ ভাবে মনে রাখতে পারে কিন্তু অন্য কতগুলি ক্ষেত্রে তাদের স্মৃতি নিতান্ত দুর্বল। কোন বিষয়ে কারো ঔৎসুক্য থাকলে সে ব্যক্তি সেই বিষয়টিই ভাল করে স্মরণ রাখতে পারেন। কেউ যদি তর্ক তোলেন এই বলে যে যাঁরা

১। ব্যাগলী এডুকেশনাল ভ্যালুজ পৃঃ ১৯১
২। „ „ „ পৃঃ ১৯০

অঙ্ক, প্রাচীন সাহিত্য বা দর্শন ইত্যাদি কঠিন বিষয়গুলি ভাল করে শিখেছেন তাঁদের বুদ্ধি সাধারণের চেয়ে অনেক বেশী উৎকর্ষলাভ করেছে তাদের উত্তরে বলা যায় যে প্রথমতঃ ঐসব কঠিন বিষয়গুলি যাঁরা অধ্যয়ন ও আয়ত্ত করেন তাঁরা গোড়া হতেই উৎকৃষ্ট মেধার অধিকারী। বিষয়গুলি পড়ে তাদের বুদ্ধি বাড়েনি। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ছিল বলেই তারা ঐ সব পড়তে পেরেছেন এবং সেই উৎকৃষ্ট মেধার জোরেই অন্য বিষয়গুলিতেও তারা সফল হতে পেরেছেন। তার অর্থ কঠিন বিষয় (ল্যাটিন, অঙ্ক ইত্যাদি) পড়ে উৎকৃষ্ট মনের সৃষ্টি হয় নি। উত্তম মন, বা মেধা থাকাতেই কঠিন অধ্যয়ন সম্ভব হয়েছে, সাফল্যের কারণ উত্তম মানস, উত্তম শিক্ষা নয়।

তবে যে যুগ যুগ ধরে শিক্ষকরা বিশ্বাস করেছেন যে বৌদ্ধিক চর্চা (intelectual education) মানসকে উন্নত করে, তা কি ভুল ধারণা? কতগুলি বিশেষ কঠিন বিষয় পড়ে মেধাকে ধারালো করার তত্ত্ব ভুল প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধিক পড়াশোনার তত্ত্বকে নস্যাৎ করা যায় না।

বাস্তবিক মানসিক অনুশীলন (formal education) কথাটির মধ্যে গভীর সত্য আছে। যিনি গণিত নিয়ে বাস্তবিক অনুরাগের সঙ্গে চর্চা করে থাকেন তিনি শুধু যে গণিতেই পণ্ডিত হবেন তা নয়। জগতের দিকেও তাঁর তাকাবার ভঙ্গি কিছুটা ভিন্ন হবে। গণিতের মূলসূত্রগুলি তিনি সামাজিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করবেন। তাঁর মনও কাজ করবে গাণিতিক ভাবে, ঐতিহাসিকের বা বৈজ্ঞানিকের ধরনে নয়। এই মানসিকতা গাণিতিক শিক্ষার ফল, সেই হিসাবে "মানসিক অনুশীলন" তত্ত্ব ভুল নয়। মনঃস্তত্ত্বের পরীক্ষার ফল নেতিবাচক হলেও একে ভুল বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমরা 'নৈতিক শিক্ষা'র (moral discipline) কথা আগের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। মানসিক বা বৌদ্ধিক শিক্ষার প্রগতি, নৈতিক শিক্ষা যেমনভাবে দেওয়া হয়, একই প্রক্রিয়াতে ঘটে। অপরিণত মনকে পরিণত মন যখন প্রভাবিত করে তখন শিষ্যরা, গুরুর প্রতি ভক্তি ও সম্ভ্রমের ফলে গুরুর নৈতিকগুণ অনুকরণ করার চেষ্টা করে। পরে সেই চারিত্রিক গুণ শিষ্যতে বর্তায়। শিষ্যের নিজের মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়, তার আত্মসংযমের ক্ষমতা পরিস্ফুট হয় এবং তার নিজস্ব চরিত্র সুগঠিত হয়। একইভাবে মানসিক ক্ষমতাও বিকশিত হয়।

পড়াশোনার ক্ষেত্রেও একই জিনিষ লক্ষ্য করি। কোন ছাত্র যদি তার গণিত শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে তবে সে শিক্ষকের মতো, গণিতও শিখতে উৎসাহিত

হবে। গুরু, তাঁর ছাত্রদের এই আগ্রহ ও তাঁর নিজের (গুরুর) প্রতি শ্রদ্ধাকে এমনভাবে চালিত করবেন, যাতে মহৎ গাণিতিকদের সম্বন্ধে তাদের শ্রদ্ধা জাগে। "কেননা বড় প্রতিভার কাছাকাছি থাকাও এক প্রকারের শিক্ষা। তাঁদের চিন্তার অনুকরণ করে ছাত্ররা তাঁদের কৃতিত্বের অনুগামী হবে। তাদের মনও সেই বিষয়ের আকার ধারণ করবে। (যেমন গণিত ছাত্রদের গাণিতিক ও সুশৃঙ্খল মানসিকতা জন্মাবে ইত্যাদি।) অবশেষে গাণিতিক শিক্ষার জন্য তাদের আগ্রহ জাগবে, গণিতের প্রতি স্থায়ী অনুরক্তি জন্মাবে। শিক্ষার্থী তার গুরুর নিপুণতা দেখে, নিজের কর্মক্ষেত্রে পটুতা অর্জন করবে। স্পেন্স রিপোর্ট রচনাকারীরা মনে করেন— "আমাদের ছাত্ররা যখন কোন বৃহৎ প্রতিভার দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন তারা সেই মনীষির দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে শেখে। তাঁদের আদর্শকে শ্রদ্ধা করে তারা এত অনুপ্রাণিত হয় যে সমস্ত জীবন ধরেই সেই আদর্শ-গুলিকে নিজের জীবনে রূপায়িত করতে চায়। নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে চায়।"

স্বভাববাদ ও প্রয়োগবাদ শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানের পুষ্টিতত্ত্বটির সমর্থক। কিন্তু অনুশীলন বাদ (অথবা বুদ্ধিতে শাণ দেবার তত্ত্ব) ভাববাদীদের মতানুসারী।" কেননা বৌদ্ধিক শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীরা শিক্ষার বৌদ্ধিক আদর্শের অনুসরণ করতে পারে এবং পারমার্থিক সত্তার ভাবজগতের অংশভাক্ হয়। তবে এই দুই মতের ভিন্নতা যেমন আছে তেমন কিছুটা মিলও আছে। তথ্যসংগ্রহ ব্যাপারটা মনের পুষ্টি না করে অজীর্ণ রোগের দৃষ্টি করে। কিন্তু প্রকৃত মানসিক পুষ্টি তখনই হয় যখন তথ্যগুলিকে সুবিন্যস্ত সুসংহত করার চেষ্টায় চিন্তনের শক্তি হয়ে দাঁড়ায় মজ্জাগত। মনের অনুশীলন তত্ত্বকে বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করলে 'মানসিক শিক্ষা'র ভূত বা 'শক্তিতত্ত্বের' উদ্ভট্ ধারণার দাস হতে হয়। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি বলে যে 'মনের শিক্ষা' দিলে দুয়েকটি শক্তির বদলে পুরো মনেরই উপকার হবে। জ্ঞান থেকে যে ভাব বা ধারণার জন্ম হয় তা তো শুধুমাত্র মনের জঞ্জাল নয়—সেগুলি মন আত্মসাৎ করে নিজেকে আরো বিকশিত করে তোলে। সমস্ত অভিজ্ঞতাই মনকে বাড়িয়ে তোলে আর কোন সুসংহত পরিকল্পনামতো কতগুলি বৌদ্ধিক বিষয়ের পাঠও মনকে ক্রমোন্নত হতে সাহায্য করে। এই নতুন আয়ত্ত করা শক্তিগুলি একত্র সম্মিলিত হয়ে এক সুশৃঙ্খল ঐক্যবদ্ধ স্থায়ী মানসিকতার সৃষ্টি করে যা আমাদের সারা জীবনকে প্রভাবিত করে। এদের কেউ বলেন জটিলতা (complex) কেউ বলেন "অ্যাপারসেপসন মাস" (apperception mass) কাজেই অনুশীলনবাদ অনুসারে "মানসিক শিক্ষা"

বা অনুশীলন থেকে জন্ম নেয় মানসিক ক্ষমতা। শেখা তথ্য হয়ে দাঁড়ায় মনের শক্তি। সুতরাং পুষ্টির জন্য জ্ঞান বা শৃঙ্খলার জন্য জ্ঞান এই দুটি মতবাদের মধ্যে ভেদের চেয়ে অভেদ বেশী। একে অন্যের পরিপূরক।

অতিরিক্ত পাঠসূচী

অ্যাডাম্‌স্। ইভল্যুসন অব এডুকেশনাল থিয়োরী। সপ্তম অধ্যায়।
হারবারশিয়ান সাইকোলজি। পঞ্চম অধ্যায়।

ব্যাগলী। এডুকেশনাল ভ্যালুজ। দ্বাদশ অধ্যায়।

বোর্ড অব এডুকেশন। স্পেন্স রিপোর্ট।

টি. এইচ হাক্সলী। কলেকটেড এসেজ্‌।

নান। এডুকেশন ইটস্‌ ডাটা এ্যাণ্ড ফার্ষ্ট প্রিন্সিপল্‌স্। পঞ্চদশ অধ্যায়।

পিনসেণ্ট। প্রিন্সিপল্‌স্ অব টিচিং মেথড। নবম অধ্যায়।

রেমণ্ট। মডার্ন এডুকেশন। ইট্‌স্ এইম্‌স্ অ্যাণ্ড মেথড্‌স্। ষষ্ঠ অধ্যায়।

স্যাণ্ডি ফোর্ড। এডুকেশনাল সাইকোলজি। চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

স্নাইট। এডুকেশনাল ভ্যালুজ এ্যাণ্ড মেথডস্।

হার্ব্বার্ট স্পেন্সার। এসে অন ইনটেলেকচুয়াল এডুকেশন।

নবম অধ্যায়

পাঠক্রম

সমস্ত শিক্ষাদর্শন এক বিষয়ে একমত যে শিক্ষার প্রধান অঙ্গ জ্ঞান বা বিষয়বস্তু। আরেকভাবে বলা যায় যে স্কুলগুলির অস্তিত্বের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানদান বা বিষয়বস্তু শেখানো, সুতরাং কি ধরণের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা শিশুদের বিদ্যালয়ে দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কোন বিষয় অনুসারে স্কুলের পাঠবস্তু নির্ব্বাচন করা হবে, পাঠক্রমের বিষয়বস্তু বা কি হবে, বিভিন্ন শিক্ষাদর্শন থেকে তার বিভিন্ন উত্তর পাই, তবে অন্যান্য বিষয়ের মত এক্ষেত্রেও বিভিন্ন উত্তরের মধ্য হতে সাধারণ একটি উত্তর আবিষ্কার করা যায়। সাধারণতঃ এই উত্তরগুলি পরস্পরের পরিপূরক।

চরম স্বভাববাদ বলে যে বিদ্যালয়ের পাঠক্রম হবে বর্ত্তমান অভিজ্ঞতা, নানা রকম কর্ম (activities) এবং শিশুর নিজের রুচি ও আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় ও কর্মের সমাহার। তাদের নিজস্ব আগ্রহই পাঠক্রম নির্ধারিত করবে। তাকে নিজের ইচ্ছা ও রুচি অনুযায়ী অভিজ্ঞতা পেতে দেওয়া হ'ক। বড়দের প্রভাব দিয়ে কোনমতে যেন তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা না করা হয়। তাদের যেন বড়রা কোন নির্দ্দেশ না দেন এবং কোনভাবে বড়দের ইচ্ছা অনুযায়ী কোন কিছু শিখতে উৎসাহিত না করেন। শিক্ষার কোন প্রকার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকার দরকার নেই, মুক্ত কর্মচঞ্চল সুবিন্যস্ত মানবজীবনের বাইরে আর কোন লক্ষ্যের কথা স্বভাববাদ চিন্তা করে না। এখানে জ্ঞানার্জ্জন, শিক্ষার উদ্দেশ্য বলে একেবারেই গণ্য নয়। শুধুমাত্র জ্ঞানের জন্য জ্ঞানলাভের নীতি এঁরা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছেন।

প্রয়োগবাদ কিন্তু উদ্দেশ্যমুখী। শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারণে উদ্দেশ্যহীনতাকে খণ্ডন করে প্রয়োগবাদীরা শিক্ষার বিষয়বস্তু হিসাবে সেই সমস্ত বিষয়কে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করলেন যেগুলি জীবনের 'কাজে' লাগে। "কেজো" (practical) হওয়াটা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্তির মাপক হয়ে দাঁড়ায়। স্কুলে, এমন বিষয়বস্তু বা অভিজ্ঞতা ছেলেদের দেওয়া হবে যা ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনের কাজে লাগে। সুতরাং এসব পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর শুধুমাত্র সাম্প্রতিক মূল্য থাকলেই চলবে

না। তাদের ভবিষ্যতের প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্বও নিতে হবে। এই মত হল সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সাধারণ মানুষের মত। সমস্ত শিক্ষাবিদই একথা বলবেন যে স্কুলে যা পড়াশোনা শেখানো হবে তার যেন ভবিষ্যৎ মূল্য থাকে। এমন কি স্বয়ং অ্যারিষ্টটল এই মতে বিশ্বাসী, "ছেলেমেয়েদের এমন দরকারী বস্তু শেখানো প্রয়োজন যা সত্যিকার জীবনের কাজে আসে।"[১] বোর্ড অব এডুকেশনের হ্যাণ্ডবুক অব সাজেসনস্-এ সদস্যদের মত উদ্ধৃত করি, "পাঠক্রম সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে যে চিন্তা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে তা হচ্ছে এই যে আমাদের ছেলেমেয়েরা কতগুলি অভ্যাস কুশলতা আগ্রহের বিষয় যেন শেখে যাতে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেদের ও অপরের পক্ষে সুবিধা হয়।"[২] কাজেই সব স্বাভাবিকবুদ্ধির শিশুর তার নিজস্ব মাতৃভাষায়, কথন, পঠন ও লিখনের কুশলতা অর্জ্জন করতে হবে। তা ছাড়া গণনা ও মাপজোপের কুশলতা জানা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ও শরীরপালনের নিয়মাবলী শিক্ষা ও তার জন্য কতগুলি সাধারণ নির্দ্দেশ পাওয়া দরকার। বাস্তবিক, এই বিষয়গুলি এত গুরুত্বপূর্ণ যে পাঠক্রম হতে এগুলিকে বর্জন করার কথা অচিন্তনীয় কাজেই 'উপযোগিতা' বা ব্যবহারিক প্রয়োজনের নির্দেশ অনুযায়ী কতগুলি বিষয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের পাঠক্রমে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই বস্তুগুলি শেখা দৈনন্দিন জীবনে অপরিহার্য্য হবে। এগুলি জানা না থাকলে সাধারণ জীবনযাত্রা চালানো যায় না। প্রয়োজনীয়তার নির্দ্দেশে ইতিহাস আর ভূগোলকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা দরকার কেননা নাগরিক জীবন যাত্রার জন্য যেসব দৈনন্দিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য ইতিহাস ও ভূগোলের জ্ঞান ও বোধ না থাকলে চলে না। তা ছাড়া উচ্চাঙ্গের গণিত ও বিজ্ঞান জানা দরকার। কতটা বিশেষ জ্ঞান দরকার তা নির্ভর করবে ছাত্রদের নিজস্ব জীবন যাপনের ধারার ওপর (যেমন মেয়েদের জন্য গৃহবিজ্ঞান, কৃষিপ্রধান জায়গায় ছেলেদের জন্য কৃষিবিজ্ঞান ইত্যাদি।) পরের দিকে প্রয়োজনীয়তার মাপকাঠিতে কোন না কোন বৃত্তি শেখার আবশ্যকতা স্বীকৃত।

শিক্ষায় প্রয়োগবাদীরা যদিও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রথমেই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির কথা ভাবেন তবুও পাঠক্রমকে শুধুই সঙ্কীর্ণ বিষয়সম্বলিত করে দেখার

১। পলিটিক্স VIII 2 অ্যারিষ্টটল
২। হ্যাণ্ডবুক অব সাজেসনস্। পৃঃ ৩৭

কথা প্রয়োগবাদীরা বলেননি। তাঁদের মতে শিক্ষার লক্ষ্য, সমস্ত মনুষ্যজাতির প্রগতি। বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সেই প্রগতি দ্রুততর করার চেষ্টা করা হয়। সুতরাং তাঁরা স্বভাববাদীদের চেয়ে অনেকখানি অগ্রসর হয়ে বলেন যে বিদ্যালয়ে কি অভিজ্ঞতা দেওয়া হবে সেটা খুব চিন্তা করে পরিকল্পনা করা দরকার, কেননা এখানে প্রদত্ত শিক্ষার বিশেষ মূল্য আছে। তবে স্বভাববাদীদের সঙ্গে একমত হয়ে এঁরা একথাও বলেন শিশুর বর্ত্তমান আগ্রহ রুচি কর্মাবলী ও অভিজ্ঞতার ওপর পাঠক্রমের শিলান্যাস করতে হবে।

প্রয়োগবাদীদের মুখপাত্র ডিউই বিষয়বস্তু, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষকের চেয়ে শিশুকে অনেক বেশী মর্য্যাদা দেন। শিশু যদি সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা লাভ করতে থাকে তবে তার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির কাজ সুন্দরভাবে চলছে বলতে হবে। এ ধরনের প্রাণময় কর্মচাঞ্চল্য শৈশবের বিশিষ্ট লক্ষণ। সুতরাং শিশুকে সক্রিয় হওয়ার সুযোগ দেওয়া দরকার। তার বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতাও এ জাতীয় সক্রিয়তার উপর বিন্যস্ত হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের বিষয়ক্রম যদি তার সক্রিয়তা ও কর্মে আগ্রহের কথা মনে করে তৈরী করা হয় তবে প্রচলিত পাঠক্রম থেকে তা একেবারেই ভিন্ন হবে; এবং সেই আনন্দময় পাঠক্রমের পাঠ নিয়ে যারা বেড়ে উঠবে তারাও হবে আগ্রহী সতেজ শিশুর দল। এরা অভিজ্ঞতা লাভের জন্য উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আসবে। চিরাচরিত প্রথাবিশিষ্ট স্কুলে যে সব অনিচ্ছুক ছেলেমেয়েরা দ্বিধাকুণ্ঠিত পায়ে আসে এরা হবে তাদের চেয়ে একেবারেই আলাদা। এর কারণ হচ্ছে প্রথম দলের ওপর প্রচলিত স্কুলের নীরস বিষয়বস্তু জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু এদের তা নয়। বিচিত্র, কর্মবহুল অভিজ্ঞতায় এরা আগ্রহী বলে এদের শিক্ষা হবে সহজে। ডিউই প্রাচীন প্রথানুযায়ী শিক্ষার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ জানিয়ে বল্লেন 'শেখা' একটি সক্রিয় ক্রিয়া, এতো শুধুমাত্র নিষ্ক্রিয়ভাবে তথ্য সংগ্রহ মাত্র নয়। তিনি শিশুদের চারটি স্বাভাবিক আগ্রহের উল্লেখ করেন। "(১) কথা বলা অথবা মনোভাব আদান প্রদানের আগ্রহ (interest in conversation.) (২) অনুসন্ধানের আগ্রহ (inquiry) (৩) গঠন করবার আগ্রহ (construction) (৪) শিল্পকর্মে দক্ষতা প্রকাশের আগ্রহ (artistic expression)। এই আগ্রহগুলি যেন অব্যবহৃত স্বাভাবিক সম্পদ, খনিগর্ভের সোণা যা তুলে কাজে লাগানো হয়নি অলঙ্কার প্রস্তুতির বা বেচা কেনায়। কিন্তু এগুলি কাজে লাগানো হলেই শিশুর পরিপূর্ণ বৃদ্ধি সম্ভব হবে।"[১] পঠন, লিখন ও গণনার কাজে এই আগ্রহ-

১। ডিউই। দি স্কুল অ্যাণ্ড সোসাইটি পৃঃ ১৪৭

গুলির তৃপ্তি হচ্ছে, শিশুরা উপরিউক্ত কুশলতা আয়ত্ত করে তাদের মূল আগ্রহ চরিতার্থ করতে পারবে বলে। অবশ্য পঠন, লিখন, গণনার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য্য। "অতএব সমস্যা হচ্ছে প্রথমতঃ শিশুকে যথেষ্ট পরিমাণে আত্মপ্রকাশ, কথোপথন সংগঠন ও পরীক্ষণের অভিজ্ঞতার সুযোগ করে দেওয়া। দেখতে হবে যেন পুঁথিপুস্তক, ও অন্যের অভিজ্ঞতার দ্বারা শিক্ষার্থীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও অভিনবত্বকে একেবারে আচ্ছন্ন না করে ফেলা হয়। গতানুগতিক সামাজিক রীতিনীতি যদিও শিশুকে মেনে চলতে হয়, তবু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকলে সে বুদ্ধির সঙ্গে সেই সামাজিক রীতিনীতিগুলির সাহায্য নিতে পারবে। রীতিনীতির অন্ধ অবোধ দাসত্ব করবে না। এই সমস্যার সমাধান হলে তার ভাষাশিক্ষা, সাহিত্যপাঠ, গণনশিক্ষা শুধুমাত্র যান্ত্রিক অভ্যাসে পরিণত হবে না। সেগুলি হবে তার শক্তির উৎস। তাহলে সে বইপুস্তক ও পড়ালেখার চিরাচরিত আয়ুধ-গুলির যথাযথ ব্যবহার করতে পারবে।"[১]

তাই ডিউইর মতে পাঠক্রম হবে শিশুচিত্তের ও জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। শিক্ষার প্রতি স্তরে, সত্যিকার জীবন থেকে নানা কার্য্যাবলী দিয়ে পাঠক্রমকে বিস্তৃত করতে হবে। যে কর্মে শিশুর আন্তরিক আগ্রহ সেগুলিকে বেছে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। স্বভাববাদের এ রকম প্রয়োগ সকলের কাছেই গ্রহণযোগ্য। গৃহে যেখানে আদর্শ পরিবেশ আছে সেখানে শিশু বাড়ীর দৈনন্দিন কাজকর্মে যোগ দিয়েই স্বাভাবিক ভাবে ও নিশ্চিত উপায়ে সমস্তপ্রকার কুশলতা শিখতে পারে। "আদর্শ পরিবারের ঐ সব কাজকর্মগুলি আরেকটু বড় ও বেশী আয়তনে সুবিন্যস্ত করলেই আদর্শ বিদ্যালয় রচনা করা যায়।"[২] বাড়ী আর বিদ্যালয়ের মধ্যে পার্থক্য হল বাড়ীর কাজকর্ম সম্পূর্ণভাবে শিশুর প্রয়োজন ও আগ্রহ অনুযায়ী পরিকল্পিত হয়না। বিদ্যালয় কিন্তু একমাত্র শিশুর জন্যই সৃষ্ট। কাজেই বিদ্যালয়ে তার নিজের আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী কর্মাবলী বেছে আরো সুবিন্যস্ত করে সুসম্বদ্ধভাবে তাকে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।

ভাববাদীরা কিন্তু পাঠক্রম পরিকল্পনায় প্রথমে শিশুর আগ্রহ ও রুচি অনুযায়ী কর্মাবলীর কথা না ভেবে, চিন্তন বা নির্বস্তুক ধারণা বা ভাবগুলিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন। এঁরা মনে করেন শিক্ষার অন্তিম উদ্দেশ্য মনুষ্য-জাতির সমগ্র অভিজ্ঞতার স্বাদ শিশুকে দেওয়া। তাই স্কুলের পাঠক্রমের মধ্য

১। ডিউই। দি স্কুল অ্যাণ্ড সোসাইটি পৃঃ ১৪৭।
২। ডিউই পৃঃ ৩৬।

দিয়ে সেই সামগ্রিক অভিজ্ঞতার মূল ভাবগুলি শিশুকে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এঁদের দৃঢ় ধারণা শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত সভ্যতাকে প্রতিবিম্বিত করা। তাই শিক্ষাতে চেষ্টা করা হয় মনুষ্যজাতির সঞ্চিত অভিজ্ঞতার অন্ততঃ প্রতিনিধিত্বমূলক প্রধান ঘটনাগুলিকে শিশুর সামনে তুলে ধরার।

এ মতের যাঁরা সমর্থক তাঁদের প্রথম কাজ হবে মনুষ্যঅভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করা। মানুষের অভিজ্ঞতাকে দুভাগে ভাগ করা যায় (১) প্রাকৃতিক পরিবেশ, (২) মানব সমাজ। সেই সঙ্গে পাঠক্রমকেও দুভাগে ভাগ করা যায় (১) বিজ্ঞান (২) কলা বা মানব শাস্ত্র (Humanities)। এই দুইভাগকেও আবার ক্ষুদ্রতর ভাগ করে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়কে ঢোকানো চলে। বিষয়গুলিকে ভাগ করার আরেকটা উপায় হচ্ছে, অভিজ্ঞতাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত তিন ভাগের বিশ্লেষণ হতে। (ক) ইচ্ছা (conation) অনুযায়ী কর্মের অভিজ্ঞতা লাভ হবে এমন বিষয়সমষ্টি (খ) চিন্তনের অভিজ্ঞতা ও (গ) হৃদয় বা অনুভূতিগত অভিজ্ঞতা হবে এমন বিষয়সমষ্টি। মানুষ যা করে এবং করতে চায় এমন সমস্ত বিষয় ও অভিজ্ঞতা সংযোজিত করতে হবে। অর্থাৎ পাঠক্রমে এমন সমস্ত শিল্পকলা থাকা উচিত যা দিয়ে মানুষ তার অন্নবস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান করতে পারে। তার জন্য কিছু কিছু যন্ত্রের ব্যবহার ও সূক্ষ্ম শিল্প কলার চর্চা অবশ্যম্ভাবী। "রেনেসাঁর শিল্প মহৎ কেন না জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় হস্তশিল্পের উৎকর্ষ হতে তার জন্ম।"[১] পাঠক্রমে মনুষ্যজাতির এতদিনকার সঞ্চিত জ্ঞানও সংযোজিত হওয়া উচিত। তার প্রধান চিন্তনের বিষয়গুলি তার ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল এবং চিরাচরিত আবহমান কাল হতে উপস্থিত বৌদ্ধিক শিক্ষার বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। তেমনি অনুভূতির ক্ষেত্রে মানুষের যে সমস্ত প্রকাশ শিল্পে কাব্যে সঙ্গীতে হয়েছে, সেগুলিকেও বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা অবশ্য প্রয়োজন। সেগুলির মধ্য দিয়েই মানুষ তার মূল্যবোধকে প্রকাশ করেছে কাজেই এগুলিকে উপেক্ষা করা চলে না। ভাববাদী দার্শনিকোত্তম প্লেটো বলেছেন "যে শিক্ষা ঘৃণ্য বস্তু ও বিষয়কে ঘৃণা করতে শেখায় ও আদরণীয় বাঞ্ছনীয়কে বরণ করতে শেখায় তাই প্রকৃত শিক্ষা।"[২]

বেনটুরা ব্র্যানফোর্ড তাঁর ফানুস এ্যাণ্ড ভেষ্টা (Fanus & vesta) নামে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থে বলেন, 'স্কুল যেন এই পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রায়তন আদর্শ রূপ.

১। ডিউই। স্কুল এ্যাণ্ড সোসাইটি। পৃঃ ৭৭
২। প্লেটো। ল'স্। পৃঃ ৬৫৩

কিন্তু সাধারণ বাস্তবিক দৈনন্দিন পৃথিবীর রূপ নয়। বরঞ্চ সমস্ত বিশ্বমানবের অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের রূপ এতে বিধৃত।” মানুষের কার্য্যাবলীর তিনিও এক ত্রিবিধ বিশ্লেষণ করেন। মানুষ নিজে, মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হস্ত এই তিনের সম্মেলনে এক ; তেমনি সংস্কৃতির হাতিয়ারও হবে ত্রিবিধ—যেমন বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও ভাষা। এর মধ্যে সঙ্গীত ও সাহিত্যের সব শাখাকে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। মানুষ, প্রকৃতি মানবসমাজ ও অনান্য কারুকলা সম্বন্ধেও কৌতূহলী। সেই কৌতূহল মেটানোর জন্য পাঠক্রমে রাখতে হবে প্রকৃতিবিজ্ঞান, যাতে প্রকৃতিকে জানার আগ্রহ চরিতার্থ হয়। এ ভিন্ন নানা কারুশিল্প শেখানোর ব্যবস্থা থাকা দরকার কেননা মানুষ তাতেও আগ্রহী। মানবসমাজ বা অন্যান্য মানুষকে জানার কৌতূহল চরিতার্থ করার উপায় হল ভাষা। ভাষা দিয়েই মানুষ, অপরের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান করতে পারে। তাই ভাষা, স্কুলে শেখা প্রয়োজন। অতএব শিক্ষকদের মধ্যে থাকা দরকার প্রকৃতিবিজ্ঞানী, শিল্পী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের। অবশ্য এমন হতে পারে একজন শিক্ষক, একাধারে প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও মানবপ্রেমী, কিংবা শিল্পে পারদর্শী ও মানবপ্রেমী অথবা ভাষাশিক্ষণে পারদর্শী এবং জনপ্রেমী ইত্যাদি। তবে একটা জিনিষ লক্ষ্যনীয় যে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকেরও মানবপ্রেমী হওয়া প্রয়োজন কেননা তাহলেই তিনি ছাত্রদের পুরো মানসিকতা বিকশিত করতে পারবেন।

নান নিম্নলিখিত ভাবে অবস্থাটা বিশ্লেষণ করলেন “প্রয়োজনীয়” হওয়াটা পাঠক্রমের বিষয়বস্তুগুলির অন্তর্ভুক্তির পক্ষে বিশেষ জরুরী। ‘মনের অনুশীলন’ করানোর জন্য বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে কিনা, সে বিষয়ে বরঞ্চ বেশ সন্দেহ আছে। ফর্মাল ট্রেনিং বা ‘মানসিক শিক্ষা’র ভূতটিকে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলে তিনি বৌদ্ধিক শৃঙ্খলার মত সমর্থন করেন। আগের অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

“প্রতি সমাজের বিদ্যালয় তার জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ, যার বিশেষ কাজ হল সমাজের আধ্যাত্মিক শক্তিকে সঞ্জীবিত রাখা, ঐতিহাসিকপরম্পরা অবিচ্ছিন্ন রাখা, তার প্রাচীন গৌরব ও ঐশ্বর্য্যকে সজীব রাখা এবং তার ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করা। বিদ্যালয়ের মাধ্যমে সমাজের শিশুদের শেখানো হয়, কোন অতীত গৌরবের উৎস হতে তার বর্তমান কার্য্যাবলীর সূচনা। জাতির মহান সন্তানদের গৌরবগাথার কথা শুনে তারাও যাতে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে অনুপ্রাণিত হয়।

সেই সঙ্গে সামাজিক জীবনে যা কিছু গলদ তাও তাদের জানা দরকার। আত্ম-সমালোচনা দ্বারা নতুন ভাবে জাতির আদর্শের পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে বা শিশুদের উৎসাহকে ভিন্ন লক্ষ্য অনুযায়ী পরিচালিত করা যায়।"[১]

উপরোক্ত কারণের জন্য জাতির যে সব কর্মাবলী বিশ্বে বন্দিত ও মর্য্যাদাপূর্ণ সেগুলিকে নিশ্চিতভাবে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। নানের "অতীত গৌরব" পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার ঝোঁকে, ভাববাদের ছায়া সুস্পষ্ট। "যে সব মানবিক কর্মাবলী অন্তর্ভুক্ত করা দরকার তাদের দুভাগে ভাগ করা যায়, (এক) যে সব কর্মাবলী মানুষের ও সামাজিক ও ব্যক্তি-অস্তিত্বের মান সুরক্ষিত করবে, যেমন স্বাস্থ্যরক্ষা, শরীর চর্চা, ভদ্রতা নানাপ্রকার সামাজিক রীতিনীতি, নীতিবোধ, ধর্ম ইত্যাদি, (দুই) যে সব কার্য্যাবলী সৃষ্টিধর্মী যা দিয়ে সভ্যতার শক্ত বনেদ রচিত হয়েছে।"[২]

প্রথমোক্ত কর্মাবলীকে পাঠ্যবিষয় হিসাবে পড়ানো উচিত নয়, বরঞ্চ ছাত্ররা যাতে সেগুলি চর্চা করতে প্রত্যক্ষভাবে উৎসাহিত হয় তেমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার। সামাজিক রীতিনীতি ও সমাজচেতনা বিদ্যালয়ের একটি মাত্র পাঠ্য-বস্তু না হয়ে সমস্ত কার্য্যাবলীতেই পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকা দরকার। ধার্ম্মিক চেতনারও তেমনি সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকা উচিত। দ্বিতীয় দফার কর্মাবলীর দিকে নজর দেওয়া যাক্। বলা যেতে পারে, যে কোন সম্পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার পরিকল্পনায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকা প্রযোজন থাকা প্রয়োজন। যেমন (১) সাহিত্য অন্ততঃ মাতৃভূমির সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। (২) কিছু কিছু চারুকলা, বিশেষতঃ সমস্ত কলার মধ্যে জনপ্রিয়তম সঙ্গীত (৩) কারুশিল্প (তাঁতবোনা, মূর্ত্তিগড়া ইত্যাদি), কখনো সেই শিল্পের নান্দনিক সৌন্দর্য্য কখনো বা তার বৈজ্ঞানিক গঠনপ্রণালী, দুদিকেই শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। (৪) বিজ্ঞান, যার মধ্যে থাকবে অঙ্ক, যা সংখ্যা ও আকাশের বিজ্ঞান। ইতিহাস ও ভূগোল দুভাবে থাকা দরকার। ইতিহাস সাহিত্যের সঙ্গে ওতঃপ্রোতঃ ভাবে জড়িত কিন্তু ভূগোল বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্বন্ধিত। তা ছাড়া, সামাজিক মানুষের জীবন, তাদের ভাবের আদান প্রদান পাঠক্রমের কেন্দ্র-বিষয় (core subject) হওয়া উচিত। সেজন্য ইতিহাস ও ভূগোলের বিশিষ্ট স্থান আছে।"[৩]

১। নান—এড্‌কেশন, ইট্‌স্‌ ডাটা এ্যাণ্ড ফার্ষ্ট প্রিন্সিপল্‌স্‌। পৃঃ ২৩৩
২। " " " " " " " পৃঃ ২৪২
৩। " " " " " " " পৃঃ ২৪৩।

দেখা যায় নানের 'সৃষ্টিধর্মী কর্মাবলী'র সঙ্গে ব্র্যানফোর্ডের সাহিত্যকর্ম, হস্তশিল্প ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের মিল আছে।

পড়ানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে, নান বলেন, "স্কুলকে কতগুলি বিষয় শেখাবার জায়গা না বলে কতগুলি কর্মের দ্বারা শৃঙ্খলা মানবার ও অভ্যাস আয়ত্ত করার জায়গা বলা উচিত।"[১]

ইংল্যাণ্ডের বোর্ড অব এডুকেশন একই মত সমর্থন করে বলেন পাঠক্রমকে কতগুলি বিষয় শিক্ষা করার বা তথ্য সংগ্রহ করার যন্ত্র হিসাবে না ভেবে কতগুলি অভিজ্ঞতা বা কর্মাবলীর উপায় বলা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় অঙ্ক কতগুলি সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া করার জাদুবিদ্যা মাত্র নয় বরঞ্চ একটা বিশেষ ভঙ্গীতে চিন্তা ও কাজ করার ক্ষমতা ও পৃথিবীকে একটা বিশেষ চোখে দেখার বিদ্যা। যেমনভাবে নিউটন, আর্কিমিডিস বা অন্যান্য গাণিতিকরা পৃথিবীকে দেখেছেন সেটা একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, এবং শিক্ষণীয়ও বটে। তাই ছাত্রদের আমরা যে শুধুমাত্র গাণিতিক তথ্য শেখাব তা নয় তাদের গাণিতিক ধরনে চিন্তা করা শেখাব। অঙ্ক সম্বন্ধে যা বলা হল অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। পাঠ্যবিষয়গুলি হবে ছাত্রদের সৃষ্টিধর্মী আগ্রহ ও উৎসাহকে মুক্তি দেবার পথ। আরেকটু বিশদ করি। স্কটিশ ভাষায় কবিদের বলা হত স্রষ্টা (Makir বা Maker)। শুধুমাত্র কবিতাতে নয়, সাহিত্যের সব বিভাগে, অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস ও অন্যান্য স্কুলের কাজে ছাত্র হবে স্রষ্টা ও কর্মকর্তা। সে শুধুমাত্র বাধ্য ছাত্র হয়ে কতগুলি তথ্য মুখস্থ করবে এটা ঠিক নয়। তার নিজের আত্মউন্মোচনের কাজে সে উৎসাহের সঙ্গে ব্রতী হবে। পাঠক্রমের মধ্য দিয়ে আবিষ্কারের আনন্দ ও সৃষ্টিধর্মী কর্মের উদ্দীপনা পাবে, এটাই উচিত।

প্রয়োগবাদী ডিউইর মতো নান্ বল্লেন, সভ্যতার যা কিছু প্রয়োজনীয় মূল্যবান অঙ্গ সেগুলিকে পাঠক্রমে রাখতে হবে। প্রয়োগবাদ ও স্বভাববাদ, দুইয়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের দরুণ পাঠক্রমও দুপ্রকার হবার সম্ভাবনা, কিন্তু সক্রিয় ও কর্মপূর্ণ পাঠক্রম রাখার ব্যাপারে এঁরা দুজনে সহমত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ডিউই বলেন "শিশুদের মন অনেকটা আদিম অসভ্য লোকদের মত। তারা নিজেদের আগ্রহ অনুযায়ী কাজ শিখতে চায়, জীবনের সঙ্গে যেই কাজ যুক্ত সেই কাজ শিখতে তাদের আগ্রহ সমধিক।"[২] নানও বলেন প্রাথমিক শিক্ষা হবে অনেকটা

১। নান। এডুকেশন ইট্স ডাটা অ্যাণ্ড ফার্স্ট প্রিন্সিপল্স। পৃঃ ২৪২।

২। ডিউই। দি স্কুল অ্যাণ্ড সোসাইটি। পৃঃ ৪৩।

আদিম মানবকদের মত কাজেই দেখা যায় এই দু দলের মধ্যে মতের গভীর অমিল নেই। তবে স্বভাববাদীরা পাঠক্রম রচনা করতে শুরু করেন শিশুর ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে, প্রয়োগবাদীরা পাঠক্রমের বিষয় বেছে নেন সমগ্র সভ্যতার সুসমন্বিত কার্য্যাবলীর থেকে, এইটুকু তফাৎ। প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এখানে মূলতঃ আদর্শবাদী ও (ভাববাদী)।

দু'দলই কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়তা, অদরকারী পাঠক্রমের আধিপত্য বা শুধুমাত্র বই পড়া বিদ্যার বিপক্ষে। আমরা দেখতে পাই ডিউইর প্রয়োগবাদ, শিশুর নিজস্ব আগ্রহকে মর্য্যাদা দিয়ে এবং পাঠক্রমকে বৃথা কতগুলি পৃথক্ পৃথক্ বিষয়ে টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য পাঠক্রম তৈরীর পথ করে দিয়েছে। তার ফলে সমস্ত শিক্ষা নামে প্রক্রিয়াটিকে সুসম্বন্ধিত ও পাঠক্রমকে সুবিন্যস্ত করা গেছে। সুসমন্বিত করার মূল কর্তা শিশু নিজে. তার আগ্রহ। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগবাদ ও স্বভাববাদের একটা দুর্বল অঙ্গ হচ্ছে দুটিই কিছুটা লক্ষ্যহীন। শিশুদের শৈশব ছাড়িয়ে বয়স্ক অবস্থা আসবে। বস্তুতঃ প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার জন্য তাদের শিক্ষা দেওয়া দরকার কাজেই শিশুর শৈশবের কর্মাবলী শিক্ষার শেষ কথা হতে পারে না।

নানের আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্য আদর্শের সন্ধান দেয়। তিনি পাঠক্রমের মধ্যে যে সব কর্মাবলীর নির্দেশ দিয়েছেন তা প্রয়োগবাদী ও স্বভাববাদী দুজনদেরই গ্রহণযোগ্য। তার ওপর নানের দেওয়া পাঠক্রমে রয়েছে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের হদিশ। যদি শিশুর আগ্রহ কোন মতে কমে যায় তাহলেও পাঠক্রমের মধ্যে কিছু মূল্যবান লক্ষ্য থাকবে যার জন্য পাঠক্রমকে চালু রাখা সঙ্গত হবে।

আগেই বলেছি শিক্ষায় অনর্থক কতগুলি বিষয়ের অথবা প্রাণহীন যান্ত্রিক কলাকৌশল শেখানো নিতান্ত সময় ও শক্তির অপচয়। তার প্রাদুর্ভাব থেকে পাঠক্রমকে কেমন করে মুক্ত রাখা যায়? প্রথম দিকে অবশ্য শিশুর আগ্রহ, তার রুচিমত কার্য্যাবলী পাঠক্রমে জায়গা পাবে কিন্তু পরে ক্রমে ক্রমে সে কতগুলি নিয়মনীতি (formal instruction) ইত্যাদি শেখার প্রয়োজন অনুভব করবে। যেমন অঙ্ক বা পঠনের দক্ষতা শেখানো নিশ্চিতভাবে স্কুলের দায়িত্ব হওয়া উচিত। স্কুল তার জন্য জাতির সঞ্চিত বিদ্যা, জ্ঞান ও কুশলতা কিছুটা সরলীকৃত করে দেবে। সেই সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সেইসব জ্ঞান তাকে দেওয়া হবে, যা তার ভবিষ্যৎ জীবনের কাজে লাগবে।

যতই স্বাভাবিক আগ্রহ ও উৎসাহ হতে উৎসারিত কর্মাবলীর ওপর ঝোঁক

দেওয়া হ'ক, শিক্ষকের কর্ত্তব্য হবে সমগ্র মানবজাতির অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে দেখা যে কোন বিশেষ অভিজ্ঞতা শিশুকে দেওয়া একান্ত আবশ্যক। সেজন্য পাঠক্রমে কিছু কিছু আলাদা কার্য্যাবলী রাখতে হবে। সেগুলিকে একসঙ্গে সমন্বিত করা সম্ভব নাও হতে পারে, কিন্তু যে সব বিষয় বা ক্রিয়া পাঠক্রমের মধ্যে রাখা হবে তা অবশ্যই উদ্দেশ্যমুখী হবে। শিশু কোন কিছু শেখার আগে যেন এই কথাটি বুঝতে পারে যে সে যা শিখতে যাচ্ছে সেই কুশলতা বা বিষয় শেখা তার পক্ষে জরুরী। বিচক্ষণ শিক্ষক তাই এমন সমস্যা ছাত্রদের সামনে রাখবেন যেগুলি তারা পড়তে না জানলে বা অঙ্ক করতে না শিখলে, সমাধান করতে পারবে না। এমন পরিস্থিতিতে ঐসব কুশলতা অর্জনে শিশুদের আগ্রহ হবে। শুধু একটি বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষকের অবহিত হওয়া দরকার। তাঁরা যেন এমন ধারণার শিকার না হন যে শিক্ষা হচ্ছে ছাত্রদের অবোধ্য এক অতি দীর্ঘ প্রক্রিয়া যেখানে ছাত্ররা না বুঝে শুধু শিক্ষকের নির্দ্দেশ মত কতগুলি বিষয় ও কৌশল শিখে নেয়।

যে সব শিক্ষকরা সাধারণ মেধার ছাত্রদের পড়ান তাঁরা নানের উচ্চাদর্শের কথা শুনে (অর্থাৎ পাঠক্রমের বিস্তৃত সর্ব্বব্যাপী কার্য্যাবলীর বিবরণে) হতাশ ভাবে বলবেন যে নানের পরিকল্পনা সুন্দর বটে কিন্তু অসম্ভব। মানবজাতির সকল কীর্ত্তি পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার মহৎ আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। বিশেষ করে সাধারণ বুদ্ধির ছাত্রদের পক্ষে মানবসভ্যতার সমস্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে আয়ত্ত করা অসম্ভব। বরঞ্চ ডিউইর প্রয়োগবাদী পাঠক্রম সম্ভবপর। স্পেন্স রিপোর্টের কারুকাররা কিন্তু মনে করেন নানের আদর্শবাদী পাঠক্রম রাখা সবটকু না হলেও অংশতঃ পাঠক্রমে রাখা যায়। যে সমস্ত উচ্চতম আদর্শের উল্লেখ আছে তার খানিকটা কাছাকাছি হওয়াই বা মন্দ কি? যদি কারো বিশেষ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য উৎসাহ থাকে এবং সে যদি সৃষ্টিধর্ম্মী হয় তবে নিষ্প্রাণ যান্ত্রিকভাবে, অনর্থক বাহুল্য বিষয় না শিখে শুধুমাত্র সেই বিষয়ের পঠন পাঠনের ব্যবস্থা থাকতে পারে। যদি কোন মানুষই খণ্ড বিষয়ের আংশিক জ্ঞান ভিন্ন পূর্ণ জ্ঞান অর্জ্জন করতে না পারে, অন্ততঃ সেই বিষয়ের দৃষ্টিভঙ্গি (যেমন গাণিতিক বা বৈজ্ঞানিক) তো অর্জ্জন করতে পারবে। অবশ্য খুব অনুকূল পরিবেশেও নান-প্রদত্ত পাঠক্রমের লক্ষ্যগুলির পূর্ত্তির জন্য ধাপে ধাপে প্রগতির প্রয়োজন।

কি কি ধাপে পাঠক্রমকে বিভক্ত করা যেতে পারে তার কিছুটা আলোচনা করা যাক্। হোয়াইটহেড বলেন, "জ্ঞান লাভের ত্রিপদী ছন্দ আছে, যেমন

কল্পনা (romance), নিখুঁৎ জ্ঞান (precision) ও সামান্যী-করণ (generalisation)। যে কোন বৌদ্ধিক শিক্ষা এই ছন্দেই শিখতে হবে।...প্রথম স্তরে শিক্ষার্থীর জানা সম্পূর্ণ হয়নি, সে কিছুটা জানা কিছু না জানার অস্পষ্টভাবের ও কল্পনাকুহেলীর অবস্থায় আছে। সেই কল্পনা ও বিস্ময়ের সমাপ্তিতে নিখুঁৎ জ্ঞানের জন্ম হয়। এখন সম্পূর্ণ সঠিকভাবে সমস্ত তথ্য জানার আগ্রহ, কুশলতাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার কাল। শেষ দফায়; কৈশোর কালে সামান্যীকরণের ঝোঁক আসে। এখন বিশেষ হতে, সাধারণ সূত্র আবিষ্কৃত হয়। পূর্ণ কৈশোরকালে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা সামান্যীকরণের জন্য আগ্রহান্বিত হয়।"[১]

জাতি বা ব্যক্তি দুয়ের মধ্যেই আমরা দেখি এই ত্রিমুখী জানার ছন্দ। বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে একথা সত্য। প্রথমে বিজ্ঞানের বিষয় থাকে শুধু বিস্ময় ও জল্পনা। তারপরে ধীরে ধীরে সঠিক জ্ঞান মানুষের মনে জাগে। এই বিশ্বকে বোঝবার জন্য বিস্ময় ভিন্ন নিখুঁৎ জ্ঞানের প্রয়োজন থেকে জ্ঞান লাভ। প্রতিটি তথ্য তখন আরো ভাল করে লোকে পর্য্যবেক্ষণ করে। যখন সমস্ত তথ্য জানা হয়ে যায় তখন লোকে সামান্যের বা সাধারণ সূত্রের সন্ধান করে।

নান স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে হোয়াইটহেডের ত্রিপদী ছন্দের মতো জ্ঞানের ত্রিতল স্তরের উল্লেখ করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে বিস্ময়, উপযোগিতা, শৃঙ্খলাবদ্ধ সমন্বয়ের উল্লেখ করেন। তিনি যাকে বিস্ময় (wonder) বলেন তাকে হোয়াইটহেড বলেছেন কল্পনা (romance), তাঁর শৃঙ্খলাবদ্ধ সমন্বয় (system)কে সামান্যীকরণও বলা যায়। উপযোগিতা (utility) ও নিখুঁৎ জ্ঞান (precision)ও বোধহয় এক ও অভিন্ন। উপযোগিতা বল্লে বোঝা যায় মানুষের সেগুলি দেখার জন্য আগ্রহ (interest) আছে। আগ্রহ থাকার দরুণই নিখুঁৎ জ্ঞান অর্জ্জনের উৎসাহ হয়।

শিক্ষার নানা রকম পদ্ধতির মধ্যে, যথা হার্ব্বার্ট প্রদত্ত পঞ্চপদী শিক্ষার সোপান অথবা ডিউইর শিশুর নিজের আবিষ্কার করে শেখা ইত্যাদির চেয়ে এই ত্রিপদী ছন্দটিই সবচেয়ে বেশী গ্রহণযোগ্য মনে হয়। বিস্ময় ও কল্পনা, নিখুঁৎ জ্ঞানের স্তরে এসেও থামে না। বিশেষের থেকে সামান্যের দিকে অগ্রসর হয়। কেননা তেমন সামান্য (generalised) জ্ঞানের সাহায্যেই মানুষ তার পরিবেশের

১। হোয়াইট হেড। দি রিদম্ অব এড্‌কেশন অ্যাণ্ড দ্য রিদমিক্ ক্লেমস্ অব ফ্রিডম অ্যাণ্ড ডিসিপ্লিন।

উপর কর্তৃত্ব করতে পারে। তাই ইতিহাস মানুষের গল্পকাহিনী দিয়ে আরম্ভ হবে, তারপর অগ্রসর হবে নিখুঁৎ তথ্যের দিকে—সত্যি কি ঘটেছিল তার বর্ণনাতে। তারপরে আসবে সেই অতীত ঘটনা থেকে ভবিষ্যৎকে বোঝবার চেষ্টা। মানুষের জগতে কি ঘটেছিল এবং সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যাবে সাধারণ মানুষের চরিত্র। 'অবাক করা' জটিল বর্তমান জগৎকে পরিস্কার পটভূমিকায় দেখা যাবে।

এই ত্রিপদী ছন্দকে স্বীকার করে নিলে আমরা প্রথমেই অপরিণত শিক্ষার্থীদের সামান্যীকরণের জ্ঞান দেবনা। কেননা সে জ্ঞান তাদের পক্ষে গ্রহণ করাও কঠিন। সব ছেলেমেয়েদের সামান্যীকরণ বা সমন্বয় করবার ক্ষমতাও নেই। কিন্তু সমস্ত পাঠক্রমের গোড়ার কথা হবে রহস্য ও বিস্ময়। কিন্তু সুসম্বন্ধিত সামান্যের জ্ঞান হবে মেধাবী ও ধী-সম্পন্ন (intellectual) ছেলেমেয়েদের প্রাপ্য।

অতিরিক্ত পাঠসূচী

ব্র্যানফোর্ড।	ফানুস অ্যাণ্ড ভেস্টা। নবম অধ্যায়।
বোড অব এডুকেশন।	হ্যাণ্ডবুক অব সাজেসন্‌স্‌। সপ্তম অধ্যায়।
স্পেন্স রিপোর্ট।	প্রথম, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ অধ্যায়।
হ্যাডাও রিপোর্ট।	চতুর্থ অধ্যায়
দ্য প্রাইমারী স্কুল।	সপ্তম অধ্যায়।
ডেভিস্‌।	দি ম্যাটার এ্যাণ্ড মেথড অব মডার্ণ টিচিং।
ডিউই।	দি স্কুল অ্যাণ্ড সোসাইটি।
ফিণ্ডলে।	দি ফাউণ্ডেশনস্‌ অব এডুকেশন ভল্যুম II। দ্বিতীয় অধ্যায়।
কিটিং।	ষ্টাডিজ ইন এডুকেশন। ষষ্ঠ অধ্যায়।
নান।	এডুকেশন ইট্‌স ডাটা এ্যাণ্ড ফার্ষ্ট প্রিন্সিপ্‌ল্‌স। পঞ্চদশ অধ্যায়।
রেমণ্ট।	মডার্ন এডুকেশন ইট্‌স্‌ এইম্‌স্‌ এ্যাণ্ড মেথডস্‌। ষষ্ঠ অধ্যায়, সপ্তম অধ্যায়।

ওয়াট্‌স্‌।	এডুকেশন ফর সেল্‌ফ রিয়ালাইজেসন এ্যাণ্ড সোস্তাল সারভিস। পার্ট থ্রি। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়।
হুইলার।	ক্রিয়েটিভ এডুকেশন এ্যাণ্ড দি ফিউচর। সপ্তদশ এবং ঊনবিংশ অধ্যায়।
হোয়াইট হেড।	দ্য এইম্‌স্‌ অব এডুকেশন।

দশম অধ্যায়

শিক্ষায় বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ

দর্শনের আলোচনা অধ্যায়ে আগেই বলা হয়েছে যে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল প্রতিজ্ঞা হচ্ছে, আমাদের প্রত্যক্ষণের বস্তুময় এক প্রকৃত জগৎ আছে। এই দর্শনের সমান্তরালে শিক্ষায় বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের এক ধারা প্রবাহিনী। স্বভাববাদ যেমন 'অস্বাভাবিক' শিক্ষারীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি পাঠক্রমে বিষয়বস্তুর অতিরিক্ত শুষ্কতা, সূক্ষ্ম কথার চাতুরী, অন্তঃসারশূন্য বাঙ্ময়তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসাবে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের আবির্ভাব। শিক্ষার ইতিহাসের মাঝে মাঝেই শিক্ষকরা বাঙ্ময় কথার কারাগার হতে বস্তুময় জগতে এসে মুক্তির সন্ধান পেয়েছেন। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের অভ্যুদয় তাই হয়েছে নানা সময়ে। শিক্ষাতেও বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ মাঝে মাঝেই আধিপত্য করেছে। দুয়েকটি উদাহরণ দিই। রেনেসাঁ (নব জাগরণের) কালের উদ্দীপনা ম্লান হয়ে এলে, সে সময়ে উচ্চাঙ্গ সাহিত্য রচনা ও আলোচনার যে সোৎসাহ জোয়ার এসেছিল তাতে ভাঁটা পড়ে। সাহিত্য আলোচনা যখন ব্যাকরণের সূক্ষ্মবিচার ও নিতান্ত শুষ্ক পাণ্ডিত্যে পর্য্যবসিত, শিক্ষাতত্ত্বে তখন 'বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদে'র বন্যার জল ঢুকে পড়ে। তবে শিক্ষার পদ্ধতি হিসাবে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ তখনও গ্রাহ্য হয়নি। "সামাজিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা (Social realists) সাহিত্যের বিষয় হিসাবে ব্যাকরণের আলোচনার পরিবর্ত্তে মানুষের সুখদুঃখ নিয়ে আলোচনাতে মনোযোগ দিলেন। শিক্ষা তখনো, বিলাসী, উচ্চকোটির লোকদের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সীমাবদ্ধ। তাঁদের জন্য পাঠক্রমের মধ্যে 'ভ্রমণ' ঢোকানো হল। অর্থাৎ স্বীকার করা হল যে শুধু পুঁথিপাঠ নয়, শিক্ষার্থীদের বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকা উচিত। ইন্দ্রিয়বাদী বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ (sense realism) সপ্তদশ শতকের বিজ্ঞান-অনুরাগের ফলে উদ্ভূত। এই বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের মূল স্বীকার্য্য হল, সমস্ত জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা লব্ধ। যা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ নয় তাকে ধারণা করা যায় না। কাজেই শিক্ষার মূল কথা হল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ দ্বারা জ্ঞান লাভ হবে। অতএব প্রাচীন সাহিত্য ও ব্যাকরণের আলোচনা ছেড়ে বিজ্ঞানের আলোচনা (যেখানে প্রত্যক্ষ

বস্তু বিষয়ে আলোচনা আছে), পাঠক্রমের কেন্দ্রবিন্দু করতে বল্লেন। এবং সকল 'বস্তু' 'আরোহ' পদ্ধতিতে (inductive) জানতে চাইলেন।

এ ধরণের বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ, যেখানে বিজ্ঞানের ওপর পুরোপুরি ঝোঁক দেওয়া হচ্ছে, তা হল উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষ যুগলক্ষণ। এই যুগে বিজ্ঞানের দিগন্তের নব উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের এই দাবী নিতান্ত যুক্তিসঙ্গত মনে হল যে শুধুমাত্র বিজ্ঞান পাঠ দিয়েই জীবনের সর্ব্বোচ্চ উন্নতি হতে পারে। অতএব হার্ব্বার্ট স্পেন্সার আর টমাস হাক্সলী বিজ্ঞান পাঠের স্তুতিতে মুখর হলেন। স্পেন্সারের বিখ্যাত জিজ্ঞাসা হল "কোন জ্ঞান সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ?" তিনি নিজেই সে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বল্লেন, "বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় পাঠ, সাহিত্যবিষয়ক পাঠের চেয়ে অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। নৈতিক, বৌদ্ধিক অথবা ধর্ম্মীয় যে কোন শিক্ষার অপেক্ষা উপস্থিত পরিবেশের শিক্ষা বিশেষ মূল্যবান।"[১] স্পেন্সারের সমসাময়িক আরেকজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হাক্সলী সমস্ত স্কুলে 'বুদ্ধি উদ্গমের উষা' হতেই 'সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত' বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য বহুবার বলেছেন। এই সতেজমনা চিন্তাবিদ্, মানুষ ও বস্তু প্রকৃতপক্ষে যেরকম, এবং যেমনভাবে আমরা তাদের প্রত্যক্ষ করি ঠিক তেমনভাবে তাদের বুঝতে চেষ্টা করার কথা বলেন। সুস্থ বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের একজন প্রতিনিধি হিসাবে হাক্সলী অগ্রগণ্য।

উগ্র বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ, যে কোন প্রকার বইয়ের মূল্য সম্বন্ধে সন্দিহান। তাঁদের প্রধান শ্লোগান হল "বাক্য নয় বস্তু" (Things rather than words), বইয়ের বিরুদ্ধে এই জেহাদ খুব বেশীদূর পর্য্যন্ত স্বীকার করে নেওয়া মুস্কিল। অবশ্য অতিমাত্রায় নির্বস্তুক কথার নিস্ফলতা সম্বন্ধে আমরা সকলেই বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের সঙ্গে কিছুটা একমত। বাক্য বা লিপি, বস্তুরই সাংকেতিক (Symbolic) নাম। ভাষার সাহায্য ব্যতীত চিন্তার প্রসার হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ভাষাকে শিক্ষার ক্ষেত্র হতে নির্ব্বাসন দেওয়া নির্বুদ্ধিতা। ভাষা, বস্তুকে বোঝার সহজ রাস্তা। ভাষা না থাকলে সত্যকার বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করা বেশ অসুবিধা জনক। এই কারণেই প্রাচীনকালে লোকরা দ্রব্যের বিনিময়ে মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন। তা ভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে এমন কোন বিভাজন নেই যে কিছু কিছু বিষয় শুধু বস্তু ও পদার্থের সাহায্যে জানতে পারা যাবে এবং কিছু কিছু বিষয় শুধুমাত্র ভাষা ও ব্যাখ্যা দিয়ে জানা যাবে। তবে কোন কোন বিষয় ভাষা ও ব্যাখ্যা দিয়ে ভাল করে বোঝানো যায় আর, কিছু কিছু বিষয় ভাষার সঙ্গে বস্তুর

১। স্পেন্সার। এসেজ অন এডুকেশন। পৃঃ ৪২।

ব্যবহার হলে আরম্ভ করতে সুবিধা হয়। কিন্তু প্রথমটির ক্ষেত্রেও ভাষার সঙ্গে বাস্তবজগৎ ও বস্তুর সঙ্গে ভাষার কিছুটা যোগ হলে ভাল হয়, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেও তেমনি ভাষার সঙ্গে দ্রব্যের প্রয়োগ হওয়া দরকার। 'বাক্যপ্রধান বিষয়' ও 'বস্তুপ্রধান বিষয়ের' মধ্যে তফাৎ বাস্তবিক তত উগ্র নয়। এরা পরস্পরের বিপরীত নয়, পরস্পরের পূরক। বস্তুপ্রধান বিষয়ও কোন কোন সময়ে শব্দজালে আচ্ছন্ন হতে পারে।

বর্ত্তমানে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের কি অবস্থা? 'সর্ব্বজনীন শিক্ষা' (universal education)র প্রবর্তনের পর পাঠক্রমকে নানাভাবে উন্নীত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও নতুনভাবে আবার সম্প্রতি বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা সোচ্চার হয়েছেন। স্পেন্স রিপোর্টে প্রচলিত স্কুলের পড়াশোনা ও পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। তা ব্যতীত বহু শিক্ষাবিদ্ ও বিশেষজ্ঞরা সাম্প্রতিক (ইংল্যাণ্ডের) শিক্ষাব্যবস্থার কথা আলোচনা ও অনুধাবন করে বলেছেন। "১১ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি ইংল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সে প্রচলিত, তার সঙ্গে আধুনিক সমাজের কাঠামোর সঙ্গে বা অর্থনৈতিক তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতি নেই।"[১] এঁরা, নিজেদের বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, শিক্ষার পরিচালনা ও প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের স্পষ্ট নির্দ্দেশ দেন।

বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের মত অনুযায়ী নতুনভাবে শিক্ষাসংস্কারের কথা উঠেছে। শিক্ষার ইতিহাসের নানা অধ্যায়ে বস্তুতান্ত্রিকদের মত পূর্ণঘোষিত? সাম্প্রতিক কালেও বিদ্যালয়কক্ষের পড়া আর বিদ্যালয়-বহির্ভূত জীবনের মধ্যে যে ভেদ সূচিত তার বিরুদ্ধে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের পক্ষ হতে প্রতিবাদ বাণী সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাদপ্তরের অধিকারীদের, সাধারণভাবে, যে সব কার্য্যাবলী, ক্রিয়াপদ্ধতি, পুঁথিপত্রে সাজিয়ে লেখা যায়না তাদের প্রতি একটা স্বাভাবিক সন্দেহ ও বীতস্পৃহা আছে। বরঞ্চ তাঁরা পুঁথিপুস্তকে লিপিবদ্ধ অর্দ্ধপক্ক জ্ঞানলাভ, এবং পঠন পাঠনের পর পরীক্ষাতে তার উদ্গীরণ ইত্যাদিকে বেশীমূল্য দিয়ে থাকেন। বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে বস্তুবাদীদের কথায় কর্ণপাত করা উচিত হবে বলেই মনে হয়। অবশ্য কিছু কিছু প্রাচীন স্কুল পাঠ্য-বিষয়ের মূল্য এবং কোন কোন অবস্থায় গতানুগতিক পুঁথিগত শিক্ষার সাফল্য অনস্বীকার্য্য।

'ইতিহাস' পড়ার মূল্য অবশ্যই আছে, কেননা তা হলেই বর্তমান ঘটনা-

১। স্পেন্স রিপোর্ট XXII

বলীকে প্রাক্তন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায়। নাগরিক বিদ্যা (civics) শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বিদ্যালয়গুলিকে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা বলবেন সমাজসেবার কার্য্যকরী শিক্ষাদেবার জরুরী প্রতিষ্ঠান। কোন ইতিহাস বিশেষজ্ঞ যদি এতে আপত্তি তুলে বলেন যে এটা খাঁটি ইতিহাস নয় তবে তাঁকে বোঝানো দরকার যে শিক্ষার্থী জীবনের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য 'খাঁটি ইতিহাসে'র অপেক্ষা যে বিদ্যা (নাগরিক বিদ্যা) তার বর্ত্তমান জীবনকে ঐশ্বর্য্যময় করতে পারবে, তার মূল্য অনেক বেশী। ঠিক একইভাবে, অঙ্ক শেখার উদ্দেশ্য হবে, শিক্ষার্থী যাতে আঙ্কিক নিয়মগুলি বুঝতে পারে, স্থানের আয়তন ইত্যাদি পরিমাপ করতে পারে, সেইটি। জটিল সাংকেতিক সংখ্যা, সূত্র ইত্যাদি দিয়ে বৃহৎ অঙ্ক কষে অন্য লোকদের চমৎকৃত করার উদ্দেশ্যে অঙ্ক শেখানো হয় না। এর দ্বারা শিক্ষার্থী বুদ্ধি দিয়ে, জগতের নানা গাণিতিক ও সংখ্যাগত দিক বুঝতে শিখবে। আবার সাহিত্য, যাকে "জীবনের সমালোচনা" বলে অভিহিত করা হয়, তাকে সত্যিকার 'জীবনের আলোচনা' হতে হলে, যে সাহিত্যে শিক্ষার্থীর বর্তমান জীবনের সুখ দুঃখ সমস্যা প্রতিফলিত তেমন সমসাময়িক সাহিত্য পড়ানো প্রয়োজন। সাহিত্য অতীতে লিখিত পরিসমাপ্ত কাহিনী নয় জীবনের তাপে স্পন্দিত, প্রাণবস্ত বিষয়। বিশেষ করে এযুগে যখন প্রকাশিত পুস্তকের ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যার দরুণ, তরুন পাঠকরা এই অজস্র সাহিত্যবন্যাতে অভিভূত না হয়ে যাতে বুদ্ধির সঙ্গে নির্বাচন করে সৎ উদ্দেশ্যে বই পড়তে শেখেন, তেমন শিক্ষা দেওয়া উচিত।

অন্য যে কোন স্কুলপাঠ্যের মত বিজ্ঞানও অবৈজ্ঞানিক ভাষার জটিলতায় অবোধ্য হতে পারে। অধিকাংশ সময়েই বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা করতে এমন যান্ত্রিক-ভাবে শেখানো হয় যে শিক্ষার্থী তার নিজের জীবনের সঙ্গে,এইসব নিরীক্ষার কোন সংস্রব খুঁজে পায় না। বিজ্ঞান শেখানোর সময় প্রথম সেই উপযোগের দিকটি স্পষ্ট করে পরে সাধারণ সূত্রের দিকে গেলে, শিক্ষণ জীবনানুগ ও অর্থপূর্ণ হয়। তার পরিবর্ত্তে শিক্ষকেরা বিপরীত দিক হতে পড়াতে আরম্ভ করেন। আরো দুঃখের ও চিন্তার বিষয় এই যে বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিজ্ঞান বহুক্ষেত্রেই আধুনিক বিজ্ঞানের প্রগতি ও নবতম উদ্ভাবন হতে সম্পর্কচ্যুত। শিক্ষার্থীরা উচ্চশ্রেণীর বিজ্ঞানের তত্ত্ব ভাল করে শিখেও বাস্তব বিজ্ঞান বিষয়ে রয়ে যাচ্ছে একেবারে অজ্ঞ। বিজ্ঞানে আজকাল জ্ঞানের যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তার রেশমাত্র বিদ্যালয়ে দেখা যায় না। অবশ্য এ অবস্থার প্রতিকার করা সম্ভব। অণুপরমাণু, আপেক্ষিকবাদ ও নব্যবিজ্ঞানের অন্যান্য তথ্য সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করা যায়। বিজ্ঞানের

সার্থক শিক্ষক, প্রয়োজন হলে বিজ্ঞান বিষয়ে সহজবোধ্য বক্তৃতা দিতে ও ব্যাখ্যা করতে পশ্চাৎপদ হবেন না। বিশেষতঃ যে সমস্ত অভিজ্ঞ পারদর্শী শিক্ষকরা বিষয়টি বোঝেন এবং কিশোর মনঃস্তত্ত্বের জ্ঞান যাদের আছে, তাঁরা প্রকৃতই মনোগ্রাহী বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারবেন।

এভাবে স্কুলের সমস্ত বিশেষ বিষয়গুলিকে (যারা বাস্তব ঘটনার প্রতিক্রিয়া বিশেষ), সর্বদাই বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আধুনিক করার চেষ্টা করা উচিত। বস্তু-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা আশা করেন যে এই সব বিষয়ের শিক্ষকেরা শুধু মাত্র বিষয় পড়ানোর পদ্ধতির কথা চিন্তা না করে বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও ক্রমাগত চিন্তা করবেন। এ ধরনের যুক্তিসংগত বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ বিদ্যালয়ে খুবই সার্থকভাবে ব্যবহৃত হবে। বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের আরেকটি দাবী বিদ্যালয়ের শিক্ষা কোন জীবিকার্জ্জন করতে শেখাবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে জীবিকার জন্য শিক্ষা লাভ করতে চাইবে। জীবিকার লক্ষ্য তাদের চোখের সামনে থাকলে, তাদের চোখে শিক্ষার লক্ষ্য অনেকগুণে বেড়ে যাবে। যে শিক্ষা এমন আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হবে তার ফল যে শিক্ষার্থীর পক্ষে ভাল হবে সে কথা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। এই বিষয়ে গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মন্তব্য উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "যে শিক্ষা জীবিকাধর্ম্মী, তা উদার মানবিক শিক্ষা (liberal education) দিতে পারেনা"। 'উদার' শিক্ষা বলতে আমরা প্রাচীন কৃষ্টিমূলক কিছু কিছু বিষয়ের কথা চিন্তা করি। বিশ্লেষণ করে দেখা যাক্ সে চিন্তার মধ্যে কতটা সত্যতা আছে। স্পেন্স রিপোর্ট বলে "উদার শিক্ষা" (liberal education) কথাটি এমন দুর্ব্বোধ্য কথা যে যদিও আমরা অনেকেই দৈনন্দিন এ কথাটি ব্যবহার করছি তবু বাস্তবিক কি যে এর দ্বারা বোঝা যায় তা পরিস্কার নয়। একমাত্র এই শিক্ষার লক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে এর স্বরূপ বোঝা যাবে। এর অর্থ কি অল্প কয়েকটি বিষয় গভীরভাবে না পড়ে বরঞ্চ অনেক বিস্তারিত বিষয়ের একত্রিত পাঠক্রম? অথবা এর মানে কোন বিশেষ জীবিকার জন্য প্রস্তুত না করে বহু জীবিকার জন্য সাধারণ ভাবে ছাত্রদের প্রস্তুত করা? 'উদার' শিক্ষা অর্থ শিক্ষার্থীকে কতগুলো গুণ, অভ্যাস, কুশলতা ও মানসিকতা তৈরী করিয়ে দেওয়া, জ্ঞানের অনুশীলন ও অনুশীলনের জন্য আগ্রহ দুটোই শিক্ষার্থীর মনে জাগ্রত করতে হবে। সম্ভবতঃ 'উদার শিক্ষা' বলতে, বিষয়বস্তু বা পাঠক্রম দৃষ্টিভঙ্গি (altitude), অথবা জীবিকার জন্য সাধারণ প্রস্তুতি, জ্ঞান আগ্রহ ইত্যাদি সমস্তই বোঝাবে।[১] 'জীবিকার জন্য প্রস্তুতি', এখানে

১। স্পেন্স রিপোর্ট পৃঃ ১৪১

বিশেষ জীবিকা না বুঝিয়ে সাধারণ ভাবে যে কোন জীবিকা গ্রহণ করতে শিক্ষার্থীকে প্রস্তুত করা যে বোঝা যায়। মিল্টন বলেছেন, "যে শিক্ষা ব্যক্তিকে জাতীয় বিভাগে অথবা ব্যক্তিগত কাজে, যুদ্ধকালে অথবা শান্তির সময়ে, ন্যায়-নিষ্ঠা, নিপুণতা ও উদারতার সঙ্গে কাজ করতে শেখায় তাকেই আমি 'সম্পূর্ণ ও উদার শিক্ষা' (a complete and generous education) বলি।[১] রুশো একই ভাবে বল্লেন, "আমি 'জীবন যাপনের জীবিকা' শেখাতে চাই।"[২]

কিন্তু শিক্ষাকে এতটা পরিমাণে 'সামান্য' (general) করা সম্ভব কি ? যে কোন শিক্ষাই খানিকটা 'বিশেষ' ; কেন না তার উদ্দেশ্য একটি 'বিশেষ ধরনের' মানুষ তৈরী করা। মিল্টন থেকে আবার উদ্ধৃতি দেওয়া যাক্। "আমি এমন একদল অভিজাত জমিদার (country squire) সৃষ্টি করতে চাই যার চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রচণ্ড। তাঁরা পার্লামেণ্টের সদস্য হিসাবে কাজ করবার মত উচ্চস্তরের কৃষ্টিসম্পন্ন।"[৩]

মিল্টনের শিক্ষার সংজ্ঞা অতএব উদার শিক্ষা দিয়ে যে কোন জীবিকা গ্রহণ করতে প্রস্তুত মানুষ তৈরী নয়। এ হল "বিশেষ ধরণের" মানুষ তৈরী। অ্যাডাম্‌স্ এও যোগ করেছেন যে যদিও রুশো স্বীকার করবেন না তবু এমিলের পড়া শেষ হবার পর আমরা তার যে ছবি দেখতে পাই তা নিম্নলিখিত প্রকৃতির—এক অভিজাত ফরাসী যুবক যে সমসাময়িক নব্য কায়দায় আকাশনীল পোষাক, বাঁকা করে পরা টুপী, কোঁচানো পুরো আস্তিন জামা, পা চাপা পায়জামা, কোমরে তলোয়ার, ইত্যাদি নিয়ে এক অভিজাত সমাজের "ভদ্রলোক"। রুশো যতই বলুন এমিল প্রকৃতই "প্রকৃতির সন্তান"। আমাদের সন্দেহ হয় যে সমাজের এক বিশেষ স্তরের জন্য তাকে তৈরী করা হয়েছে অর্থাৎ "ভদ্রলোক" শ্রেণীর জন্য। সুতরাং জীবিকার জন্য যখনই শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, মনে হয় সমাজের বিশেষ স্তরে অবস্থিত কোন বিশেষ মানুষের চরিত্রই তাঁদের মনঃশ্চক্ষে ভাসছে। যে শিক্ষা মোটামুটিভাবে সমস্ত দিকে সংস্কৃতিসম্পন্ন ও সমস্ত প্রকার মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষের চেষ্টা করে তাকেই বোধহয় 'উদার, সাধারণ শিক্ষা' বলা যায়। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে 'উদার সাধারণ শিক্ষা'র অবতারণা করা হয় তার মধ্যে অনেক গলদও থাকে। স্কটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরণের 'উদার সাধারণ' শিক্ষা

১। মিল্টন। ট্র্যাকটেট অব এডুকেশন।

২। রুশো। এমিল। পৃঃ ৯

৩। অ্যাডাম্‌স্—ইভল্যুশন অব দ্য এডুকেশনাল থিয়োরী পৃঃ ১৭৭

দেওয়া হত তার পাঠক্রমে ভাষা, সংখ্যা গণিত, বিজ্ঞান ও দর্শন অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাবিভাগের স্নাতকও যেন এক 'বিশেষ' চরিত্র।

অতএব দেখা যায় প্রাচীনকালের শিক্ষা সর্ব্বদাই এক বিশেষ ধরণের শিক্ষা। অবশ্য তা, যথেষ্ট কার্য্যকরী জীবনানুগ শিক্ষাও বটে। একসময়ে গ্রীস ও রোমে 'ভাষণ দানে'র শিক্ষা দেওয়া হত। সোফিষ্টরা এ শিক্ষা দিতেন। সিসেরো নামে গুরু এ শিক্ষার গুরুত্ব বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। কুইন্টিলিয়ন সেই শিক্ষার করণ, পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেছেন। প্লেটো তাঁর রিপাবলিকে ছুতোর মিস্ত্রী, কারিগর সৈন্য, দার্শনিক রাজাদের আলাদা বৃত্তি ও শিক্ষার কথা আলোচনা করেছেন। মধ্যযুগে অল্পবয়সী যুবকদের, প্রথম থেকেই মুচি, পোষাক ব্যবসায়ী, পুরোহিত অথবা অতি কৃষ্টিসম্পন্ন যোদ্ধা (knight) হিসাবে শিক্ষিত করা হত। এর পরবর্তীকালে ইয়োরোপের অভিজাত জমিদারশ্রেণীর ছেলেমেয়েদের নিজেদের জমি জায়গীর দেখাশোনার বা কূটনীতিজ্ঞ বা সৈনিক হওয়ার জন্য দক্ষতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য কতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (academy) সৃষ্টি হয়"।[১] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে গণিত বিশারদদের জন্য, জাহাজ চালনার জন্য দিক্‌দর্শন, ভূগোল ইত্যাদি বিদ্যা শেখাবার জন্য বিশেষ বিশেষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। কাজেই 'উদার শিক্ষা' বলতেও প্রাচীনকালে 'সাধারণ শিক্ষা' না বুঝিয়ে, বিশেষ বৃত্তি শিক্ষা বোঝাতো। ক্রমে ক্রমে শিক্ষাতত্ত্বের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটি "উদার, সাধারণ শিক্ষার" ধারণা জন্ম নেয়। বৃত্তি শিক্ষা হল একটি বিশেষ ধরনের শিক্ষা। "উদার, সাধারণ শিক্ষা"ও যদি বিশেষ শিক্ষা হয়ে দাঁড়ায় তবে দুটিকে কেমন করে পৃথক করা যাবে? অ্যাডাম্‌স্ বলেন "যে উদার (সাধারণ) শিক্ষা দিয়ে ব্যক্তিকে বিশেষ মার্জিত, কৃষ্টিসম্পন্ন করে তোলার চেষ্টা করা হয় তার ব্যাপ্তি ও বিস্তার বিশেষ বৃত্তি শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশী। বিশেষ বৃত্তিশিক্ষা, কারিগরী এঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি বিশেষ প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয়। এদুটি ধরনের শিক্ষায় দুইধরনের পাঠক্রম অনুসৃত হয়।" 'উদার শিক্ষা' কি সংস্কৃতি অর্জ্জনে সাহায্য করে?

"লিবারেল" (বা উদার) শব্দটি "লিবার" শব্দ হতে উদ্ভূত। প্রথমে ভাবা হত 'লিবারের" প্রতিশব্দ "বই" হতে এর উৎপত্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ স্বাধীনতা। সুতরাং "উদার শিক্ষা" অর্থ পুস্তকভার জর্জরিত শিক্ষা নয়।

১। স্পেন্স রিপোর্ট—পৃঃ ৯—১০

মুক্ত স্বাধীন মানুষের উপযোগী পড়বার বিষয়ক্রম। মুক্ত মানুষকে পরাধীন দাসদের মত কোন বিশেষ কারিগরী বৃত্তি শিক্ষা দেওয়ার দরকার নেই। অতএব "উদার শিক্ষা"—মুক্ত মানুষের উপযোগী উন্নততর বিস্তৃততর শিক্ষা। এই শিক্ষা পেলে সে তার গুণাবলী প্রকাশ করতে পারবে ও নিজের উচ্চ পদাধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারবে। মুক্ত মানুষের এই উন্নততর শিক্ষার ধারনা সর্ব্বপ্রথম গ্রীস দেশবাসীদের কাছ হতে পাই। এই সময়ে ব্যক্তিগত উৎকর্ষকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখা হত। 'সুখী ও সুন্দর'ভাবে জীবন যাপন করা ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য।

হাক্সলীর লেখায় এমন শিক্ষাপ্রাপ্ত মানুষের নিম্নলিখিত বর্ণনা পাই,

"এই মানুষটি উদার শিক্ষা পেয়েছেন; তাঁর যৌবনের শিক্ষায় তাঁর শরীর, তাঁর ইচ্ছায় বাধ্য ভৃত্যের মত যে কাজ শরীরযন্ত্রের দ্বারা সম্ভব তা অনায়াস আনন্দে করতে সমর্থ। এঁর মেধা যেন স্পষ্ট, এক যুক্তিবাদের যন্ত্র যার সমস্ত অংশগুলি সচল ও প্রস্তুত বাষ্পীয় এঞ্জিনের মত যে কোন কাজে লাগতে প্রস্তুত। তিনি প্রকৃতির সমস্ত মৌলিক ও মহৎ তত্ত্ব, তাদের নিয়মনীতির জ্ঞান শিখে নিয়েছেন। ইনি খর্ব্বকায় জীবনরসে বিমুখ তপস্বী নন বরঞ্চ জীবনের তাপে পূর্ণ, যাঁর আবেগ বাসনা, অনুগত ভৃত্যের মত ইচ্ছাশক্তির দ্বারা দমিত; এঁর মরমী দরদী বিবেক, তাঁর ইচ্ছাকে পরিচালনা করে। তিনি প্রকৃতি ও শিল্পের সৌন্দর্য্যপ্রেমী; কোন প্রকার নীচতা তিনি সহ্য করেন না এবং অপরকেও নিজেরই মত তিনি শ্রদ্ধা করেন। এমন ব্যক্তিকেই আমি মনে করি উদার শিক্ষাপ্রাপ্ত, যিনি একজন 'সম্পূর্ণ মানুষ', যাঁর প্রকৃতির সঙ্গে রয়েছে পূর্ণ সমঝোতা।"[১]

উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে দেখা যায় উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে কি কি গুণ থাকা দরকার। মানুষ সর্ব্ববিষয়ে মুক্ত মানুষ বলে তখনই গণ্য হবে যখন শিক্ষাদ্বারা উপরোক্ত গুণাবলীতে সে ভূষিত হবে। তাঁর মানবেতর পূর্ব্বপুরুষ হতে প্রাপ্ত জান্তব ব্যবহার হতে মুক্ত হওয়ার জন্য এই ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন। যে ব্যক্তির কোন ইচ্ছাশক্তি নেই, যে ব্যক্তি সবরকম আবেগের বশ, যে নিজের আবেগ ও বাসনার জালে রুদ্ধ, মুক্তপুরুষ সে নয়। সে নিজেকে নৈতিক বিধির বন্ধন হতে মুক্ত মনে করতে পারে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মুক্ত নয়। সত্যিকার স্বাধীনতা হচ্ছে নিজের উপর স্বেচ্ছায় কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা আরোপ করা। যে

১। হাক্সলী। কলেক্টেড এসেজ। ভল্যুম III পৃঃ—৮৬।

মানুষ মুক্ত সে নিজের মেধাশক্তি ও অনুভূতির শক্তিকে কাজে লাগাতে পারে। সে সত্য শিব ও সুন্দরের জগতের সত্যিকার মুক্ত অধিবাসী বলে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারে। এর জন্য তার আর্থিক স্বাধীনতাও থাকা দরকার। তার সমস্ত শক্তি নিজের জীবিকার্জনের চেষ্টাতে ব্যয় হলে চলবে না। তার নিজের অর্থনৈতিক খুঁটি শক্ত থাকলে তবেই সে জীবনের সর্ব্বোত্তম আদর্শের জন্য চেষ্টা করার সময় ও সাহস পাবে। 'উদার শিক্ষা'প্রাপ্ত ব্যক্তির অভিজ্ঞান চিহ্ন, চিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর মুক্তি, নানাপ্রকার কুসংস্কার হতে স্বাধীনতা, ও স্বাধীন চিন্তা করার ক্ষমতা। স্পেন্স রিপোর্ট প্রদত্ত আরেকটি 'উদার শিক্ষার' সংজ্ঞা হল, সেই শিক্ষা "যা স্ত্রী ও পুরুষকে, যে পৃথিবীতে তারা বাস করে, তাকে বুঝতে শেখায় এবং এর সমস্যা সমাধানে নিজস্ব অবদান রাখতে সাহায্য করে।"[১] এমন ধরনের আদর্শ জীবনের চিত্র রেনেসাঁ আমলের সাহিত্যে পড়ানো হত। এ প্রকার জীবনের বিশ্লেষণের দ্বারাই জীবনের সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে। সুতরাং পাঠ্যবিষয়ে এ ধরণের শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

রেনেসাঁর কালে মনুষ্যত্ব বা মানবিক গুণ (humanity) শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত হওয়াতে বহু চিরায়ত সাহিত্য পড়ার দিকে প্রচণ্ড ঝোঁক পড়ে। প্রাচীন জীবনের মধ্যে একধরনের বিস্তার ছিল সুতরাং সে যুগের চরিত্র ও সমাজব্যবস্থার কথা পড়লে আমাদের চরিত্রেও সেই ধরনের প্রসারতা আসা সম্ভব হত। কাজেই রেনেসাঁকালে সাহিত্যপাঠের ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হত। এ সময় একটা বিশ্বাস ছিল যে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের দিক্‌নির্দ্দেশ পেতে হলে বর্ত্তমানের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে প্রাচীন জীবন ও সাহিত্য আলোচনা করে দিক্‌নির্ণয় সম্ভব হত। এর থেকে 'মানব বিষয়ক পাঠক্রম'(Humanities) কথাটি রচিত হয়। মানুষ এখানে পাঠের বিষয়বস্তু। যিনি মানুষ নিয়ে পড়াশোনা করেন তিনি হিউম্যানিষ্ট। "চিরায়ত সাহিত্যপাঠের সপক্ষে চিরকালের যুক্তি হল এই যে মহাকাব্য ইত্যাদি সাহিত্যের মধ্যে এক স্পন্দিত জীবন্ত জগৎ রূপায়িত। অন্য কোন সাহিত্যপাঠে জীবনকে এমন সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। এ জীবন মানুষের আনন্দ বেদনায় উদ্বেলিত অথচ জরা মৃত্যুর স্পর্শহীন।"[২] 'মানব সাহিত্যপাঠ' বা হিউম্যানিজম্ প্রথমে জীবন্ত মানুষের জীবন, আশা আকাঙ্খার বিষয় নিয়ে বস্তুতান্ত্রিক পাঠ ছিল—পরে কিন্তু এটি নিতান্ত প্রাণহীন বাস্তব সম্পর্কশূন্য ব্যাকরণ-

---

১। স্পেন্স রিপোর্ট। XXXI

২। জন বুচান। 'মেমরী, হোল্ড দ্য ডোর'। পৃঃ ৩৬।

চর্চা ও ভাষার রূপবিশ্লেষণে পরিণত হয়। এই জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাকাব্য ইত্যাদিকে 'মানব বিষয়ক সাহিত্য পাঠ (Literae humaniores) বলে অভিহিত করা হয় এবং এডিনবরা ইউনিভারসিটির ল্যাটিন বিভাগের দরজায়, 'হিউম্যানিটি কথাটি সগর্ব্বে রেনেসাঁ কালের ঐতিহ্যবাহী হয়ে শোভা পাচ্ছে।

লিবারেল শিক্ষার মত 'হিউম্যানিটি' কথাটি সযত্নে রক্ষিত হওয়ার যোগ্য। যে কোন পাঠ প্রত্যক্ষভাবে মানুষসংক্রান্ত তাকে 'মানবিক শিক্ষা' বলা যেতে পারে। মানুষের সর্ব্বোত্তম কীর্ত্তিকলাপের ইতিহাস অতএব 'মানববিষয়ক' পাঠক্রমের উপযোগী, যেহেতু মানুষের অজেয় আত্মার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ, তার কীর্ত্তির মাধ্যমেই। বিশেষতঃ সভ্যতার সঙ্কটকালে সে সমস্ত কীর্ত্তির গাথার প্রয়োজন আছে। তাই ইতিহাস পাঠের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বৃত্তি শিক্ষাতেও মানুষী শক্তির জয়জয়কার। মানুষেরই সম্ভাবনাকে এর মাধ্যমে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হয়। সুতরাং লিবারেল শিক্ষা ও মানবিক শিক্ষার মধ্যে পার্থক্যের রেখা কতদূর টানা সম্ভব? স্পেন্স রিপোর্টে বলা হয়েছে "এই দুই ধরনের শিক্ষার মধ্যে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই। গ্রামার স্কুল যখন স্থাপিত হয় সেটাও শিক্ষকতার বৃত্তি শেখানোর জন্যই স্থাপিত হয়েছিল। গ্রামার স্কুল থেকে পাশ করে শিক্ষিত যুবকরা পৃথিবীর তিনটি সর্ব্বপ্রাচীন বৃত্তিতেই ঢুকতেন অর্থাৎ ধর্মযাজকতা, আইন, চিকিৎসা ব্যবস্থা অথবা শিক্ষকতা।"[১] এই সব শিক্ষা (যেগুলি বস্তুত: জীবিকার জন্য শিক্ষা) পরবর্ত্তীকালে 'উদার সাধারণ' শিক্ষা নামে অভিহিত হতে থাকে। ষোড়শ বা সপ্তদশ শতকে গ্রামার স্কুলের শিক্ষা ও শিক্ষানবিশী (apprenticeship র মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। বৃটেনে এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্যের বোধ আরম্ভ হয় ১৯০৪ এর মাধ্যমিক শিক্ষা আইন চালু হওয়ার পর। এসময় হতে পাবলিক ও গ্রামার স্কুলগুলিকে কারিগরী শিক্ষার বিদ্যালয় (trade schools) হতে আলাদা করে দেওয়া হয়। যদি "লিবারেল শিক্ষা" (উদার শিক্ষা) বাস্তবিক পক্ষে শিক্ষকদের বা শিক্ষিত বৃত্তিধারীদের (learned professions) বৃত্তিশিক্ষা।

এই অনর্থক নিয়মের দরুণ, বৃত্তিশিক্ষা ও 'উদার শিক্ষা'র মধ্যে অবাস্তব ভাগাভাগির সৃষ্টি হয়। প্রকৃতপক্ষে যে 'উদার সাধারণ শিক্ষা' অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা না দেয় সে শিক্ষা মূল্যহীন। যে ব্যক্তি অপরের উপর নির্ভরশীল তাকে মুক্ত স্বাধীন পুরুষ বলা যায় না। সে যখন অর্থনৈতিকভাবে

১। স্পেন্স রিপোর্ট

স্বাধীন তখনই সে মুক্ত পুরুষ, সুতরাং বৃত্তিশিক্ষাও 'উদার শিক্ষা'র মতোই 'মুক্ত' করে। হোয়াইটহেডের মতে 'কারিগরী শিক্ষা' ও 'লিবারেল শিক্ষার' মধ্যে পার্থক্যটা খুব গোলমেলে। যে কোন পর্য্যাপ্ত (adequate) কারিগরী শিক্ষা মানুষকে 'উদার শিক্ষা' দেয়। ঠিক তেমনি যে কোন সত্যকার 'উদার শিক্ষা' মানুষকে কোন না কোন জীবিকাও শেখায়। যে কোন প্রকৃত শিক্ষার দ্বারাই মানুষ একদিকে বুদ্ধির উৎকর্ষতা লাভ করে অপরদিকে জীবিকা শিক্ষায়ও পটুত্ব অর্জন করে।"[১]

হোয়াইটহেড 'সার্থক' কারিগরী শিক্ষার উল্লেখ করেছেন। স্পেন্স রিপোর্ট সেই কথার জের টেনে বল্লেন, 'যে সঙ্কীর্ণ শিক্ষায় শুধুমাত্র একটি বিশেষ বৃত্তি শেখানো হয় যেমন ছাপাখানা, দর্জ্জির কাজ ইত্যাদি, তাই হচ্ছে কারিগরী শিক্ষা। কিন্তু যখন টেকনিক্যাল স্কুলগুলি এঞ্জিনীয়ারিং, বাড়ীর নক্সা তৈরী ইত্যাদি শিল্প শিক্ষা দেয় তখন তা যথেষ্ট বিস্তৃত শিক্ষা, কাজেই তাকে 'উদার শিক্ষা' বলতে অসুবিধা নেই। যে জীবিকার জন্য সুদীর্ঘ ও বিস্তৃত পাঠক্রমের প্রয়োজন সেগুলিকে বৃত্তিশিক্ষা না বলে মুক্ত, উদার শিক্ষা বলা চলবে।

শিক্ষকের বৃত্তির জন্য প্রশস্ত মানবিক 'উদার শিক্ষা'র যেমন প্রয়োজন একজন ট্রামচালক অথবা রেলের কুলি হতে হলে তেমন কোন শিক্ষার প্রয়োজন নেই। একজন সুশিক্ষক হতে হলে তাকে বুদ্ধিতে, নৈতিক বিচারে, আত্মিক শক্তিকে সাধারণ অপেক্ষা মাজ্জিত রুচির মানুষ হওয়ার প্রয়োজন। সেজন্য 'উদার শিক্ষা' তাঁকে একদিকে তাঁর বৃত্তির জন্য প্রস্তুত করবে, তেমনি উদারহৃদয় মুক্ত মানুষের সমস্ত গুণ অর্জ্জনেও সাহায্য করবে। বৃত্তিকরী শিক্ষা কতটা মানবিক শিক্ষা বা কৃষ্টিমূলক শিক্ষা দিতে পারবে তা নির্ভর করবে, সেই বৃত্তি ও জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধের ওপর। যদি কারো জীবিকা তার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হয় তবে তার জন্য শিক্ষা অবশ্যই কৃষ্টিগত, মানবিক গুণসম্পন্ন ও মুক্ত সাধারণ শিক্ষা হওয়া দরকার। সুতরাং আদর্শ 'উদার শিক্ষা' ও 'বিশেষ বৃত্তিকরী শিক্ষার মধ্যে কোন ভেদ থাকা উচিত নয়। ওয়াগনারের 'মাষ্টার সিংগারস্' নামে জীবনীমূলক বইতে দেখি মুচীগায়ক হানস্ সাকস্, তাঁর অনুচর ডেভিডকে শুধুমাত্র সুদৃশ্য জুতো তৈরীর বৃত্তি শিখিয়েই ক্ষান্ত হচ্ছেন না; তাকে মনোহর কবিতা রচনাতেও উদ্বুদ্ধ করছেন। শিল্পের ক্ষেত্রে কারিগর শিক্ষার্থী (craft apprentice) রাখার রীতি বহুদিন ধরেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু বৃটেনের শিল্পবিপ্লবের সময় তা ভেঙ্গে যায়। যন্ত্রের

১। হোয়াইট হেড। এইমস্ অব এডুকেশন। পৃঃ ৭৪।

প্রবর্ত্তনের সঙ্গে কারিগরী শিক্ষা হাতে কলমে শেখার প্রয়োজন অনেকাংশে লোপ পায়।

রস্ এই দু'রকম শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে কারিগরী শিক্ষা যাদের দেওয়া হয় তাদের যান্ত্রিক কাজে অভ্যাসের দরুণ, কৃষ্টিমূলক শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা থাকে না। এই ধরনের কাজ নিতান্ত প্রাণহীন ও বুদ্ধির ওপর দাবীও এদের যৎসামান্য তাই অবসর যাপনের জন্য শিক্ষার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। যন্ত্রসভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে অবসর যাপনের কাল অনেকটা সুদীর্ঘ হওয়ায় অবসর কাল সার্থকভাবে যাপন করার শিক্ষা দেওয়ার বিশেষ দরকার।

"অবসর কালের জন্য শিক্ষা" কোন অভিনব ধারণা নয়। অ্যারিস্টটলের লেখায় গ্রীসে অবসর কালের শিক্ষার উল্লেখ পাই। অবশ্য তিনি গ্রীসের যেই অভিজাত বিলাসী সম্প্রদায়, যাঁরা বহুর শ্রমে রচিত সভ্যতার পরিপক্ক ফল আস্বাদন করতে পারছেন, শুধু সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের জন্য শিক্ষার কথাই ভেবেছিলেন। কিন্তু বর্তমান গণতান্ত্রিক সভ্যতায় অবসর সকলেরই প্রাপ্য। ডিউইর মতে, "অবসর শুধুমাত্র কাজ হতে অব্যাহতি পাওয়া নয়, এ হল দায়িত্ব স্বীকার করার পুরস্কার।"[১] কাজেই আমাদের শিক্ষা এমন হওয়া দরকার যাতে স্ত্রীপুরুষ তাদের অবসর সময়ে সৃজনী কর্মের (creative work) আনন্দলাভ করতে পারে। এর ফলে সস্তা অবসর বিনোদনের উপায় থেকে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারবে। একথা হয়তো সত্য যে সার্ব্বজনীন ভাবে 'সংস্কৃতিমূলক উদারশিক্ষা' ও বৃত্তিকরী শিক্ষা দুটিকে একত্র করে দেওয়া সম্ভব না হতে পারে। কিন্তু একথাও সত্যি যে শিক্ষার্থীদের সমস্ত উদ্যম শুধু বৃত্তিকরী শিক্ষাতে ব্যয় না করে কিছুটা সংস্কৃতিমূলক শিক্ষাতে খরচ করা দরকার। "সুস্থ জীবন যাপন করাও একটি শিল্প এবং প্রয়োজনীয় বৃত্তি। সুতরাং সেটার জন্যও অন্যান্য জীবিকার মতই প্রস্তুতি দরকার।"[২] "জীবনের রুটি অর্জ্জনের চেষ্টায়, অন্যান্য সুন্দর দিকগুলোকে অবহেলা করা কিছুতেই উচিত নয়।"[৩] যদি আমাদের সন্তানেরা যন্ত্রদানবের সেবাতে নিয়োজিত কুলির কাজ করে তবে অন্ততঃ বিদ্যালয়ে তাদের সংস্কৃতির কিছু অংশ

১। ডিউই। ডেমোক্রেসী এ্যাণ্ড এডুকেশন পৃঃ ৩০৫

২। অ্যাডাম্‌স্। ইভল্যুসন অব এডুকেশনাল থিয়োরী পৃঃ ২৪৩।

৩। ,, ,, ,, ,, ,, ,, ২৪৪।

শিক্ষা দেওয়া উচিত। প্রাচীনকালের অভিজাত বিলাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষা দেওয়ার যে আদর্শ ছিল তা আজ বিগত। বর্ত্তমানে যাদের জন্য 'সংস্কৃতিমূলক সাধারণ শিক্ষা' দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে তারা এক জটিল সভ্যতার শিকার। যন্ত্রসভ্যতাতে জীবিকার্জনের জন্য যেমন প্রস্তুতি দরকার তেমনি অবসর যাপনের শিক্ষাও খুব দরকারী। কাজেই বৃত্তিকরী শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা দুইই প্রয়োজনীয়। অবসর ও জীবিকা দুয়ের জন্যই মানুষকে প্রস্তুত করতে হবে। "কোন ব্যক্তি যেন এমন শিক্ষা না পায় যা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করা যায় না অথবা এমন বৃত্তি না গ্রহণ করে যাতে কোন 'শিক্ষা' দেওয়া যায় না।"

যেখানে শুধুমাত্র বৃত্তিকরী শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের পক্ষেও সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। যেসব শিক্ষায়তনগুলি সংস্কৃতিকে তাদের পঠনের কেন্দ্রবিন্দু মনে করেন তারাও যেন বৃত্তিশিক্ষাকে সম্পূর্ণ বর্জন না করেন। স্পেন্স রিপোর্ট ইংল্যাণ্ডের বৃত্তিকরী ও গ্রামার স্কুলের মধ্যে পুরোপুরি ভেদ সমর্থন করে নি। এঁরা মনে করেন তথাকথিত বৃত্তিকরী শিক্ষা দেবার স্কুলে কিছু পরিমাণে সংস্কৃতি-মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত। অর্থাৎ বৃত্তিকরী স্কুল স্থানীয় বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত থাকবে। 'গ্রামার স্কুল'গুলিও তেমনি বর্ত্তমান সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন থাকবে। সমসাময়িক সমাজের প্রয়োজন সম্বন্ধে তাদেরও জানা থাকা দরকার। ছেলেদের কাজের আগ্রহ ও উৎসাহকে কাজে লাগানো দরকার। বিদ্যালয়ের বিষয়গুলির বর্ত্তমান জীবনের প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়া দরকার। এঁরা বোধ করেন দেশের শ্রমিকদের কার্য্যকরী জ্ঞান (practical wisdom) পড়াতে হলে বিদ্যালয়ের কৃষিবিদ্যার সংশ্লিষ্ট কিছু কিছু বিষয় শেখানো দরকার।* স্পেন্স রিপোর্ট ইংল্যাণ্ডে শুধুমাত্র গ্রামার স্কুলগুলিকে বাস্তবসম্পর্কিত করতে বলেনি, সেই সঙ্গে কিছু কিছু উচ্চমানবিশিষ্ট টেকনিক্যাল স্কুল খোলার প্রস্তাব রেখেছেন। এগুলির প্রধান লক্ষ্য হবে যান্ত্রিক ও যন্ত্রবিষয়ক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে চারিত্রিক উৎকর্ষের বিকাশ। এখানে পাঠক্রম শুধুমাত্র একটি সঙ্কীর্ণ জীবিকার জন্য শিক্ষা না দিয়ে কতগুলি জীবিকার জন্য শিক্ষা দেবে। স্কুলের পাঠক্রম দিয়ে ছাত্রদের বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে রুচি ও আগ্রহকে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির জন্য যে যে কুশলতা দরকার তাও শেখানো

---

* ভারতবর্ষের বর্ত্তমান ১০+২+৩ শিক্ষাপরিকল্পনায় কার্য্যকরী শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গীভূত করার পেছনে এই বস্তুতান্ত্রিক মত কাজ করছে যে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। অতএব আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে শুধু নির্বস্তুক বিষয়ের চর্চা না করে বরঞ্চ তাদের আরো বাস্তবানুগ করা দরকার।

হবে। এছাড়া সেই বিশেষ বৃত্তিগুলির কতগুলি সাধারণ বিধি ব্যবহারও (application of related principles) শেখানো হবে। বিদ্যালয় ছাড়বার বয়স ১১+ ও ১৩+ ঠিক করা হয়। এই পাঠক্রম অন্যান্য স্কুলের পাঠক্রমের সমান মানের হবে কিন্তু ১৩+ছাত্রদের জন্য সংস্কৃতিমূলক শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা একই সময় দেওয়া হবে। বিজ্ঞানের ব্যবহারবিধি সেই বিষয়ক্রমের কেন্দ্রবিন্দু হবে।"[১] কাজেই বৃত্তিকরী শিক্ষাকে বিশেষ বৃত্তিতে আবদ্ধ না রেখে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে হবে। বিশেষ বৃত্তি ব্যবহারের জন্য আঞ্চলিক শিল্প থাকা দরকার।

রস এই প্রসঙ্গে জীবিকা গ্রহণ ও নির্ব্বাচনের প্রশ্ন তুলেছেন। জীবিকা শুধুমাত্র অর্থোৎপাদনের কুশলতা নয়। তাকে আনন্দদায়ক হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি, রুচি, বিদ্যা ও শিক্ষা অনুসারেই জীবিকা স্থির হওয়া প্রয়োজন। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী আর্নষ্ট জোন্স বলেন, মানুষ কোন গভীর আগ্রহ হতে জীবিকার চেষ্টা করে; বাইরের যে কারণগুলি সে দেখায় সেগুলি অনেক সময়েই সত্যিকার কারণ নয়।

আগ্রহ ও উৎসাহ ছাড়াও বুদ্ধি ও বিশেষ কুশলতা না থাকলে জীবিকাতে সাফল্য অর্জ্জন করা যায় না। ছোটবেলাতেই শিক্ষার্থীদের বিশেষ দক্ষতা নানাভাবে প্রকাশিত হয়। রস্ উদাহরণ দিয়ে দেখালেন একটি দশ বৎসরের ছেলে তার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে মোজেস্ ও তার অনুগামীদের নিয়ে এক নাটক করতে গিয়ে, অনুগামীদের জন্য আইনের বিশদ খসড়া প্রণয়ন করেছিল। উত্তরকালে সে ছেলেটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের মেধাবী ছাত্র হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জন করে। স্পীয়ারম্যান বুদ্ধির মধ্যে বিবিধ দক্ষতার উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন, যেমন (১) গণনার কুশলতা (২) হাতচালানোর কুশলতা (৩) মুখস্থ শক্তি (৪) ভাষাগত ব্যুৎপত্তি (৫) সঙ্গীতের ক্ষমতা। এই বিভিন্নপ্রকার দক্ষতা পরীক্ষার নানা অভীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা সে জাতীয় পরীক্ষার পর যথাযথ বৃত্তিমূলক শিক্ষার ধারায় অনুপ্রবেশ করতে পারলে, ভবিষ্যতে অনেক আশাভঙ্গের দুঃখ থেকে রক্ষা পাবে।*

১। স্পেন্স রিপোর্ট পৃঃ ৩৭২।

* আমাদের দেশে বর্ত্তমানে প্রস্তাবিত ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সের সঙ্গে স্পেন্স রিপোর্টের বিশেষ মিল দেখতে পাই। শিক্ষার্থীদের গ্রন্থকীট না করে বর্ত্তমান যন্ত্রসভ্যতার জন্য প্রস্তুত করার কথা হচ্ছে বলে কোঠারী কমিশন দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিকে শিক্ষার অন্যতম প্রয়োজনীয় লক্ষ্য বলে স্থির করেছেন। বুদ্ধিমান কুশলী নব প্রজন্ম হাতে তোলার জন্য, বিদ্যালয়ের প্রশস্ত পাঠক্রমের সঙ্গে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স যোগ করে

অতিরিক্ত পাঠসূচী

অ্যাডাম্‌স্। ইভল্যুশন অব এডুকেশনাল থিয়োরী। ষষ্ঠ ও অষ্টম অধ্যায়।

মডার্ণ ডেভেলপমেণ্ট্‌স্ ইন এডুকেশনাল প্র্যাকটিশ। দ্বিতীয় অধ্যায়।

অ্যাডামসন। দ্য ইনডিভিজুয়াল অ্যাণ্ড দ্য এনভিরনমেণ্ট। পঞ্চম অধ্যায়।

বোর্ড অব এডুকেশন। হ্যাডাও রিপোর্ট। পঞ্চম অধ্যায়।

স্পেন্স রিপোর্ট অষ্টম ও একাদশ অধ্যায়।

টি. এইচ. হাক্সলী। কলেকটেড্ এসেজ্। তৃতীয় ভল্যুম।

জোন্‌স্। পেপার্‌স্ অব সাইকোঅ্যানালিসিস। XXXV

মনরো। টেক্সট্ বুক ইন দি হিষ্ট্রি অব এডুকেশন। অষ্টম অধ্যায় ও দ্বাদশ অধ্যায়।

স্নেভেন। ভোকেশনাল এডুকেশন।

এফ. এইচ. স্পেন্সার। এডুকেশন ফর দ্য পিপ্‌ল।

এইচ. স্পেন্সার। হোয়াট নলেজ ইজ মোষ্ট ওয়ার্থ।

ওয়াট্‌স্। এডুকেশন ফর সেল্ফ্ রিয়ালাইজেশন অ্যাণ্ড সোস্যাল সারভিস। পার্ট থ্রি, নবম অধ্যায়।

হুইলার। ক্রিয়েটিভ এডুকেশন এ্যাণ্ড দ্য ফিউচর। সপ্তদশ অধ্যায়।

শিক্ষার সঙ্গে বাস্তবের সংযোগের আয়োজন করা হচ্ছে। দেশের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে কোথায় কি ধরনের জীবিকার সুযোগ আছে বা খনিজসম্পদ আছে, তা যাচাই করে নব নব বৃত্তিমূলক শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাব, সাম্প্রতিক কালে অত্যন্ত বেশী।

একাদশ অধ্যায়

শিক্ষায় ধর্ম

সর্ব্বধ্বংসী যুদ্ধকালে, যখন আমরা যা কিছুকে মূল্যবান মনে করি সবই বর্বরতার বন্যায় নিমগ্ন, নবসৃষ্টির শিক্ষাকে যে দৃঢ় দর্শনের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার, এ কথা তর্কাতীত। যে সব দেশের সঙ্গে আমরা সংঘর্ষে লিপ্ত, সেসব দেশের অনিষ্টকর মতবাদ ও ব্যবস্থার অশুভ প্রভাব যদি এড়াতে চাই, এবং এ ধরনের বর্ত্তমান দুর্ভোগ যাতে পুনরাবৃত্ত না হয় তার বিষয়ে যদি নিশ্চিত হতে চাই, তবে তো দৃঢ় ভূমিতে শিক্ষাকে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। একথা স্বীকার করে নেওয়াই ভাল যে ঐসব বিপক্ষ দেশের রাজনীতিক সংস্থা ও শিক্ষাব্যবস্থা দৃঢ়সন্নিবদ্ধ, বিশেষ একটি দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। একথা হয়তো বিতর্কের খাতিরে বলা যেতে পারে যে সেই ধরণের 'কাঁটাছাঁটা' ক্ষমতাদর্পী নিষ্ঠুর দর্শন, যা টোট্যালিটারিয়ান রাষ্ট্রের শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তি যুগিয়েছে তার অপেক্ষা বৃটেনের অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট দর্শন অনেক ভাল। কিন্তু একথা আজ অনস্বীকার্য্য যে আমাদের মৌলিক প্রশ্নগুলিকে কতগুলি এমন অস্পষ্ট অথচ সর্ব্বগ্রাহ্য তত্ত্বের সাহায্যে স্থগিত রাখার বদলে, কিছু স্পষ্ট ও দৃঢ়, মূলতত্ত্ব ও লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

স্বভাববাদ বা প্রয়োগবাদের শুধু বৃটেনের নয় সমস্ত পৃথিবীর পক্ষে উপযোগী দর্শনের সন্ধান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তবে প্রয়োগবাদের নিজস্ব মূলতত্ত্ব অনুসরণ করে বলা যায়, এমন দর্শন চাই, যা সন্তোষজনক ফল দেবে। বর্ত্তমান ইংল্যাণ্ডের দর্শন শিক্ষাব্যবস্থাকে তেমন সার্থকভাবে সাহায্য করতে পারে নি। এই দর্শন কেমন? এতে আছে মানুষের স্বাভাবিক 'ভালত্বে' বিশ্বাস ও কিছুটা অনুভূতি-কাতর মানববাদ ও অস্পষ্ট উদারপন্থা (liberalism)। কিন্তু মানুষের মন্দ ব্যবহারের ফল আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে এই দর্শন যথেষ্ট নয়। শুধুমাত্র মানববাদ, ঐটুকুর (মানুষের মহত্ত্বে বিশ্বাস) বাইরে যার কোন সম্বল নেই, দুর্ভোগের কালে, আমাদের দিক্‌দর্শন করতে পারেনা। ন্যায়-অন্যায়-বিচারহীন পৌত্তলিকতা যাতে জয়ী না হয় তার জন্য উদার মানববাদের চেয়ে আরো শক্তিশালী দর্শনের প্রয়োজন। মানববাদের নিজের ওপরে ভর করবার

শক্তি নেই, এমন কোন দৃঢ়ভিত্তিক দর্শনের উপর একে প্রতিষ্ঠা করা দরকার যাতে নিত্য, সন্তোষজনক ফল লাভ হয়।

একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে নৈতিক চিন্তাকে অবহেলা করে সহজ, তড়িৎগতি "উপযোগিতা"র (expediency) পথ অনুসরণ করায় বহু জাতি দুর্দৈব ডেকে এনেছে। প্রকৃতপক্ষে, শেষ পর্য্যন্ত যেই দর্শন আধ্যাত্মিক জগতের স্বাভাবিক বিধি অনুসরণ করে, সেটাই বাস্তবিক উপযোগী হতে পারে। যেমন ম্যাধ্যাকর্ষণের বিধিকে উপেক্ষা করা যায় না এই বিধিগুলিও তেমনি অনুপেক্ষ-নীয়। এই জগৎ যদি শ্রেয়ঃনীতির রাজ্য হয়, তবে এর কাজ তখনই ভাল করে চলতে পারে যদি সকলে শ্রেয়ঃনীতির বিধি মেনে চলেন। অন্য যে কোন জীবনের ধরন অসার্থক হতে বাধ্য।

এই বইটিতে এতক্ষণ ধরে বলা হয়েছে যে সর্বোত্তম শিক্ষার আদর্শ ও ব্যবস্থা, ভাববাদী দর্শন থেকে পাওয়া সম্ভব, প্রয়োগবাদ বা স্বভাববাদ হতে নয়। পরমার্থিক সত্তার অন্তরে নিহিত রয়েছে, সত্য, সুন্দর ও শুভ—এই তিন পরম আদর্শ। মানুষ এই তিন পরম আদর্শকে অনুসরণ ও অনুসন্ধান করে নিজেকে পরিপূর্ণ করতে পারে। এরা উচ্চতম মূল্যের অধিকারী এবং স্বাশ্রয়ী বলে আমাদের শ্রদ্ধা ও সহযোগ নায্যতঃই দাবী করতে পারে। অতএব শিক্ষার কর্তব্য আমাদের তরুণদের যা সত্য, সৎ, সুযুক্তিপূর্ণ, পবিত্র, সুন্দর এবং শুভ বলে নন্দিত সেই বস্তুগুলির দিকে চালনা করা।

এই 'পরম' গুলিকে লাভ করার পন্থা কেমন করে আবিষ্কার করা যাবে? শিক্ষক হয়ে যাদের পরিচালনা করা আমাদের কর্তব্য, তাদের লক্ষ্য কেমন করে এগুলির দিকে আকর্ষণ করব? এ সন্দেহাতীত ভাবে সত্য যে কোন উচ্চ মানসের অধিকারী ব্যক্তিরা অন্যের সাহায্য ব্যতীতই সেই 'পরম'গুলিকে অনুধাবন ও অনুসরণ করে। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে সেই 'নির্বস্তুক' 'পরম'গুলির কোন আহ্বান পৌঁছায় না। আমরা কিভাবে সেই পরম আদর্শ-গুলিকে তাদের দৃষ্টিপথে বিভাসিত করে তুলবো এবং তাদের সেই পথ অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ করবো? জাতীয় স্কুলগুলির ছাত্রদের কেমন করে সেই আত্মিক তীর্থযাত্রায় প্রবুদ্ধ করবো?

আমাদের ভাববাদী দর্শনকে সার্থকভাবে কার্য্যে রূপায়িত করতে হলে এই প্রশ্নগুলির পরিস্কার উত্তর চাই।

প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে ডঃ এফ এইচ হেওয়ার্ড এক সমান্তরাল

'ধর্ম'কে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যালয়ে (এবং বাইরেও) তিনি কতগুলি উৎসবের ব্যবস্থা করেন, এগুলি থেকে আমরা কিছু শিক্ষা পেতে পারি। কিছু কিছু অসাধারণ মনীষি কবি বৈজ্ঞানিক (যেমন সেক্সপীয়র, মিলটন, নিউটন), অথবা কয়েকটি নির্বস্তুক ধারণা যেমন ন্যায় ধর্মকে পূজ্য বস্তু করে তিনি কতগুলি আচার সম্বলিত 'উৎসবের' ব্যবস্থা করেন। যেমন ধর্মীয় সম্মেলনে (religious services) ভাষণ, সঙ্গীত ও শিল্পের ব্যবহার করার সময়, তিনি ঐ কবি মনীষিদের জীবন, ভাষণ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে উৎসবগুলো সাজালেন।

এই উৎসবগুলির উদ্দেশ্য—মূল্যবান প্রয়াস বা ধারণার প্রতি সকলের ভক্তির ভাব জাগ্রত করা। দেখা গেল, যদিও অনেক সময়ই এই চেষ্টা মনের ওপর ছাপ ফেলার মত চিত্তাকর্ষক হত, কিন্তু সেই ছাপ হত নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী। এবং উৎসাহী সহানুভূতিশীল শ্রোতারা মনে মনে অনুভব করতেন যে ধর্মের আধুনিক বিকল্প অনুসন্ধানের এই প্রচেষ্টায়, কিছু মুখ্য বস্তু অনুপস্থিত। ধর্মই শুধু অন্তিম লক্ষ্যের স্পষ্ট ধারণা দিতে পারে; এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই লক্ষ্যে পৌছুবার আগ্রহ ও চেষ্টায় মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। নির্বস্তুকতার উচ্চভূমি হতে ধর্ম ভিন্ন আর কিছুই আদর্শবাদী দর্শনকে মানুষের কাছে নামিয়ে আনতে পারে না। এক প্রকৃত ঈশ্বর, যিনি শুধু সর্ব্বাঙ্গীন শুভ মাত্র নন যিনি করুণাময় ও সত্যময়, এমন ব্যক্তিরূপের পূজা না করলে মানুষ পরমার্থিক সত্তার (Absolute) কাছে পৌছুতে পারে না।

আজ, ক্রমেই চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এই প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছেন যে শিক্ষাকে ফলপ্রসূ হতে হলে এবং এক উন্নত সভ্যতাকে সাময়িক বর্বরতায় নিমজ্জিত হওয়া হতে রক্ষা করতে হলে, ধর্মনির্ভর করা দরকার। ধর্ম বলতে আমরা কি বুঝি? এই ধর্ম অস্পষ্ট ঈশ্বরবাদ, বা উচ্চ শ্রেয়ঃনীতিক আদর্শে বিশ্বাস নয়। এটি আরও প্রাণবন্ত, আরো শক্তিশালী। রস নিজে খ্রীষ্টধর্মকে সর্ব্বোত্তম ধর্ম বলে অভিহিত করেছেন। এই ধর্ম আমাদের স্কুলে ও বিদ্যালয়ে তার পুরাতন স্থান ফিরে পাক, এই রসের মত।

রস্ প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে বৃটেনে স্কুলে ধর্মের অবস্থা সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন বর্তমান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর পৃথিবীব্যাপী প্রায় সর্ব্বত্রই ধর্মের সেই নৈরাজ্য লক্ষনীয়।

বর্ত্তমানে ধর্মের যে অসন্তোষজনক ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করি তা কি কি শক্তি-দ্বারা আয়োজিত? উনবিংশ শতাব্দীতে অনুভূতি বা ইচ্ছাশক্তির বদলে মনন-

শক্তির উপর বিশেষ ঝোঁক দেওয়ার ফলে ধর্মনিরপেক্ষতার (secularism) এক আন্দোলন জন্মলাভ করে। প্রাথমিক শিক্ষার উপর এর গভীর প্রভাব লক্ষ্যনীয়। এমন কি ১৮৭০ সালের এডুকেশন অ্যাক্টে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজিত হয় যে "সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত কোন বিদ্যালয়ে কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মীয় মত বা উপদেশ দেওয়া চলবে না।"[১] অবশ্য বাইবেল পাঠ নিষিদ্ধ করা হয়নি কিন্তু তবুও এর দ্বারা ধর্মশিক্ষা তার প্রাণস্বরূপ সত্তা হারিয়ে এমন প্রাণহীন হয়ে পড়ে যে জীবনের প্রতি কোন প্রকার ধার্মিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। অবশ্য সাম্প্রতিক কালে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীর বিবিধ সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যের মতানৈক্য, বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হওয়ার উপক্রমে, একমত হয়ে বাইবেলের পাঠক্রম সম্বন্ধে সহমত হন। লোকাল এডুকেশন অথরিটি ও শিক্ষকদের নিকট হতে সেই পাঠক্রম স্কুলে প্রচলিত করার অনুমোদনও পান। বাস্তবিক সেই পাঠক্রমদ্বারাই সরকারী ভাতাপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মশিক্ষা কেমন করে দেওয়া যায় সেই সমস্যার সমাধান হয়েছে।

ধর্মশিক্ষায় পরবর্তী পুরোগামী পদক্ষেপ, ১৯৩৯ এর মাধ্যমিক শিক্ষার উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্ট, যাতে তাঁরা এই প্রত্যয় জ্ঞাপন করেন, "যে বর্ত্তমানে জনতার মনে ধর্মশিক্ষার মূল্য ও প্রয়োজন সম্বন্ধে ব্যাপক ও যথার্থ স্বীকৃতি পাওয়া যাচ্ছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য, বাইবেল কিংবা ধর্মগ্রন্থ শিক্ষা, কি স্থান অধিকার করবে, সে সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার শুভ কাল সমাগত।"[২] এই রিপোর্টে এই প্রত্যয় প্রকাশ করা হয় যে "জীবনের যে একটি ধার্মিক ব্যাখ্যা হয়, এই সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন না করতে পারলে, তাদের কিছুতেই প্রকৃত শিক্ষিত বলে অভিহিত করা যাবে না।" এই মন্তব্যের ফলে মাধ্যমিক স্কুলে গভীরভাবে ধর্মগ্রন্থ পঠন পাঠনের একটি বিশিষ্ট অধিকার পাওয়া গেল।

টাইম্‌স্‌ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করে রস দেখান যে জনমত ক্রমেই একথা ভাবতে আরম্ভ করেছিল, "যে যদিও এদেশে প্রধানত খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী-দের দেশ এবং খ্রীষ্টধর্মের মূলতত্ত্বগুলিকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হচ্ছে, তবুও এখানে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সম্পূর্ণ অধার্মিক, পৌত্তলিক আচারব্যবহার নিয়ে বিদ্যালয়ের বাইরে আসার সুবিধা দেওয়া হয়েছে!" এই পত্রিকার লেখক বল্লেন, "শিক্ষা নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য যে

১। স্পেন্স রিপোর্ট। পৃঃ ২০৬
২। " " " "

কোন শিক্ষার মূল ভিত্তি হওয়া উচিত ধর্ম। ধর্মহীন শিক্ষা, কোন শিক্ষাই নয় কারণ সুনাগরিকত্বের মূল ভিত্তি হচ্ছে চরিত্র। এবং মানুষের চরিত্র নির্ভর করে তার (ধর্ম) বিশ্বাসের উপর। ··· কি করে দেশ এই সহজ সত্যটি উপেক্ষা করতে পারে এবং ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে তার কোন দায়িত্ব নেই এমন কথা ভাবতে পারে?

"বহু বৎসর ধরে আমরা অতীতের ঐতিহ্যকে, আধ্যাত্মিক মূলধন করে কাল কাটাচ্ছি, ভবিষ্যতের জন্য কোন ব্যবস্থাই করিনি। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম আকাশ হতে পড়তে পারে না। এ দর্শন নয়, ঐতিহাসিক ধর্ম, কাজেই যেসব তথ্য নির্ভর করে এই ধর্মের প্রতিষ্ঠা, সেগুলিকে না শেখানো হয় এবং সেই ধর্মশিক্ষাকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু না করা হয়, তবে ক্রমে ক্রমে এই ধর্ম লোপ পাবে। সর্বোত্তম এই জ্ঞানকে তরুণ নাগরিকদের প্রশিক্ষণে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। আজ আমরা খ্রীষ্টধর্মের মূলতত্ত্বগুলিকে রক্ষা করার জন্য যে যুদ্ধে রত, তা নিস্ফল হবে যদি এ ধর্মের কোন ভবিষ্যৎই না থাকে। অশেষ ব্যয়ে, এই ধর্মকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা বৃথা, যদি আমাদের অবহেলার দ্বারা আমরা একে ভেতর হতে শুকিয়ে বিনষ্ট হতে দিই।"

ধর্মগুরুদের কাছ হতে এ বিষয়ে কিছু পথনির্দ্দেশ পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ের নির্দ্দেশ দিলেন ক্যান্টারবেরী ও ইয়র্কের আর্চবিশপ।

প্রথমতঃ সমস্ত স্কুলে খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা দেওয়া হবে। (যদি কোন মাতাপিতার সে বিষয়ে অসম্মতি থাকে তবে তাদের সেই শিক্ষা হতে বিরত থাকবার স্বাধীনতা থাকবে।) ইচ্ছুক ও যোগ্য শিক্ষকের উপর এই ধর্মশিক্ষার দায়িত্ব থাকবে। আমরা আশা করি কোন শিক্ষক এই শিক্ষা দিতে অনিচ্ছুক হবেন না।

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক শিক্ষণের ডিগ্রী পেতে হলে, তাদের পাঠক্রমে ধর্মজ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষাদান একটি "অতিরিক্ত বিষয়" হিসাবে না রেখে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে রাখা হবে। অর্থাৎ ডিগ্রী পাওয়ার জন্য ঐ বিষয়ে শিক্ষাদানকে মূল্যবান বলে গ্রহণ করা হবে।

তৃতীয়তঃ যদি কোন বিশেষ শিক্ষক (শিক্ষকেরা) খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষাদানে পারদর্শী হন, আমরা অনুরোধ করি তাঁকে (তাঁদের) স্কুলের সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে নানা শ্রেণীতে শিক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হবে।

চতুর্থতঃ ধর্মশিক্ষাদানকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য, এর শিক্ষাদান পদ্ধতি যেন পরিদর্শক এসে দেখেন ও ভালমন্দ পদ্ধতির মূল্যায়ন করেন।

পঞ্চমতঃ আমরা অনুরোধ করি যেন সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রারম্ভকালে সকলে সমবেত হয়ে ঈশ্বর পুজা বা ভজনার জন্য একটি ঘণ্টা নির্দ্দিষ্ট রাখেন।

এই প্রস্তাবমালায়, তাঁরা বিশেষ জোর দেন প্রাথমিক স্কুলে ধর্মশিক্ষাদানের উপর। ধর্মগুরুদের প্রস্তাব, উপদেষ্টা সমিতির প্রস্তাব ও টাইম্‌স্ সংবাদপত্রের অভিমতের সমর্থন পেয়ে রস নিম্নলিখিতভাবে বিদ্যালয়ে ধর্মের স্থান এবং খ্রীষ্টধর্মের প্রচারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ইউকেনের মতে "ধর্ম অর্থ জীবনের অন্যতম অংশ মাত্র নয়। ধর্ম, জীবনের সর্ব্বমধ্য কেন্দ্রবিন্দু আত্মাস্বরূপ যা আমাদের সমস্ত জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা ও শক্তি যোগায়।"[১] বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এর অর্থ, ধর্ম পাঠসূচীর অন্য বিষয়ের মত আরেকটি বিষয়মাত্র হলে চলবে না। (যদিও পাঠসূচীতে ধর্মশিক্ষার জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট থাকা দরকার।) বিদ্যালয়ের সমস্ত কার্য্যাবলী ধর্মকে মধ্যবিন্দু করে পরিকল্পনা করা হয়েছে। ছাত্রদের শুধুমাত্র ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশদান যথেষ্ট নয়। তাদের খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী করার জন্য আরো কিছু সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা করা দরকার। এমন অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করা দরকার যাতে ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে খ্রীষ্টের প্রতি তাদের বিশ্বাস ও আনুগত্য স্বীকার করে। "আমাদের বিদ্যালয়গুলি যেন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের গড়ে তোলবার প্রতিষ্ঠান (nurseries of Christians) হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের ছাত্রদের মনে এই বিশ্বাসের বীজ বপন করা প্রয়োজন যে তারা ঈশ্বরের ও মানবের সেবক ও প্রেমী।"[২] এবং প্রত্যক্ষ ও তাৎক্ষণিক ফল না পেলেও, বিদ্যালয়ে আমাদের (খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের) চেষ্টা ব্যাহত করবে না।

ধর্মকে, বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপট হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য কি পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন? প্রথমতঃ প্রতিদিন বিদ্যালয় আরম্ভের প্রাক্কালে ও শেষে সমবেত প্রার্থনার আয়োজন রাখতে হবে। স্কিনারের মতে "বিদ্যালয়ের প্রার্থনাসভাকে ফলোৎপাদক হতে হলে কতগুলি বিশেষত্ব থাকা প্রয়োজন। একে আন্তরিক, সহজ এবং সংক্ষিপ্ত হতে হবে।"[৩] যদি এই শর্ত্তগুলি পালিত হয়, এবং প্রার্থনা-সভার পরিচালনা তার উচ্চ আদর্শের উপযোগী যথেষ্ট মর্য্যাদাশালী হয়। তবে অনেক সম্ভাবনা সার্থক হবে। অনুভূতির দিক্‌নির্ণয় ও উচ্চতলে আরোহন সম্ভব হবে, দিনের কাজ উপযুক্ত মনোভাবের সঙ্গে আরম্ভ ও সমাপ্ত হবে। উপযুক্ত প্রার্থনা-

১। ইউকেন। লাইফ্‌স্ বেসিস্ অ্যাণ্ড লাইফ্‌স্ আইডিয়াল। পৃঃ ৭
২। জে. ডব্লিউ. স্কিনার। মারসারীস্ অব ক্রীশ্চান্‌স্। পৃঃ ১৬
৩। " " " " " " "

সঙ্গীত, বিদ্যালয়ের প্রার্থনাসভার বিশিষ্ট অঙ্গ। সেই সঙ্গীতগুলি শিশুদের উপযোগী হওয়ার দরকার, এটি অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা। বাস্তবিক এই ধরনের অতিসরল, অর্থহীন প্রার্থনাসঙ্গীত কিশোরবয়স্কদের বুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞাসূচক এবং এর ফলে তাদের মনে ভক্তির ভাব উদ্রেকের পরিবর্তে তাচ্ছিল্যের ভাবই জন্মানো সম্ভব। সুতরাং প্রার্থনাসঙ্গীত বিশেষ বিবেচনার সঙ্গে নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন। দৈনিক বিদ্যালয়সম্মেলনে বাইবেল হতে নির্ব্বাচিত সুসম্বদ্ধ অংশ-বিশেষ পাঠের ব্যবস্থা থাকা উচিত। এই পাঠ প্রতিদিনের সময়সূচীতে ধর্ম-শিক্ষার সঙ্গে অর্থপূর্ণভাবে যুক্ত করা সম্ভব হবে। যদি প্রধান শিক্ষক বা প্রার্থনা-সভার পরিচালক বাগ্মীতায় পারদর্শী হন তবে পূর্ব্বপ্রস্তুত প্রার্থনার বদলে তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত করে প্রার্থনা করতে পারেন। তা না হলে পূর্ব্বপ্রস্তুত প্রার্থনা, প্রার্থনা বই (Liturgy) হতে গ্রহণ করা যায়। অবশেষে একটি কথা, উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের প্রার্থনা সভা পরিচালনার ভার দেওয়া এবং তাদের প্রার্থনা প্রস্তুত করতে দেওয়ার সপক্ষে অনেক সুযুক্তি আছে।

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ের সমবেত জীবন, খ্রীষ্টধর্মের মনোভাব ছাত্রদের মনে সঞ্চারিত করার বিশেষ উপযোগী পন্থা। শিক্ষক ও ছাত্র এবং ছাত্রদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধের দ্বারা খ্রীষ্টধর্মের মৌলিক শ্রেয়ঃনীতি অভ্যাস করার স্বর্ণ সুযোগ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টধর্মের প্রধান সদ্‌গুণ হচ্ছে "নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন" (playing the game)। ক্রীড়াপ্রাঙ্গনে সেই নীতি উদযাপনের আরো সুযোগ মেলে। 'আদর্শ রাষ্ট্রের' অপেক্ষা 'আদর্শ বিদ্যালয়' পাওয়া সহজ। অতএব প্রকৃত খ্রীষ্টধর্মের ভ্রাতৃত্বভাব বিদ্যালয়ের মধ্যে অভ্যাস করা, একেবারে অসম্ভব নয়। বিদ্যালয় যেন পর্ব্বতচূড়ায় আলোকিত শিখা, যাকে লুকিয়ে রাখা যায় না, এবং বৃহত্তর সমাজে এর প্রভাবেরও কোন সীমারেখা নির্দ্দেশ করা যায় না। আবাসিক বিদ্যালয়গুলিও এমনি আলোকবর্ত্তিকার মত ছাত্রদের জীবন গভীরভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

তৃতীয়তঃ খ্রীষ্টধর্মের মূলতত্ত্ব ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। বাইবেল, যদিও ইংরেজি ভাষাভাষী লোকের এক মূল্যবান ঐতিহ্য, তবু একে শুধুমাত্র মহৎ সাহিত্য বলে শিক্ষা দেওয়া যথেষ্ট নয়। একে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সাহিত্যের সঙ্গে, ইতিহাস বলে গ্রহণ করাও যথেষ্ট নয়, যদিও বাইবেলই আমাদের সভ্যতার প্রকৃত ভিত্তি। বাইবেল শেখাবার প্রধান কারণ হল "এটি খ্রীষ্টধর্মের আদিগ্রন্থ এবং খ্রীষ্টধর্মবিশ্বাস ও প্রার্থনার ভিত্তি এরই উপর

স্থাপিত।"[১] খ্রীষ্টধর্ম ঐতিহাসিক ধর্ম; বাইবেলে এই ধর্মকে যে সব ঘটনাবলী স্পষ্ট রূপ দিয়েছে তাদের সুসম্বদ্ধ ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, তা ভিন্ন যদিও অনেক সময় বলা হয় ধর্ম শুধুমাত্রই বুদ্ধির দ্বারা গ্রাহ্য বিশ্বাস নয়, এটি অনুভূতি ও ইচ্ছার সঙ্গে জড়িত। তবুও এর বুদ্ধিগত দিকটিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করলে ভুল হবে। খ্রীষ্টধর্মের বৌদ্ধিক বিষয়বস্তু আছে এবং তা বাইবেলে বিধৃত। এই সমস্ত কারণে, খ্রীষ্টধর্মের জন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ (scripture) অতি আবশ্যক।

বাইবেলের বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষ পাঠ করে তা থেকে কোন নীতিবাক্য উদ্ধার করে এনে সামান্যই লাভ হবে। "যদি পাঠক্রমে কোনপ্রকার ধর্মশিক্ষার স্থান থাকে তবে অন্যান্য যে কোন বিষয়ের মতই তার সার্থক পরিকল্পনা প্রয়োজন।"[২] অন্যান্য বিষয়ের মতই বাইবেল পাঠের পরীক্ষা নেওয়া উচিত এবং তার মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি ধর্মশিক্ষা দেবেন তাঁর নিজেরও এই গ্রন্থের বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে, যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, খ্রীষ্টধর্ম প্রবর্ত্তিত শ্রেয়ঃনীতি বোধ জাগরণের ইতিহাস, যীশুখ্রীষ্টের জীবন ও শিক্ষা, খ্রীষ্টধর্মের প্রচার-কল্পে মঠ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শিক্ষকের যেমন বাইবেল যে সময়ে লেখা হয়েছে সেই সময়ের ইতিহাস এবং বাইবেল সম্বন্ধে সাম্প্রতিকতম সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার তেমনি, যেই ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা দেবেন তাদের মানসিক বৃদ্ধির স্তর সম্বন্ধে অবহিত হওয়া তাঁর প্রয়োজন যাতে তাদের মানসিক শক্তির উপযোগী করে ধর্মশিক্ষা দিতে পারেন। এক কথায়, তিনি বাইবেল পাঠের একজন উৎসাহী প্রচারক মাত্র না হয়ে এর বিষয়বস্তু এবং সুদক্ষভাবে একে শেখাবার পদ্ধতি জানা একজন বিশেষজ্ঞও হবেন। মাধ্যমিক স্কুলের কিশোর ছাত্রদের প্রয়োজন ও আগ্রহ, এবং বুদ্ধিমান ছাত্রদের প্রশ্ন ও সমস্যা মেটাবার জন্য শিক্ষিত বিশেষজ্ঞ, যিনি ধর্মবিষয়ে ডিগ্রী লাভ করেছেন এমন ধর্মশিক্ষক প্রয়োজন। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ধর্মশিক্ষা দক্ষভাবে দেওয়া দরকার; হয়তো সেখানেও, যাঁরা, নিজেরা ধর্মগ্রন্থ পড়ে এসেছেন তাঁদেরই নিয়োগ করা হবে। কোন কোন দার্শনিক ধরন সম্পন্ন শিক্ষক উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গে, বিভিন্ন দর্শন কিভাবে জীবনকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন, সে নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন এবং খ্রীষ্টধর্মকে দার্শনিক ভিত্তিতে উপস্থাপিত করবেন। কোন

১। স্পেন্স রিপোর্ট।

২। পৃঃ ২০৭।

কোন প্রধান শিক্ষক এ ধরনের আলোচনায় ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ সৃষ্টি করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন।

অসুবিধাগুলিকে অগ্রাহ্য করা যাবে না। প্রথম অসুবিধা বাইবেলের বিপুল কলেবর। বস্তুতঃ এটি একটি পুস্তকমাত্র নয়, গ্রন্থাগার বিশেষ। কাজেই কিছু পরিমান নির্ব্বাচনের প্রয়োজন আছে। আরেকটি অসুবিধা হল, ছেলেমেয়েরা চোদ্দ/পনেরো বছর বয়সেই স্কুল ছেড়ে দেয়। কাজেই সারা জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় পর্য্যাপ্ত ধর্মশিক্ষা তাদের দেওয়া হবে না। তবে শিক্ষক ধর্মসম্বন্ধে খানিকটা আগ্রহ সৃষ্টি করে এমন ভিত্তি রচনা করতে পারেন যার ওপরে, পরে ধর্মবোধ গড়ে তোলা যাবে। স্পেন্স রিপোর্ট জোর দিয়ে বলেছেন যে "বাইবেল-সাহিত্যে বেশ কিছু চিন্তনযোগ্য তথ্য ও তত্ত্ব রয়েছে যেগুলিকে সুসম্বদ্ধভাবে উপস্থিত ও শিক্ষা করা যায়।"[১] স্পেন্স রিপোর্টের পরামর্শ হচ্ছে, বাইবেলের বিভিন্ন অধ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের বাইবেলের কি কি বাণী মুখ্যতঃ প্রভাবিত করেছিল এবং যাদের জন্য লেখা তাদের কাছে কি বাণী প্রচারিত হচ্ছে, এ বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী থাকা প্রয়োজন। "এই উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্মগ্রন্থ শিক্ষা দেওয়া হলে স্কুলের মধ্যে পরবর্ত্তীকালের জন্য, ধর্মশিক্ষার সর্ব্বোত্তম ভিত্তি স্থাপিত হবে।"[২] রস আরো খানিকদূর অগ্রসর হয়ে বল্লেন শিক্ষকের এই দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য(ধর্মশিক্ষা)ই ব্যর্থ হবে কেননা শিশুদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রধানত, তাদের প্রিয়, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের উপদেশ, ও সংস্পর্শের দ্বারা গঠিত হয়ে থাকে।" অবশ্য একটা সম্ভাব্য অসুবিধা হচ্ছে, যিনি ধর্মশিক্ষা দেবেন তিনি, সুদক্ষ, বিশেষজ্ঞ হলেও তাঁর অন্যান্য নাস্তিক, ধর্মে অবিশ্বাসী সহকর্মীরা তাঁর ভাল কাজের ফল সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিতে পারেন। কেননা, এ রা ছাত্রদের কাছেও নিজেদের নাস্তিক্যবাদ ও মতামতকে গোপন করার সতর্কতা অবলম্বন করেন না। তাঁদের মতামত যাতে শিশুদের ধর্মবোধকে নষ্ট না করে সেজন্য, তাদের কোন ধর্মবিশ্বাসের পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষক হতে হবে এমন আইন করা চলে না। বিকল্প একটি ব্যবস্থা হতে পারে; সাধারণ বিচারবোধ হতে, সকলে সহমত হয়ে স্থির করতে পারেন যে অবিশ্বাসী ও নাস্তিক শিক্ষকরা, তাঁদের সহকর্মীদের শুভ প্রচেষ্টার ফলকে জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ নষ্ট করবার চেষ্টা করবেন না।। তবে শুধুমাত্র "নিরপেক্ষ" নীতি যথেষ্ট নয়। যদি খ্রীষ্টধর্মকে আমাদের জীবন

১। স্পেন্স রিপোর্ট। পৃঃ ২০৮।
২। " " পৃঃ ২০৯।

ও বিদ্যালয়ের কার্য্যাবলীর ভিত্তি করতে হয় তবে, শিক্ষকতার বৃত্তির দিকে বহু-সংখ্যক ধর্মবিশ্বাসী এবং আচার ব্যবহারে খ্রীষ্টধর্মের একান্ত অনুগামী নবীন স্ত্রী-পুরুষকে আকৃষ্ট করতে হবে।

আবাসিক এক শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের কার্য্যাবলীর বিবরণ দিয়ে রস্ তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। এই বিশেষ মহাবিদ্যালয়টি খ্রীষ্টধর্মের এক বিশিষ্ট সম্প্রদায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এখানে শিক্ষণবৃত্তির জন্য, খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বাসী পরিবার হতে প্রচুর তরুণ যুবকযুবতীদের একত্র করে শিক্ষা দেওয়া হয়। ধর্মসম্প্রদায় দ্বারা প্রতিপালিত ও অনুপ্রাণিত, এমন মহাবিদ্যালয় যদি বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিচালিত হয় এবং কর্তৃপক্ষের উপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত তা সার্থকভাবে পালন করতে সক্ষম হন, তবে এঁরা তরুণদের জীবনের বেড়ে ওঠার সঙ্কটময় কালে তাদের ধর্মবিশ্বাসের জ্ঞান দান, সমর্থন ও সুরক্ষা করতে পারবেন। এই বিদ্যালয়ের আদর্শ হবে খ্রীষ্টানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি করা। এর ফলে সমস্ত খ্রীষ্টভ্রাতৃ-সমাজ শক্তিলাভ করবে ও অনুপ্রাণিত হবে।

এমন সংস্থায়, মহাবিদ্যালয়ের প্রার্থনাগৃহকে বিদ্যালয়জীবনের কেন্দ্রবিন্দু করা যেতে পারে। এর প্রার্থনাসভা যদি সরল ও ভাবগম্ভীর হয়, সেখানে মহৎ প্রার্থনাগীত সুগীত হয়, সেখানে ধর্মপ্রচারে উদার মনোভাব ও আন্তরিকতা প্রতিফলিত হয় তবে তার সুদূরপ্রসারী ফল সমস্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতিফলিত হবে। এই প্রার্থনাসভাগুলি শুধু একটি ধর্মসম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য না হয়ে অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের সদস্যের জন্যও খোলা রাখা যেতে পারে। এভাবে একটি ভাল প্রার্থনাগৃহ হতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে খ্রীষ্টধর্মের অনুকূল কার্য্যাবলী চলতে থাকবে এবং সকলের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের উদয় হবে।

এমন ভাবে ধর্মসম্প্রদায়-পরিচালিত আবাসিক মহাবিদ্যালয়গুলির 'খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী শিক্ষক তৈরীর প্রতিষ্ঠান' হয়ে ওঠার বিশেষ সুযোগ র'য়েছে। বাইরে থেকে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের আমদানী করার প্রয়োজন হবে না বরং এঁদের জীবনের সার কথা হবে খ্রীষ্টধর্মের অনুগমন। এর জন্যও স্কুলেরই মত বাইবেল পঠন পাঠন, ও খ্রীষ্টধর্মের মূলতত্ত্বের আলোচনার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এখানেও এমন বিশেষজ্ঞ থাকা দরকার যাঁরা শুধু মাত্র প্রার্থনাসভা পরিচালনা করা ছাড়াও আধুনিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মগ্রন্থ শিক্ষা দেবেন, খ্রীষ্টধর্মকে উদারপন্থী পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পড়াতে পারবেন এবং ছাত্রদের মনে এই বিশ্বাস জন্মাতে সক্ষম হবেন যে এই 'ধর্মগ্রন্থ' পাঠ শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধিক চিন্তনের যোগ্য।

এভাবে তাঁদের ছাত্রদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রস্তুত করবেন।

যদি উপরিউক্ত কর্তব্যগুলি সার্থকভাবে প্রতিপালিত হয়, তবে স্পেন্স রিপোর্ট, আর্চবিশপদের রিপোর্ট এবং টাইমস্ পত্রিকার, আবেদন অনুযায়ী বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের জোগান দিতে পারবে। ধর্মসম্প্রদায়-স্থাপিত মহাবিদ্যালয়গুলি তাঁদের চার দেওয়ালের মধ্য থেকে এমন (ধর্মবিশ্বাসী) স্ত্রী-পুরুষদের জোগান দিয়ে যাবেন যাঁরা খমির (Leaven) এর মত ক্রমেই শিক্ষা ক্ষেত্রে উচ্চআদর্শকে উর্দ্ধগামী করে তুলবেন। এঁরা নিজেরা হবেন উদ্যমী, উদার হৃদয়, বিশালমনা, আন্তরিক, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী যাঁরা খ্রীষ্টধর্মভিত্তিক সভ্যতাকে নতুন করে রচনা করার জন্য যথার্থই শিক্ষিত।

ভারতীয় শিক্ষানীতি ধর্মনিরপেক্ষ, কিন্তু ধর্ম ও শ্রেয়ঃনীতি সম্বন্ধে উদাসীন নয়। বরঞ্চ সমস্ত ধর্মের শ্রেষ্ঠ মূলনীতির সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর যাতে পরিচিতি থাকে, যাতে উদার দৃষ্টিভঙ্গী তার জীবনকে মানবপ্রীতি ও ঈশ্বরপ্রেমে চিহ্নিত করতে পারে, আমাদের শিক্ষাদর্শের সেটাই আদর্শ। খ্রীষ্টধর্মের মূল নৈতিক মূল্য সম্বন্ধে রসের মত ও ধর্মপ্রচারের যেই পন্থা প্রদর্শিত, তা হুবহু অনুসরণ না করেও মানুষকে ধর্মবোধে অনুপ্রাণিত করা, যে কোন আদর্শ শিক্ষাদর্শ বলেই বিবেচিত হবে।

অতিরিক্ত পাঠসূচী

বোর্ড অব এডুকেশন। স্পেন্স রিপোর্ট। পঞ্চম অধ্যায়।

ব্রিযাণ্ট। মরাল অ্যাণ্ড রিলিজিয়াস এডুকেশন।

ক্যামপ্যাগনাক। কনভারজিং পাথ্স্, রিলিজিয়ন এ্যাণ্ড রিলিজিয়াস ট্রেনিং।

ফার্লে। দ্য কেথ।

হ্যারিসন। ক্রিশ্চিয়ান লীডারশীপ ইন স্কুল অ্যাণ্ড কলেজ।

হীউড। রিলিজিয়ন ইন স্কুল।

হিউজ. ডি। দ্য মীনেস্ অব প্যাগানিজ্ম্ ইন্ দ্য অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট মাষ্টার স্পীক্স্।

হিউজ. এইচ এম। ক্রিশ্চিয়ান ফাউণ্ডেসানস্।

হিউজ্. এম্, ভি। স্ক্রিপ্চার টিচিং টু ডে।

হ্যামক্লে।	দি ক্রিশ্চিয়ান অ্যাণ্ড এডুকেশন।
কেনেট।	দি টিচিং অব স্ক্রিপ্ চার।
মারটিন্।	এ বুক অব প্রেয়ার্স্ ফর স্কুল্স্।
রেমণ্ট।	দি ইউজ অব বাইবেল ইন্ দ্য এডুকেশন অব দ্য ইয়ং।
রাইভার স্মিথ।	হোয়াট ইজ দ্য ওল্ড টেষ্টামেণ্ট।
স্কিনার জে. ডব্ লিউ।	নারসারিজ অব ক্রিশ্চিয়ান্স্।
টয়েন।	থিওলজি ইন দি স্কুল।
ওডহাউস।	দি স্ক্রিপচার লেস্ন্ ইন এলিমেণ্টারী স্কুল্স্।
	দি অ্যাপ্রোচ টু রিলিজিয়স এডুকেশন, রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড দ্য গ্রোয়িং মাইণ্ড। হ্যাণ্ডবুক টু দি কেমব্রিজ সিলেবাস অব রিলিজিয়স্ টিচিং।
	দ্য কেমব্রিজ সিলেবাস অব রিলিজিয়স টিচিং ফর স্কুল্স্।

পরিশিষ্ট

শিক্ষা ও দর্শনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিবেচনার পর, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় দর্শনের প্রভাব সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা স্বাভাবিক। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় যে মূল ধারণাগুলি অনুসৃত, তার সন্ধান কোঠারী কমিশনের রিপোর্ট হতে পাওয়া যাবে। কোঠারীর নেতৃত্বে ১৯৬৪ সালে যে শিক্ষাবিষয়ক অনুসন্ধান সমিতি নিযুক্ত হয়েছিল, সেই সমিতি প্রাথমিক শিক্ষা হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম স্তর পর্য্যন্ত শিক্ষার বিভিন্ন ধাপগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করে কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এগুলিকে ভারতের শিক্ষাবিষয়ক সাম্প্রতিকতম সিদ্ধান্ত বলা যায়।

এই কমিশনের সর্ব্বপ্রথম দায়িত্ব ছিল দেশের জন্য একটি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা করা। মাতৃস্তন্য শিশুর পক্ষে যেমন পরম উপকারী তেমনি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাই মানসিক পুষ্টির সহায়তা করতে পারে। বিদেশী ফু'ডে'র মত বিদেশী সংস্কৃতিনির্ভর প্রাক্তন-শিক্ষাব্যবস্থা ভারতীয় শিশুর পক্ষে অনুপযোগী। প্রকৃত ভারতীয় জাতীয় শিক্ষা ভারতীয় জনগণের আশা আকাঙ্খাকে পূর্ণরূপ দিতে পারবে। এ সত্য উপলব্ধি করে কমিশনের সদস্যরা বল্লেন যে শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষা নামক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় আয়ুধ দিয়ে দেশের দারিদ্র্য মোচন করে একটি অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত দেশ গড়ে তোলা। এজন্য প্রথমে জানতে হবে দেশে কি কি প্রাকৃতিক সম্পদ্ আছে। তারপরে সেগুলিকে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে। এ কাজে প্রথম প্রকাণ্ড প্রতিবন্ধক বিপুল জনসংখ্যা, কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যাবে যে জনসংখ্যা প্রকৃতপক্ষে দেশের শক্তির উৎসস্বরূপ। দেশে যে সব উন্নতির প্রকল্প করা হচ্ছে, সেগুলির সার্থকতার সম্ভাবনা অনেকখানি বেড়ে যায় যদি বিপুল জনসংখ্যাকে তদনুযায়ী শিল্প ও প্রযুক্তি শিক্ষা (technological) দেওয়া যায়। অতএব শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য হল অর্থনৈতিক ও প্রয়োগবাদী দর্শন নির্ভর।

গান্ধীজি মন্তব্য করেছিলেন "ভারতবর্ষে আবির্ভূত হতে হলে (এ যুগে) ঈশ্বরকে অন্নরূপে আগমন করতে হবে।"[১]

জন্য জীবিকাসংস্থান সংবিধানের বিশেষ দায়িত্ব। দেশের এই চাহিদা মেটানোর জন্য শিক্ষার সাযুজ্য চাই। শিক্ষার পাঠক্রমে এমন সমস্ত বিষয় থাকা দরকার যাতে করে দেশের শিল্প সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য হয়। প্রযুক্তি বিদ্যা (technological subjects) দেশের প্রয়োজন ও প্রাপ্তির রাজযোটক মিল ঘটাবার কাজে ঘটকালি করতে পারবে। শিক্ষাই মানবসম্পদকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। শিক্ষাকে জাতির আশাপূরণের প্রধান সহায়ক হতে হলে জনতার জ্ঞান কর্মকৌশল, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যকে জাতীয় কল্যাণাভিমুখী করতে হবে। কৃষিকাজ, শিল্পকলা ও অন্যান্য যে সমস্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উৎকর্ষ আসবে, তার জন্য চাই নবীন যন্ত্রশিক্ষা, প্রযুক্তিবিদ্যা ও তাতে শিক্ষিত জনসমাজ।

শুধুমাত্র জ্ঞান বিতরণ অবশ্যই যথেষ্ট নয়। প্রাচীন প্রথাগত জীবিকা গ্রহণ না করে নতুন জীবিকা গ্রহণ বা পুরোন জীবিকার ক্ষেত্রে নব নব যন্ত্রের বা কৌশলের ব্যবহার করতে হলে মানুষের মনকে প্রস্তুত করতে হবে। মানুষের মানসিকতাকে (attitude) আধুনিক করে তোলা দরকার যাতে সে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনকে আবাহন করে নিতে পারে। নতুন শিল্পকলা, নতুন ব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিতে হলে মানুষের প্রাচীন কিছু কিছু অভ্যাসকে পরিবর্তন করতে হবে, কখনো বা সম্পূর্ণভাবে নতুন অভ্যাস আয়ত্ত করতে হবে। মনের এই নমনীয়তা, গ্রহণ করার ক্ষমতা (adaptability, flexibility) সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। একদা কৃষিভিত্তিক স্বল্পপুঁজিসম্বল কুটিরশিল্পপ্রধান সভ্যতা, অনিবার্য্যভাবে শিল্পবাণিজ্যনির্ভর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই সমাজ সার্থকভাবে তখনই চালু হতে পারবে যখন গ্রামীণ সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত মানুষেরা সময়, অর্থ, সমাজ, ইত্যাদি সম্বন্ধে তাদের অভ্যস্ত ধারণাগুলি পাল্টিয়ে নব নগরসভ্যতার উপযোগী করে নেবে। শুধু সভ্যতার রূপ পাল্টে যাচ্ছে, তা নয়—এই পরিবর্তন ঘটছে অত্যন্ত দ্রুত। সমাজের পরিবর্তনের এই দ্রুতগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনা, অভ্যাস, জীবন যাপনের ধরন সমস্তকে পাল্টাতে হবে। বিশেষভাবে সচেষ্ট না হলে এই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হবে না। শিক্ষকদের হাতেই এই গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যাতে এই পরিবর্তন মসৃনভাবে ঘটতে পারে।

শিক্ষার এই শিল্পনির্ভর নগরকেন্দ্রিক লক্ষ্যের সঙ্গে আরেকটি বিশেষ চরিত্র লক্ষ্যনীয়। ভারতীয় সংবিধানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ অনুসৃত। শিক্ষার লক্ষ্য, উপকরণ, পাঠক্রম একদা বিদেশী প্রভুদের প্রয়োজন অনুযায়ী পুস্তকসর্ব্বস্ব-

কেরানী তৈয়ারীর উপযোগী ছিল—সেটাকে পাল্টে স্বাধীন গণতন্ত্রের আদর্শ ও বিশ্বাস অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্য, উপকরণ, পাঠক্রম ইত্যাদি স্থির করতে হবে।

শিক্ষার গণতান্ত্রিক রূপ কি? গণতন্ত্র একটি রাষ্ট্রীক সংগঠন মাত্র নয়। এ একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা এক বিশেষ প্রকারের সামাজিক সংগঠনে সক্রিয় থাকে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বহু মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। গোষ্ঠিবদ্ধ মানুষের অধিকার ও কর্ত্তব্যের সীমানা স্বীকৃত হয়। এবং কিছু নির্ব্বাচিত মানুষের দ্বারা শাসনযন্ত্র চালানো হয়। গণতন্ত্র প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাসী। জনতা নিজের শাসনব্যবস্থা নিজের হাতে নেবে; গণতন্ত্রের এই মূল স্বীকার্য্য, জনতার বুদ্ধিবিবেচনার উপর অগাধ আস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত।

শিক্ষার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতির প্রভাব কি? প্রথমতঃ যেহেতু জনতা মতদান দ্বারা প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করেন সেজন্য জনতা যাতে সদ্বিবেচনার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করতে পারেন, এমন শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। গণতন্ত্রের আদর্শ, ভোটদানের পদ্ধতি, গুণাগুন ইত্যাদি শিক্ষার মাধ্যমে তরুণ সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সুতরাং গণতান্ত্রিক আদর্শে সকলকে উদ্বুদ্ধ করা ও গণতান্ত্রিক কার্য্যনীতিতে তালিম দেওয়া শিক্ষার অন্যতম মুখ্য লক্ষ্য বলে পরিগণিত হল। দেশের তরুণরা যাতে গণতন্ত্রের আদর্শকে সত্যিকার শ্রদ্ধা করতে শেখে সে জন্য বিদ্যালয়ের পরিধির মধ্যেই তাদের সক্রিয়ভাবে গণতান্ত্রিক জীবন যাপন শেখাতে হবে। শুধুমাত্র পুঁথিগত ভাবে গণতন্ত্র কি সেইটি জানা নয়, হাতে কলমে তাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুনাগরিক হওয়ার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত স্বয়ংশাসিত ছাত্রসংস্থা ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনের নেতৃত্ব গঠন ও সমাজ সংগঠনের জন্য প্রস্তুত করতে পারবে। এ সবের মধ্যে দিয়ে তাদের আত্মমর্য্যাদাবোধ ও দায়িত্বজ্ঞান বিকশিত ও পুষ্ট হবে। বিভিন্ন শ্রেণী ও 'হাউস' এর মধ্যে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলা ও কার্য্যক্রমের মধ্য দিয়ে ছাত্ররা বুঝতে শিখবে যে তারা একই গোষ্ঠির সদস্য এবং একসূত্রে বিজড়িত। শিক্ষকেরা ছাত্রদের মর্য্যাদা দেবেন। তাঁদের বন্ধুত্বপূর্ণ সহৃদয় ব্যবহার গণতান্ত্রিক জীবনযাত্রার আদর্শস্বরূপ বলে গৃহীত হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতির আরেকটি প্রয়োগ হল সকলের জন্য শিক্ষার সুব্যবস্থার (equality of educational opportunity) আদর্শ। ভারতীয় সংবিধানে সমস্ত নাগরিকের মৌল অধিকার হিসাবে শিক্ষার অধিকার

স্বীকৃত। তবে তার মানে এই নয় যে প্রত্যেককেই একই প্রকার শিক্ষা দিতে হবে। প্রত্যেকের রুচি বুদ্ধি ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন পাঠসূচীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। তার জন্য পাঠক্রমে বিচিত্র ও বহুবিধ বিষয়ের সম্ভার থাকা প্রয়োজন। ছাত্ররা যাতে নিজেদের ক্ষমতা ও আগ্রহ অনুযায়ী পড়ার বিষয় বেছে নিতে পারে সে জন্য বিষয়গুলির মূল্য সম্বন্ধে অবহিত ও ছাত্রছাত্রীদের ক্ষমতা যিনি মূল্যায়ন করতে পারবেন এমন শিক্ষক / উপদেষ্টার (counsellor) উপদেশ ও নির্দ্দেশের একান্তই আবশ্যক।

কোঠারি কমিশন গণতান্ত্রিক আদর্শকে রূপায়িত করার আরেকটি উপায় লিপিবদ্ধ করেন। যেহেতু ভারতবর্ষে বহু ধর্ম, বহু ভাষা, বহু সামাজিক শ্রেণীর সমাহার নিম্নবিত্ত ও উচ্চবিত্তরা, কখনোই একজাতীয় বিদ্যালয়ে নিজেদের সন্তানদের পড়তে পাঠান না। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য খরচসাপেক্ষ উৎকৃষ্ট স্কুলের ব্যবস্থা আছে। এসব স্কুলের সুন্দর দালান মূল্যবান শিক্ষা উপকরণ ভাল শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী রয়েছেন। নিম্নবিত্তদের সন্তানরা যে সব স্কুলে পড়তে যায় তার সঙ্গে গুণগতভাবে প্রথমোক্ত স্কুলগুলির কোন তুলনাই চলেনা। এই কারণে বাস্তবিক-পক্ষে "অবৈতনিক" স্কুলগুলিতে যেই ধরনের বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে তাকে কিছুতেই দামী স্কুলের বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সমপর্য্যায়ে রেখে বলা চলেনা যে বিদ্যা-শিক্ষার ব্যাপারে সকলের জন্যই সমান সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিক্ষা-ক্ষেত্রে এই 'দ্বিজাতি' প্রথা দূর করে, আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য নিরসনকল্পে প্রত্যেক পিতামাতাকে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত নির্ব্বিশেষে, সর্ব্বপ্রকার ছাত্রদের জন্য স্থাপিত সাধারণ বিদ্যালয়ে (common school) পাঠাতে হবে। এই স্কুলগুলো অবৈতনিক হলেও, সরকার এইগুলোর মান উন্নত রাখবেন, উপযুক্ত শিক্ষক ও উপকরণ ইত্যাদির নিয়োগ করে।

আধুনিক ভারতীয় শিক্ষাদর্শনে, 'কেজোবিদ্যা'র ওপর যথেষ্ট ঝোঁক। এই ঝোঁক এসেছে এক সমাজবাদী দর্শনে বিশ্বাস হতে। বস্তুতঃপক্ষে সম্ভবতঃ ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে গণতান্ত্রিক নীতির সঙ্গে সমাজবাদী দর্শনের মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে, এ এক নতুন নিরীক্ষা। সমাজবাদী দর্শনের মূলতত্ত্ব হল দেশের উৎপাদন, বণ্টন ও উপার্জ্জন সমভাবে সকলের মধ্যে বন্টিত হবে। দেশের শাসন-তন্ত্রের হাতে অর্থ, আয়োগ বিনিয়োগের দায়িত্ব থাকবে। প্রাইভেট সেক্টরের হাত হতে সম্পদ, ব্যাবসা বাণিজ্যের ক্ষমতা নিয়ে গিয়ে ন্যস্ত করা হবে দেশের সরকারের ওপর। জাতীয় সম্পদের ওপর এই অধিকার নিশ্চিত হলে জনতার

মধ্যে অর্থের সমবণ্টন সম্ভব হবে। আদর্শগতভাবে সমাজবাদী আদর্শ কম্যুনিষ্ট আদর্শের সমভাবার্থক। যদিও সমাজবাদী দর্শনে কিছু কিছু ক্ষমতা শাসনতন্ত্রের বাইরে প্রাইভেট সেক্টরেও থাকতে পারে—এমন অনুমোদন আছে।

আদর্শ হিসাবে এই আদর্শ নিখুঁৎ। দেশের মানুষের দেশের আয়, উৎপাদন ও অর্থের ওপর সমান অধিকার বর্তাক এবং সকলেই নিজের নিজের প্রয়োজন মত খেটে খেতে পারুক একে সকলেই উত্তম আদর্শ বলে মানবেন। কার্য্যত কিন্তু একে সম্পূর্ণ সফল করা আজও সম্ভব হয়নি। বেকার সমস্যা আজও ভয়াবহ ভাবে সত্য। জাতীয় আয় নিম্নগামী—দ্রব্যমূল্য ঊর্দ্ধগামী ও মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ক্রমক্ষীণায়মান।

বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যে বাড়ছে এইটিই সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়। দেখা যাচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারছে না এবং নিতান্ত কাজের অভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় ভীড় বাড়াচ্ছে। চিন্তাশীল শিক্ষাবিদ্ ম্যালকম আদিশেষাইয়ার মতে, এই তরুণরা যে শুধুমাত্র বেকার (unemployed) তাই নয় তারা কোন কাজের উপযুক্তও নয় (unemployable)। তার জন্য কিন্তু তরুণরা নিজেরা দায়ী নয়। দায়ী সেই অসার্থক শিক্ষা ব্যবস্থা, যা সমাজের প্রয়োজন সম্বন্ধে উদাসীন, দায়িত্বহীন ও অনুপযোগী।

সমাজবাদী দর্শনকে রূপায়িত করতে হলে শিক্ষাকে সমাজজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করতে হবে। অর্থকরী কার্য্যকরী (Vocational) শিক্ষা দিয়ে তরুণদের কর্মোপযোগী করে তুলতে হবে। অতএব কেজো শিক্ষার ওপর বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হচ্ছে। তবে যাতে কার্য্যকরী শিক্ষা সত্যিকারের কাজে লাগে তার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

প্রথমতঃ দেশের শিল্পবাণিজ্য এগুলির একটি সমীক্ষা নিয়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে কি বিশেষ ধরণের প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োজন সেগুলি নির্ধারণ (indentify) করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ সেসব বিশেষ প্রযুক্তিবিদ্যাগুলি পাঠক্রমের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। তার ফলে পাঠক্রমে বৃত্তিমুখী শিক্ষার দিকটি বিশেষ করে পরিণত হবে।

তৃতীয়তঃ পাঠক্রমে বহুবিচিত্র বিদ্যা (প্রযুক্তি বিদ্যা)র সমাহার রাখতে হবে ; যাতে সকলে নিজের সাধ্য ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষা পায়।

চতুর্থতঃ সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে হাতে কলমে কাজ করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার (work experience) ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পঞ্চমতঃ ছাত্র ছাত্রীদের এবং তাদের অভিভাবকদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে যাতে তাঁরা হাতের কাজকে ছোট বলে গণ্য না করেন এবং প্রযুক্তি-বিদ্যা শিখতে বা শেখাতে উৎসাহী হন।

কোঠারী কমিশনের সদস্যরা সকলেই মেনে নিয়েছেন যে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ জীবিকার উপযোগী, কুশলী করে তোলার দায়িত্ব বিদ্যালয়ের। যেহেতু দেশের বেশীরভাগ ছেলেমেয়ের বিদ্যাশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হবে না, তাঁরা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাকে এমন উচ্চমানের করার চেষ্টা করলেন যাতে বিদ্যালয়ের পরিধিতেই কুশলী জীবিকার জন্য প্রস্তুত জনসম্পদ গড়ে তুলতে পারা যায়।

শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে বৃত্তিমুখী না হয়ে প্রথম দশ বৎসর মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ (লিবারেল) শিক্ষা থাকবে। কিন্তু এঁরা একটি নতুন পরিকল্পনা দিলেন মাধ্যমিকের পরে দুই বৎসর ব্যাপী (+২) উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার স্তর। এখানে সমাজের প্রয়োজন ও শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠবিষয়ে বৈচিত্রী-করণের (diversification of course) ব্যবস্থা থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ-বিদ্যার চলন করতে হবে, অর্থাৎ শুধু মাত্র বই পড়া বিদ্যা নয়। জীবিকা গ্রহণে সক্ষম ভবিষ্যৎ নাগরিকদের বিভিন্ন জীবিকার স্বাদ দেওয়ার জন্য কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা (work experience) দেওয়া হবে। অন্ততঃ চোদ্দ রকমের বৃত্তিমুখী শিক্ষার কথা আলোচিত হয়েছে। কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, গাণিতিক শিক্ষা (accountancy) হতে টাইপরাইটিং, ধর্মশিক্ষা, মায় নাটকশিক্ষা পর্য্যন্ত। এইসব কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষার কার্য্যকরী অভিজ্ঞতা দিতে হলে বিভিন্ন কর্মসংস্থার সঙ্গে বিদ্যালয়গুলির বোঝাপড়া থাকবে, যাতে ছেলেরা তাদের নানা বিভাগে হাতে কলমে কাজ করতে ও শিখতে পারে। তা ভিন্ন বিদ্যালয়েও স্ব স্ব বিদ্যায় পারদর্শী শিক্ষক বিশেষ বৃত্তিমূলক বিষয়গুলি শেখাবেন, বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র শুদ্ধজ্ঞানের চর্চা না হয়ে পেশীর চর্চাও হবে। কর্মকেন্দ্রিক বিদ্যালয় এক আনন্দময় সক্রিয় উদ্যমী পরিবেশ গড়ে তুলবে। ছাত্র ছাত্রীরা উপযুক্ত শিক্ষা পেয়ে কুশলী, সমর্থ হয়ে জীবনের প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়াবে ও জীবিকা পেতে তাদের কোন অসুবিধা হবে না।

ভারতবর্ষের নবীন শিক্ষা প্রকল্পে, ধর্মনিরপেক্ষতার (secularism) নীতি অনুসৃত। প্রাচীনকালে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বর্ণশ্রেষ্ঠ লোকদের জন্য। ধর্মবোধ

হতে শিক্ষাচর্চার উৎপত্তি, বিশেষত বেদব্রাহ্মণে বিশ্বাস এ দেশের শিক্ষার গোড়ায়। অবশ্য বৃটিশ শাসকদের আমলে শিক্ষায় ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার লুপ্ত হয় যদিও শাসকরা, বিশেষ ধর্মসংস্থাপরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজে হস্তক্ষেপ করেন নি। তাদের আর্থিক কোন সাহায্যও দেন নি। ফলে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ গুরুকুল পদ্ধতি অবলুপ্ত হয়। বৃটিশ আমল হতেই শিক্ষা ধর্মভিত্তিক না হয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে আস্থাশীল। স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে আজও শিক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি মানা হয়ে থাকে। তার একটি কারণ ভারতবর্ষে বহু ধর্মবিশ্বাস সহাবস্থান করে আছে। ধর্মের নাম করে নানা রকম সংকীর্ণতা কুটিলতা ও হিংস্রতাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে দেশের নানা অংশে। শিক্ষাবিদরা মনে করেন এ বিষয়ে শিক্ষার বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। যখন বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ না হয়ে প্রত্যেক ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শেখে, তখনই আত্মঘাতী বিদ্বেষের হাত হতে দেশ রক্ষা পাবে। দেশের মঙ্গল হবে। দেশের সংহতি বাড়াতে হলে অল্পবয়স হতে অপরের ধর্ম সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি উপায়ে পরমতসহিষ্ণুতা বাড়িয়ে তোলা চলে। যেমন—

প্রথমতঃ ছাত্র ভর্তি বা শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে ধর্ম-নিরপেক্ষতার নীতি অবলম্বন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ ছাত্রদের কাছে যাতে বিভিন্ন ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি বিশদ করার যার জন্য বিশেষ বিশেষ ধর্মবিশেষজ্ঞদের নিমন্ত্রণ করে আনা যায়।

তৃতীয়তঃ সমবেত প্রার্থনাকালে বিভিন্ন ধর্ম অনুযায়ী প্রার্থনা এবং প্রার্থনা-সঙ্গীতের ব্যবস্থা।

চতুর্থতঃ বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবগুলি প্রতিপালন করে সেগুলির মর্মকথা বিশদ করা ইত্যাদি।

ধর্মবিশ্বাস তখনই সার্থক, যখন মানুষেরা জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে ধর্মের মূল ধারণাগুলো বুঝে নিয়ে সেই বিশ্বাস আশ্রয় করে। ধর্মের অন্ধ অনুসরণ হতে আসে আত্মহননকারী পরমত অসহিষ্ণুতা। সেই বিপদ হতে ছাত্রছাত্রীকে রক্ষা করতে তেমন শিক্ষকই পারেন যিনি নিজে উদারমতাবলম্বী ও পরমতসহিষ্ণু। 'আপনি আচরি' শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীদের পরমতসহিষ্ণুতা ও প্রকৃত ধর্মবোধ শেখাতে পারবেন।

ভারতের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মমতসহিষ্ণুতার নীতি শিক্ষাব্যবস্থায় প্রতি-ফলিত তাই শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে নিম্নলিখিত বিশেষ আদর্শ অনুসারে।

ক) মানুষের দৈহিক মানসিক বৌদ্ধিক পূর্ণ আত্মবিকাশ।

খ) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য বিকাশ।

গ) সমাজের অপরাপর সভ্যদের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষমতা বৃদ্ধি।

ঘ) শিক্ষার গণতান্ত্রিক চরিত্রের বিকাশ ও শিক্ষার দ্বারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শে সদস্যদের গড়ে তোলা।

ঙ) দেশের সামাজিক আর্থিক উন্নতি।

চ) দেশবাসীর আশা আকাঙ্খার বাস্তব রূপায়ন।[১]

শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় সমাজজীবনের দর্শনের প্রতিফলন না হলে শিক্ষা হয়ে দাঁড়াবে বিরাট এক অনর্থক অপচয়। ভারতবর্ষের পক্ষে দর্শনহীন শিক্ষা অকল্পনীয়। তাই শিক্ষাবিদরা ভারতের নতুন শিক্ষাপ্রকল্পে মেলবন্ধনের চেষ্টা করেছেন জাতীয় আশাআকাঙ্খা ও সমাজদর্শনের সঙ্গে জীবন্ত প্রাণদায়ী শিক্ষাব্যবস্থার।